By Yvonne Ridley

# In The Hand of Taliban

# ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান

মূলঃ ইভন রিডলি • অনুবাদঃ আবরার হামীম

ইভন রিডলি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৮ সালের ২৩ এপ্রিল। তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট রিডলি বেড়ে উঠেন ইংল্যান্ডের ডারহামের স্ট্যানলিতে। ছোটবেলা থেকেই সংবাদ ও সাংবাদিকতা ছিলো তার ধ্যান-জ্ঞান। তাই নিজের চাকরিজীবন শুরু করেন *স্ট্যানলি নিউজ* নামের একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে। পরবর্তীতে তিনি *লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিংয়ে* পড়াশোনা করেন। এটা ছিলো তার উপরে উঠার একটা শক্ত সিঁড়ি। এ সিঁড়িতে পা দিয়েই পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত সব সংবাদমাধ্যমে কাজ করার সুযোগ পান। যেমন- *দ্য সানডে টাইমস, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন সানডে, দ্য অবজারভার, ডেইলি মিরর* এবং *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*।

২০০১ সালে টুইন টাওয়ার হামলা পরবর্তী সংবাদ সংগ্রহের জন্য ইভন রিডলি সাংবাদিক হিসেবে পাকিস্তান আসেন এবং সেখান থেকে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে তিনি তালেবানদের হাতে অপহৃত হন। তার দশ দিনের বন্দিজীবন পুরো বিশ্ব মিডিয়ায় তোলপাড় করে ফেলে। দশ দিন পর তালেবানরা তাকে নিঃশর্তে মুক্তি দেয়। বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি কাছ থেকে তালেবানদের জীবন-যাপন দেখার সুযোগ পান। এই সুযোগ তাকে পরবর্তীতে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং তিনি ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা শুরু করেন। অবশেষে ২০০৩ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে পুরো পৃথিবী নতুন করে তাকে নিয়ে আবার মেতে উঠে।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি সোচ্চার কণ্ঠে ইসলামের পক্ষে কথা বলে আসছেন। ২০১৪ সালে তিনি *ব্রিটিশ মুসলিমস অ্যাওয়ার্ড* লাভ করেন।
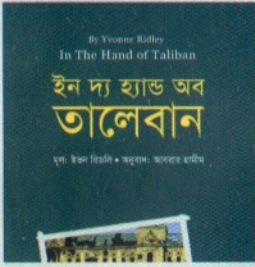
*ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান* এক অর্থে লেখিকা ইভন রিডলির আত্মজীবনী নয়। আবার অন্য অর্থে এটা তার আত্মজৈবনিক এক অসামান্য দলিল। স্বভাবতই এ কথার মধ্যে একটা মতদ্বৈততা খুঁজে পাবেন পাঠকমাত্রই। এখানে মতদ্বৈততার তৈরি হয়েছে মূলত বন্দিবস্থায় তার স্থিতি এবং মুক্ত হয়ে তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমির কারণে। ২০০১ সালে ইভন রিডলি যতোটা না আলোচিত হয়েছিলেন তালেবানের হাতে বন্দি হয়ে, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলেন মুক্তির কিছুদিন পর অকস্মাৎ ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা পশ্চিম তো বটেই, অবাক করেছিলো আমার মতো প্রাচ্যের অনেক তরুণকেই। তখন থেকেই মুসলিমবিশ্বে ইভন রিডলি খুব পরিচিত একটি নাম। সত্যি বলতে, বর্তমানে মুসলিমদের কাছে পশ্চিমে তিনি অনেকটা অচেনা অভিভাবকের মতোই একজন।

ইসলাম গ্রহণের পর নানা কারণেই সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। কখনো ফিলিস্তিনের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে, কখনো ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে, কখনো বা জঙ্গিবাদ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে। তিনি সবসময়ই আপন আলোয় ছিলেন সয়ম্ভর।

এ গ্রন্থ বয়ান করেছে ইভন রিডলির ৯/১১ এবং তৎপরবর্তী জীবনের আলোড়িত অংশ। যা যে কোনো পাঠকের পাঠোত্তেজনার পারদকে নিমিষেই বাড়িয়ে দিতে সমর্থ রাখে।

ইন দ্য হ্যান্ড অব

# তালেবান

ইন দ্য হ্যান্ড অব

# তালেবান

ইভন রিডলি

আবরার হামীম
[অনুবাদ]

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

# ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান

মূল : ইভন রিডলি

অনুবাদ : আবরার হামীম

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭



মূল্য: ৪০০ (চারশ) টাকা মাত্র
Price: BDT 400.00 | US $ 13.00

In The Hand of Taliban
By Yvonne Ridley & Translated by Abrar Hamim

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash

ISBN: 978-984-92655-6-6

## উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মা
ডা. মো. গোলাম হোসাইন এবং আমিনা আফরোজ
আমার দেখা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

# কৈফিয়ত

*ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান* এক অর্থে লেখিকা ইভন রিডলির আত্মজীবনী নয়। আবার অন্য অর্থে এটি তার আত্মজৈবনিক এক অসামান্য দলিল। স্বভাবতই এ কথার মধ্যে একটা মতদ্বৈততা খুঁজে পাবেন পাঠকমাত্রই। এখানে মতদ্বৈততার তৈরি হয়েছে মূলত তালেবানের হাতে বন্দিবস্থায় তার স্থিতি এবং মুক্ত হয়ে তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমির কারণে।

২০০১ সালে সাংবাদিক ইভন রিডলি যতোটা না আলোচিত হয়েছিলেন তালেবানের হাতে বন্দি হয়ে, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলেন মুক্তির কিছুদিন পর অকস্মাৎ ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা পশ্চিম তো বটেই, অবাক করেছিলো আমার মতো প্রাচ্যের অনেক তরুণকেও। তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বে ইভন রিডলি খুব পরিচিত একটি নাম। সত্যি বলতে, বর্তমানে মুসলিমদের কাছে পশ্চিমে তিনি অনেকটা অচেনা অভিভাবকের মতোই একজন।

ইসলাম গ্রহণের পর নানা কারণেই সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। কখনো ফিলিস্তিনের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে, কখনো ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে, কখনো বা জঙ্গিবাদ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে। তিনি সবসময়ই আপন আলোয় ছিলেন স্বয়ম্ভর।

*ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান*-এর নাম যখন থেকে শুনেছি তখন থেকেই ইচ্ছা ছিলো বইটি পড়ার। যখন পড়তে পারলাম তখন মনে হলো, এ বইটি বাংলাভাষী পাঠকের পাঠসম্ভারে যুক্ত করতে না পারলে একজন মুসলিম হিসেবে নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকবো। সেই প্রেরণা থেকেই বইটির অনুবাদ এবং সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি, এটিই আমার অনূদিত প্রথম বই।

ধন্যবাদ *নবপ্রকাশ*কে বইটি অনুবাদের ভার আমার মতো নাবালকের হাতে অর্পণ করায় এবং আমার নড়বড়ে কলমের প্রতি আস্থা রাখায়। তাদের এ আস্থার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ এ কলমকে আরও শক্তিশালী করুন। ইসলামের জন্য, আর্তমানবতার জন্য এ কলমকে আরও শাণিত করুন।

সব শেষে কামনা করবো, বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক। এ গ্রন্থের সাফল্যের বারতায় ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন বই পাঠককে উপহার দেয়ার সৌভাগ্য যেনো আমার হয়, সে দোয়া চাইবো সকলের কাছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

–আবরার হামীম

# ইন দ্য হ্যান্ড অব
# তালেবান

# নাইন ইলেভেনের বিস্মৃতি

বুধবার। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের তুলনায় এই দিনটির তাৎপর্য অন্য রকম। আগামী ছয় মাসের জন্য রসদপাতি জোগাড়ের চিন্তা মাথায় থাকলেও মনে হচ্ছিল একটা শান্তিময় ভ্রমণ অপেক্ষা করছে। রবিবাসরীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সপ্তাহের বুধবারই যা একটু ফুরসত মিলে। নতুন বা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আইভি বা কোয়াংলিনোতে ভরপেট খাওয়ার পরে গলির মুখে ছোট ছোট বারগুলোতে ওয়াইনের বোতলে সুখ-দুঃখের গল্পে গল্পে সময় কেটে যায়।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবেও এই বুধবার আমাকে অফিসে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে। হিসাবরক্ষকের বিশ্লেষণী চিন্তা আর হাতির মস্ত মাথার বুদ্ধি নিয়ে পাই পাই হিসাব মেলাতে হবে। অথচ কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে হিসাব মেলানোর দরকারই পড়েনি। নির্ধারিত খরচের বাইরে এক-দুই বেলা ঘুরে বেড়ানো কিংবা অভিজাত হোটেলে খাওয়া–এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি কেউ। কিন্তু কৃচ্ছ্রতার যুগে এসে চালাক হিসাবরক্ষকেরা বড় বড় টেবিল দখল করে বসে আছে। এ নিয়ে আমার দুঃখ হয়। বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া কতো প্রতিবেদন বা অন্তরালের খবরের জন্মই তো হয়েছে অলস দুপুরে কোনো রেস্তোরাঁর বেহিসাবি খাবারের পাত্রে।

বিনা বিচারে বন্দী একজনকে কথা দিয়েছি, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবো। বেচারা দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারের চার দেয়ালে পচে মরছে। না, জেফরি আর্চার নয়। সত্যি সত্যি এমন একজন নিরপরাধ মানুষের সঙ্গে দেখা করব বলে কথা দিয়েছি।

প্রতিবেদকের কাজ করা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার একদম কাজ এগোয় না। এই সপ্তাহেও দু-দুটি অবশ্যপালনীয় কাজের ভার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম চেয়ার-টেবিলে বসে থাকতে। কাগজ-

কলমে নিমগ্ন চোখজোড়ায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর সময় পর্যন্ত পাইনি। হায় দুপুরের খাবার! আচার আর পনির মাখানো স্যান্ডউইচে স্রেফ একটা কামড় বসাতে পারলেই খুশি হতাম।

তবে কাজে আমি একদমই ফাঁকি দিই না। এর জন্য অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে হালকা রসিকতার সময়গুলো উপভোগ করা সম্ভব হয় না। সন্ধ্যা হলেই সহকর্মীরা এক এক করে চলে গেলেও চাপিয়ে দেওয়া কাজ সম্পন্ন করতে একা একাই বসে থাকতে হয়।

*ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর (লন্ডন) বার্তাকক্ষটা বিশাল হলঘরে অবস্থিত। সারি বেঁধে কাজে নিমগ্ন সবাই। এক কোনায় আমাদের কয়েকজন সহকর্মীর ডেস্ক অবস্থিত। সাংবাদিক, চিত্রগ্রাহক, প্রতিবেদক, শিল্পী সব ধরনের লোকের বিশাল বাজার এই হলঘরে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়ে প্রতি সপ্তাহে ব্ল্যাকফ্রায়ার ব্রিজের অদূরে ভোরবেলা প্রকাশিত হয় খবরের কাগজ। আমাদের সহকর্মীরা একে আদর করে ধূসর লুবায়েঙ্কা বলে ডাকে।

দুপুর কেবল মাথার ওপর চড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বার্তাকক্ষের টিভি সেটগুলোর সামনে একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করল। ঘাড় ঘুরিয়ে টিভির পর্দায় জ্বলন্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে উত্তর দিকের টাওয়ারটায়।

লন্ডনে ঘড়ির কাঁটা তখনো দুইটায় পৌঁছায়নি। অস্থির হয়ে তখনই ফোন দিলাম ছোট বোন ভিভকে। নিউক্যাসলে একটা দোকানে কাজ করে ভিভ। তখনই টিভি পর্দায় তাকাতে বললাম ওকে।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগেই আমরা নিউ ইয়র্কে ছিলাম। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে ভিভের একটা চাকরি হয়েছিল তখন। তবে ভিভের কাছে উঁচু দালানের হাওয়া থেকে ফুলের ঘ্রাণ বেশি ভালো লাগে বলে আর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রমুখী হয়নি সে।

যা-ই হোক, ভিভকে ফোনে বলছিলাম, বিমানের পাইলট হয়তো হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মাথায় অন্য কিছু আর আসছিল না। পরে অবশ্য এ রকম ভাবনার জন্য আফসোস হয়েছিল। উচিত ছিল চেয়ার থেকে উঠে পর্যবেক্ষণ কক্ষে গিয়ে সব সংবাদ চ্যানেলে একবার করে চোখ বোলানো।

নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন আমি আর ভিভ ওয়াল স্ট্রিটের চাকচিক্যে বুঁদ হয়ে ছিলাম। আমরা উঠেছিলাম অভিজাত রিজেন্ট হোটেলে। পাঁচ তারকা

হোটেলে অভিজাত চালচলন, রাজকীয় হালচালের মুখোশে নিজেদের প্রকাশ করতে খুব ভালো লাগত। বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে এটিই ছিল একমাত্র পাঁচ তারকা মানের হোটেল। এককালে শেয়ারবাজারের বেচাকেনা চললেও বেশ কয়েকবার রিজেন্ট হোটেলের দালানটির খোলনলচে বদলে ফেলা হয়। এখন নিউ ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে বড় বাথটাব এতে অবস্থিত। কী কপাল আমার, বোন ছাড়া সঙ্গ দেওয়ার মতো আর কেউই ছিল না সঙ্গে!

আমি আর ভিভ আমার ছোট মেয়ে ডেইজিকেও দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়ের স্কুলের সামার ক্যাম্প চলছিল তখন। জায়গাটা নিউ ইয়র্ক থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। ওখানে ডেইজি অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল। প্রতিদিনই সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল। ছয় সপ্তাহ ধরে চলে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প। গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডে আমরা দুজন ছুটি কাটানোর চিন্তা করলেও এখানেই ডেইজি বেশি আনন্দে ছিল।

ওহ খোদা! ডেইজির চিন্তা আমাকে সবসময় একটা অজানা ভীতির মধ্যে রাখে। অথচ ও এখন আর কচি খুকি নয়। আটে পা দিয়েছে। আমিও চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছি। ডেইজি খুবই চমৎকার খুকি এবং নিজের যথেষ্ট যত্ন নিতে পারঙ্গম। কপালে থাকলে ওর সঙ্গে আরও সময় কাটাতাম। কিন্তু একক মা (সিঙ্গেল মাদার) বলে তা সম্ভব নয়। উপরন্তু সাংবাদিকতার চাকরি আমাকে একদমই অবসর নিতে দেয় না।

নিউ ইয়র্কের সুখকর স্মৃতির সঙ্গে টিভির পর্দার ভয়ংকর দৃশ্যগুলো একেবারেই যাচ্ছে না। ভিভ তো একদমই চমকে যায় আমার ধারাবিবরণী শুনে। কিছুক্ষণ পরই ওর স্বামীকে কল দেবে বলে ফোনটা রেখে দেয় ও। ভিভের স্বামী বিল ব্রাউনের অনেক সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব টুইন টাওয়ার বলে খ্যাত বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে কর্মরত।

আমি অতিনাটকীয় দৃশ্য দেখেই যাচ্ছিলাম। তখনো টের পাইনি যে, বোস্টন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে আসা ১১ নং ফ্লাইটের বিমানটি, যেটি লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটিকে জোর করে উত্তর টাওয়ারে আঘাত করা হয়। তখন নিউ ইয়র্কের ঘড়িতে বাজে ৮টা ৪৮।

১০ মিনিট পরে আমি আবারও ভিভকে ডায়াল করি। এইমাত্র আমার চোখের সামনে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট নং ১৭৫, একটি বোয়িং-৭৬৭ বিশাল বিমান বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের দক্ষিণ টাওয়ারেও আছড়ে পড়েছে। কথা বলার সময় লক্ষ করলাম ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছি। ভিভ সঙ্গে সঙ্গেই ফোন কেটে বিলকে ফোন দেয়।

হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লাম। বার্তাকক্ষের অনেকেই তখন দুপুরের খাবারের বিরতিতে বাইরে গেছে। আমাকে বের হয়ে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে। এটা ভয়াবহ নজিরবিহীন সন্ত্রাসী হামলা। প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডের পরে আমেরিকার ইতিহাসে এত বড় সন্ত্রাসী হামলার নজির নেই।

দ্রুতই নিউ ইয়র্ক শহরতলির চিত্র বদলে যায়। বেলা ২টা ২৫-এর মধ্যেই সব রাস্তা আর সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এক বার্তায় একে আমেরিকার মাটিতে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা বলে ঘোষণা করেন।

নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সব লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার বিমানবন্দরগুলোতে বিমান ওঠা-নামা বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ। কেউ একজন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অনেকেই একে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার পার্ল হারবারে রক্তক্ষয়ী হামলার সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছে।

এরই মধ্যে টিভি পর্দায়, টেবিলে রাখা ল্যান্ডফোন ও মোবাইলে আমার দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। বার্তা প্রতিবেদক জিম মুরেকে বারবার ফোন করতে লাগলাম। সম্পাদক মার্টিনকেও কল দিলাম। আমি জানি, আমাকে এখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে নিউ ইয়র্কে ছুটতে হবে।

পৌনে তিনটার দিকে ফ্লাইট-৭৭ পেন্টাগনে অবস্থিত সামরিক সদর দপ্তরের পঞ্চবাহুর একটিতে আঘাত হানে। এই সময়ের মধ্যে হোয়াইট হাউস খালি করে ফেলা হয়। চারপাশে মানুষজন চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে চতুর্থ আঘাতের ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যেই আরও একটি নিখোঁজ বিমানের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সবাই ভাবছে এটি হোয়াইট হাউসেই আঘাত হানবে।

দুর্ভাগ্য, আমি এখনো প্রতিবেদককে ফোনে পাইনি। কিন্তু সহকারী প্রতিবেদক আমাকে শান্ত হতে বললেন। কারণ আজ মাত্র মঙ্গলবার। কিন্তু কী অদ্ভুত কথা, শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখলে কী করে শান্ত হয়ে বসে থাকা যায়?

আমি করুণ নয়নে দেখলাম, বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর হতে অফিসের কর্মীরা লাফ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হায় খোদা! ওখানে নাকি ভয়ংকর দোজখের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যখন বেঁচে থাকার উপায় হলো উঁচু দালান থেকে নিচে লাফ দেওয়া। আমি এই দৃশ্য দেখতে চাইছিলাম না। আবার ঘটনার ভয়াবহতাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিলাম না। এটা আমাকে

বাধ্য হয়েই দেখতে হচ্ছে। সরাসরি ধ্বংসলীলা দেখানো হচ্ছে এবং এটি ভয়ংকর দৃশ্য। তা কল্পনার চেয়েও বেশি রক্ত হিমকারক।

একটু পরে জিম মুরে হন্তদন্ত হয়ে বার্তাকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু এলেন সম্পাদক মার্টিন। ঘটনার বিবরণ শোনার পর মার্টিন আমাকে নিউ ইয়র্কে পাঠানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। কিন্তু জিম ভাবছিলেন, আমার এখনই মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া উচিত। তিনি মনে করছেন, আমেরিকার মাটিতে ঘটে যাওয়া এই পাশবিকতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি দামেস্ক বা লেবাননে যেতে চেয়েছিলাম। ওখানে বেশ কিছু বিশ্বস্ত বন্ধু রয়েছে, যারা আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে। ১৯৯২ সালে দামেস্কের এক গোপন পরিখায় তৎকালীন জনপ্রিয় দল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের প্রধান আহমেদ জিবরিলের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন ডেইজি আমার গর্ভে সাত মাস ধরে অবস্থান করছে। এই গ্রুপকে লকারবির আকাশে প্যানঅ্যাম বিমানে হামলার জন্য অনেকে দায়ী করে থাকেন। সে যাত্রায় মধ্যপ্রাচ্যের ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্দার অন্তরালের দৃশ্য দেখার প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক অভিজ্ঞতা আরও শাণিত হয় যখন দীর্ঘদিন ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংগঠনের সাবেক কর্নেল দাউদ জারোরার সঙ্গে একত্রে থেকেছিলাম। এই ব্যক্তি ১৯৭২ সাল থেকে দক্ষিণ লেবাননের ফাতাহ ভূমিতে কিংবদন্তি কমান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি প্রয়াত ইয়াসির আরাফাতের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। আমার অনাগত সন্তানের পিতা হিসেবে তিনি নিউক্যাসলে আমার ফ্ল্যাটে উঠে আসেন রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার আবেদন জানানোর পর। ইয়াসির আরাফাত আমার সঙ্গে সম্পর্ক মেনে না নিয়ে তাঁকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সেটা অন্য গল্প। যা-ই হোক, উনি এখনো আমার অনেক ভালো বন্ধু।

অন্যদিকে অফিসে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পরে বার্তা প্রতিবেদক ও জিম আমাকে নিউ ইয়র্কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি যখন নিউ ইয়র্ক যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছিলাম ততোক্ষণে দক্ষিণ টাওয়ার ছাইয়ের স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ রেখে ধসে পড়েছে। নিউ জার্সি থেকে ছেড়ে আসা সান ফ্রান্সিসকোগামী ফ্লাইট-৯৩ সমারসেট বিমানবন্দরের দক্ষিণে বিধ্বস্ত হয়।

লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে দ্রুত বাসা থেকে কাপড়চোপড় বোঝাই কিছু ব্যাগ নিয়ে এলাম। আমি বিমানবন্দরে পৌঁছাতে

পৌঁছাতে আটলান্টিকগামী সমস্ত ফ্লাইটের গন্তব্য বদলে কানাডায় অবতরণের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে উত্তর টাওয়ারও ততোক্ষণে ধসে পড়েছে।

ব্রিটিশ বিমানের কাউন্টারে তখন বিশাল দীর্ঘ সারি। বিমানবন্দরজুড়ে হইচই আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে খবর পেলাম আগামী এক দিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে কোনো বিমান উড্ডয়নের সম্ভাবনা নেই। তবে ব্রাজিলগামী বিমানে চাইলে আমার টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমাকে জানানো হলো। আমেরিকা যাওয়ার বিকল্প কোনো উপায় সন্ধান করতে করতে খবর পেলাম, কানাডা আর মেক্সিকো সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। জন্মগতভাবে আমি প্রচণ্ড আশাবাদী মানুষ হওয়ায় ১৩ তারিখের নিউ ইয়র্কগামী বিমানে একটি টিকিট কেটে ফেলি। ততোদিনে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসবে, এই আশার পালে দোলা দিতে থাকি।

একরাশ হতাশা নিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অফিসে ফিরে এলেও বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কগামী বিমানের টিকিট আমার হস্তগত। তাই মুখে একটা বিজয়ের ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্রত ছিলাম। নিউ ইয়র্কের মেয়র রুডলফ ম্যানহাটানের দক্ষিণ এলাকা খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ৫৫ নং ওয়াল স্ট্রিটের হোটেলে থাকাকালীন আশপাশের যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম তাদের অশুভ পরিণতির আশঙ্কায় মনটা কেমন করে ওঠে। কারও খবর পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না তখন। যোগাযোগের সব মাধ্যম ততোক্ষণে বিচ্ছিন্ন।

নিউ ইয়র্কের ভয়াবহ হামলার পরবর্তী দুরবস্থার খবর জানতে পারি, এই আশায় ডেইজির বোর্ডিং স্কুলে ফোন করলাম। কণ্ঠস্বরটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠলেও এই ঘটনায় ভয় পায়নি, এটা প্রমাণে ডেইজি যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। নিউ ইয়র্কেই যাচ্ছি, এ কথা ডেইজিকে বলার মতো সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খবরটা জানানোর পর ডেইজির মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, টেলিফোনের এ পাশ থেকে সেটা ভালোমতোই বুঝতে পারলাম। সুন্দর উপহার নিয়ে ফেরত আসার প্রতিজ্ঞা করতে হলো মেয়ের কাছে।

তবে এ যুগের বাচ্চারা খুব বুদ্ধিমান হয়। অল্পতেই তারা সবকিছু সহজভাবে নিতে পারে। ডেইজিকেও স্বাভাবিক করতে আমার খুব কষ্ট করতে হলো না। সাধারণত আমি আর ডেইজি প্রচুর ঘুরে বেড়াই। তাই ওকে ছাড়া কোথাও যেতে হলে ও অনেক কষ্ট পায় আর আমারও খারাপ লাগে। আমাদের অল্প সময়ের ছোট ছোট ভ্রমণগুলো মজার মজার

অভিজ্ঞতায় ভরপুর। ফোনে ডেইজি আমাকে মনে করিয়ে দিল ওর মাসিক পরীক্ষার পরই আমস্টারডাম যাওয়ার জন্য টিকিট বুক করা আছে। তাই আমি যেন নিউ ইয়র্কে অযথা কালক্ষেপণ না করি। ডেইজি দ্রুতই ফোন কেটে দেয়। অনেক দূরে বসে আমি ওর টেলিফোনের প্রতীক্ষায় মন খারাপ করি, ও কখনোই তা চায় না। তবে আমার মনে হয়, ছেলেবেলায় আমিও এমন করেছি।

বিমানবন্দর থেকে অফিসে ফেরত আসার সময় স্টামফোর্ডের ওয়াইন বারে একটা ঢুঁ মেরেছিলাম। ওখানকার ম্যানেজার লিনা দারুন একটা পানীয় তৈরি করে, যা তুমুল জনপ্রিয় এবং স্বাদেও দারুণ। আমার মতে পৃথিবীর অন্যতম সেরা পানীয়গুলো এখানেই পাওয়া যায়। স্টামফোর্ডের বারগুলো আমার অনেক পছন্দের। এখানকার সবাই খুব অতিথিপরায়ণ। টেবিলের পেছনের মেয়েগুলো সদা হাসিমুখেই থাকে। পরিবেশনকারীদের পানীয় মিশিয়ে ককটেল বানানোর ক্ষমতা অসাধারণ। সারাক্ষণ আনন্দ আর হাসি-ঠাট্টায় ভরপুর থাকে কৃত্রিম আলোয় উজ্জ্বল জায়গাগুলো। তবে আজকের পরিস্থিতি ছিল কেমন থমথমে। খুব একটা মানুষের উপস্থিতি ছিল না। যারা ছিল, তারাও কেমন যেন বিষাদে চুপ মেরে ছিল। ওখান থেকে একটা ক্যাব ডেকে সহোতে জেরির ক্লাবে চলে গেলাম।

সাধারণত, শেষ রাতে মাঝেমধ্যে জেরির ক্লাব হয়ে বাড়ি ফিরি। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রতি রাতেই জেরির ক্লাবে যাওয়া হয়। এসব রাতের নীল পানির আকর্ষণ ঠেকাতে আমার উচিত হবে ডিন স্ট্রিট ও অক্সফোর্ড স্ট্রিটের নিরিবিলি রাস্তা পেরিয়ে সোজা বাড়ি পৌঁছানো। কিন্তু রাত তিনটার দিকে কোথাও গিয়ে এক বোতল পানীয় মিলবে, দু-চারটে গালি দিয়ে অফিসের রাগ ঝাড়া যাবে, এমনকি পকেটে কানাকড়ি না থাকলেও অসুবিধে নেই, এমন সুযোগ আমার জন্য কেবল জেরিতেই মিলবে।

কার্ডিফে একটা দৈনিকে কাজ করার সময় আট বছর আগে আমি এই ক্লাবের সদস্যপদ পাই। তখন কোনো এক কাজে লন্ডনে এসে পুরোনো বন্ধু কেভিনের সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধু তখন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। দুজনের পেশা একই হওয়ায় গল্প জমতে বেশি সময় লাগে না। জেরিতে বসে বসেই তিন বোতল খালি হয়ে যায়। আমাদের গল্প সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দীর্ঘতর হচ্ছিল। তাই আমরা আরও কয়েক বোতল অর্ডার করি। দ্রুতই আমাদের পকেট খালি হয়ে আসে। তবে এখানকার বিচক্ষণ মালিক আমাদের ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারে, জায়গাটা আমাদের পছন্দ হয়েছে।

তাই আমাদের সে সদস্যপদ অফার করে বসে এবং বাকি হিসাব খোলার অনুমতি দেয়। সেই থেকে জায়গাটা আমার দ্বিতীয় বাড়ির মতো।

১১ তারিখ রাতে ক্লাবে আসার পর আমি হতভম্ব হয়ে যাই। চিরচেনা হইহুল্লোড়ের বদলে মাত্র কয়েকজন চুপচাপ বসে আছে। পরিচিত এক দম্পতিকে পেয়ে আমি ওই দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করি। মেয়েটা দুঃখের সঙ্গে জানায়, তার সঙ্গীর জন্মদিন হওয়া সত্ত্বেও ওই দিন সে কিছুই করতে পারেনি। আমেরিকায় ঘটা সন্ত্রাসী হামলার পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মদদ আছে কি না, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পশ্চিমের যুদ্ধ শুরু হচ্ছে কি না এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্ক হয়। লন্ডনে যেখানে দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলমান, সেখানে এই যুদ্ধের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা নিয়ে সবাইকে বেশ চিন্তিত মনে হলো।

বাড়ি ফিরেই আমি পোর্টেবল টিভিটা অন করি। এটা বেশ কিছুদিন ধরেই যন্ত্রণা দিচ্ছে। তবে ক্ষণিক বাদেই ওই দিনের সংবাদ দেখতে পেলাম। কয়েক ঘণ্টা আগে বিশ্ব বাণিজ্য ভবন ধসে পড়েছে। ২০০ অগ্নিনির্বাপন কর্মী ও ৭৮ জন পুলিশ অফিসারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

লুইজিয়ানায় বার্কসভিলে বিমান ঘাঁটি থেকে প্রেসিডেন্ট বুশ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন, যে বা যারাই হামলা করে থাকুক না কেন, তাদের নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করা হবে এবং আমেরিকা এর শক্ত জবাব দেবে। বলিষ্ঠ, কঠোর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কণ্ঠস্বর।

তবে বক্তব্য প্রদানের পরই তিনি দ্রুত নেব্রাসকার বিমানঘাঁটিতে সটকে পড়েন। নেব্রাসকাতে আমেরিকার সামরিক বাহিনীর কৌশলগত পরিকল্পনার সদর দপ্তর অবস্থিত। ব্যাপারটা আমার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হলো। উচিত ছিল, তিনি প্রথমে নিউ ইয়র্ক যাবেন এবং পরে ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরে গিয়ে সব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। যদিও আমি রাজনীতিবিদদের নীতি ও আনুগত্য নিয়ে সংশয়বাদী, তবু এটা উচিত নয় যে, কোনো দুর্ঘটনা বা জাতীয় দুর্যোগের সময় নেতারা মাটির তলায় সুড়ঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে থাকবেন।

পরদিন মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙলো। দ্রুতই আমার প্রিয় গ্রিজি স্পুন ক্যাফেতে গিয়ে একটা ল্যাটে ও বেকন স্যান্ডউইচের অর্ডার করলাম। সংবাদপত্রের প্রথম পাতাগুলো ছিল নাটকীয় শিরোনাম ও বিষাদময় ছবিতে ভরপুর।

অফিসে যাওয়ার পর কাজ শেষ করতে করতে রাত দুইটা বেজে গেল। প্রচুর সংবাদ ও প্রতিবেদন তৈরি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করতে হলো। অফিসের একজন কর্মীরও বেকার বসে থাকার সুযোগ ছিল না। সবাইকেই ব্যস্ত হয়ে কাজ করতে হলো।

নিউ ইয়র্কে বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিত অনেককেই সারা দিন ফোন করেছি। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অনেক পরিচিত মানুষকেও ফোন করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে ভাবগম্ভীর, রাশভারী ধরনের কয়েকজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককেও চেষ্টা করেছি কিছু তথ্য লাভের আশায়। হার্ভে নিকোলসে আগে থেকেই রূপচর্চার সময় ঠিক করা থাকলেও তা বাতিল করতে হয়। প্রথমবারের মতো *সানডে টেলিগ্রাফ*-এর সহকারী সম্পাদক ক্রিস বোফের সঙ্গে বসতে হলো। নিউক্যাসলের পুরোনো বন্ধু ও *সানডে টেলিগ্রাফ*-এর প্রতিবেদক আমাকে যাওয়ার জন্য খোঁচাতে থাকলে আমিও যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যাই। তবে তখন ঘড়িতে রাত এগারোটা বেজে গেলেও আমার অনেক কাজ বাকি পড়ে ছিল।

এই কাজের জন্য নিয়মিত বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব নয়। এমনকি উদার মনের স্বামী বা প্রেমিকেরাও এ রকম ব্যস্ততা দেখলে বিরক্ত হবে, যা খুবই হতাশাজনক। তবে সময়সাপেক্ষ চাকরি হলেও ঘটনার আকস্মিকতা ও উত্তেজনা নিমেষেই সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। সংবাদমাধ্যমের চাকরি আসলে সেই পুরোনো প্রবাদকেই মনে করিয়ে দেয়, সত্য সব সময় কল্পনার চেয়েও শিহরণ জাগানিয়া।

বাস্তবে আমার জীবনটা যেকোনো রহস্য গল্পের চেয়েও রহস্যময়। মানুষ কেমন বাঁকা চোখে তাকায় যখন জানতে পারে যে আমার তিনবার বিয়ে হয়েছিল এবং ডেইজির বাবা এই তিন স্বামীর কেউ নন। আমি বুঝতে পারি না, মানুষ পরকীয়া অথবা একের পর এক প্রেমের সম্পর্ককে খারাপ মনে করে না। কিন্তু একাধিক স্বামীর কথা শুনলেই তারা ভ্রু কুঁচকায়।

আমার কাছে আমার জীবনটা এতোগুলো সম্পর্ক আর জেরির ক্লাবে কাটানো সময়গুলো মিলিয়ে অনেক বেশি আনন্দের। বন্ধুরা আমার শক্তি দেখে অবাক হয়। দিনে মাত্র তিন বা চার ঘণ্টা ঘুমানোর সময় পাই। তবে একাকিত্ব আমার বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। তাই নিয়মিতই আমি ক্লাবে যাই।

মৃত্যুর সুধা পান করার আগে একজন মানুষ গড়ে ২৭ বছর শুধু ঘুমিয়েই পার করে দেয়, এ কথা জানার পর আমি আঁতকে উঠেছিলাম। ২৭ বছর,

ওরেব্বাস! দীর্ঘ সময় একবার চিন্তা করে দেখুন, এই সময়টুকুর মধ্যে না জানি আপনি কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে ফেলছেন। এর বাইরেও একটু তথ্য দিয়ে রাখি, অধিকাংশ মানুষ নাকি ঘুমের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করে। তাই, ঘুম খুব ভয়ংকর, যতোটা পারি আমি নিদ্রাদেবীর থেকে অন্তরালে থাকার চেষ্টা করি।

বৃহস্পতিবার একটি ব্যস্ত দিন কাটিয়ে রাত তিনটায় বাড়ি ফিরলাম। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে প্যাডিংটন স্টেশনে গিয়ে হিথরো এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় থাকলাম। নিউ ইয়র্কগামী ফ্লাইট অবশেষে ধরতে পারবো। তবে স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম ভোর পাঁচটার আগে কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা কনকনে ঠাণ্ডায় স্টেশনেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিমানে ওঠার পরে বাকি থাকা ঘুম পূরণ করা যাবে। একলা বসে থাকতে দেখেই কিনা স্টেশন মাস্টারের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি নিজ উদ্যোগেই স্টেশনের একটা কক্ষে বসার সুযোগ করে দিলেন। কক্ষে ঢুকেই ঘুমে ঢলে পড়লাম। কী দুর্ভাগা আমি!

ভোর পাঁচটায় স্টেশন মাস্টার এসে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। হিথরো যাওয়ার পথে শীত একদম জেঁকে বসলো। আমার চামড়ার মোটা জ্যাকেটটা একদমই শীত তাড়াতে পারছে না। কাঁপতে কাঁপতে বিমানবন্দরে এসে টের পেলাম নিউ ইয়র্ক যাওয়া হচ্ছে না। নিউ ইয়র্কগামী ফ্লাইট বাতিল। মনে মনে দুঃখিত হলেও ভাগ্যের পরিহাসে হেসে দিলাম। যা-ই হোক, কুয়াশাঢাকা ভোর। অতএব, পছন্দের বেকন স্যান্ডউইচ খেতে খেতে কফির পেয়ালায় একটা চুমুক তো দেওয়াই যায়।

আমেরিকা যখন স্তম্ভিত ও শোকে মুহ্যমান, তখন কোনো ব্রিটিশ সাংবাদিকের পক্ষেই নিউ ইয়র্ক যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আমেরিকার উড্ডয়ন সীমান্ত তখন পর্যন্ত চালু হয়নি। অফিসের আরও কিছু কাজ করতে করতে সম্পাদক জিমকে বললাম, পরদিন সকালে নিউ ইয়র্কগামী বিমানে চেপে বসার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি একটু বেশিই আশাবাদী হলাম। কারণ, ১১ সেপ্টেম্বরেই আমি টিকিট কেটেছিলাম।

এমন মুহূর্তেই কম্পিউটারের স্ক্রিনে নতুন ই-মেইলের বার্তা ভেসে উঠলো। মিনোপলিস থেকে আমার চাচাতো ভাই মাইক মেইলটা পাঠিয়েছে। ও ছিল ভীতসন্ত্রস্ত এবং কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কেন আমেরিকার ওপর হামলা করা হলো। আমি অনেকগুলো কারণ দর্শাতে পারতাম কিন্তু

কোনোটিই পরিপূর্ণ যুক্তিসংগত নয় বলে চুপ রইলাম। মাইককে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে খুব ইচ্ছা হলো। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, এত বড় হামলার পরে কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না।

আমি আমেরিকাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। খাবার কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না, দ্রুতই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে, এ ধরনের জায়গা আমার খুব প্রিয়। লন্ডনের অধিকাংশ জায়গায় তা অনুপস্থিত। আমেরিকান লোকেরা ব্রিটিশদের মতো এত কঠিন মনের অধিকারী নয়। বহির্বিশ্বের কেউ তাদের অপছন্দ বা ঘৃণা করতে পারে, এটা জানার পর তারা সত্যিই খুব অবাক হবে। অন্যদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রিটিশদের গায়ের চামড়া শুধু মোটাই হয়েছে। কেনইবা হবে না? ইংরেজরা এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তলোয়ার ধরে সারা পৃথিবী শাসন করেছে। ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলমান থাকায় সন্ত্রাসী হামলাকে ব্রিটিশরা স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে আমেরিকার জনগণের পক্ষে এই শোক কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লেগে যাবে।

সারা দিন আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে ই-মেইলে কথা চালাচালি করলাম। ওর অসহায়ত্ব দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ ১১ তারিখের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ও শুধু পরবর্তী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অন্য কিছু ভাবার ফুরসত ছিল না।

সন্ধ্যা আটটার সময় নগর সংস্করণের সম্পাদক রিচার্ড ফিলিপস ও আমার খুব কাছের বন্ধু মাইককে সঙ্গে নিয়ে অফিস ত্যাগ করলাম। মার্ক বর্তমানে ব্যবসা ও পত্রিকা নিয়ে খুবই সক্রিয়।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। থেমে থাকা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে মিথ্যা ভয় দেখালাম যে ট্যাক্সি কোম্পানিতে আমরা ফোন করেছি। তবে এত কিছুর দরকার ছিল না, সে এমনিতেই আমাদের তিনজনকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিল। এমন সময় মার্টিনকে দেখে আমরা প্রায় পালিয়ে চলে গেলাম। মার্টিন লুডগেট থেকে বের হয়ে দ্রুত একটি ট্যাক্সি খুঁজছিল।

কিন্তু বিধিবাম! পালানোর চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হলো না। মার্টিনের হাতে একেবারে হাতেনাতে ধরা খেলাম। ও খুব রেগে গিয়ে আমাদের ডাকাত বলে সম্বোধন করল। রাগে গজরাতে গজরাতে মার্টিন বলল, যাদের ও চাকরি দিয়েছে তাদের থেকে এর বেশি কিছু সে আশাই করে না।

ভয়ে ভয়ে আমরা মার্টিনকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিলাম। পথে ফ্লিট স্ট্রিটে পিৎজা খাওয়া ও সস্তা ড্রিংকসের পর্ব চলল।

মার্টিন ততোক্ষণে আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে। ও জানাল, এটা খুবই বিব্রতকর বিষয়। তবে যা-ই হোক, সারা দিন অনেক ধকল যাওয়ায় সময়টা ভালোই কাটল। পরিস্থিতি সহজ করতে আমি বললাম, ছোটবেলায় বিস্কুট খাওয়ার জন্য যখনই বয়ামে হাত দিতাম, তখনই মার কাছে ধরা খেতাম।

সবাই বাড়ি চলে গেলে আমিও জেরিতে চলে এলাম। এটা দারুণ সুন্দর ও ভদ্র জায়গা। যতোই চিৎকার-চেঁচামেচি অথবা কান্নাকাটি করা হোক না কেন, উপস্থিত কেউই একবারের জন্যও ভ্রু কুঁচকে তাকাবে না।

পরদিন শুক্রবার সকাল সকাল হিথরো চলে এলাম। এখানে একজন বেশ দৃঢ় চরিত্রের আমেরিকান মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলো। ভদ্রমহিলা আমেরিকার পশ্চিম দিকের এক রাজ্যে বাস করেন। তিনি পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। ওদের দেখে আমার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ে গেল। জয়েস, আমি, দুই বোন ভিভ ও জিল। কত সুন্দর সময়ই না আমরা পার করে এসেছি।

এই আমেরিকান পরিবার আটলান্টিকের ওপর দিয়ে সব বিমানপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও হিথরো বিমানবন্দর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। চালু হওয়ার পর প্রথম ফ্লাইটেই নিউ ইয়র্ক যাওয়ার জন্য তাঁরা সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছেন। কর্তৃপক্ষও যথাসাধ্য কেক ও কফি দিয়ে তাঁদের যথাসাধ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে।

অবস্থা লক্ষ করে আমি তাঁদের এক বেলা খাবার নিমন্ত্রণ করলাম। ভদ্রমহিলা সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। খেতে খেতে আমি তাঁদের ব্রিটেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলাম। তবে খুব একটা অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া গেল না। হামলার পর থেকেই তাঁরা নিউ ইয়র্কে স্বজনদের নিয়ে খুব চিন্তায় আছেন এবং কখন প্রিয়জনদের মুখগুলো দেখতে পাবেন, সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

অথচ ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার সময় তাঁরা নিউ ইয়র্কের পথে আকাশেই ছিলেন। মাঝপথেই তাঁদের বিমান ঘুরিয়ে হিথরো বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। হিথরোতে নামার আগে তাঁরা পুরো ঘটনা আঁচ করতে পারেননি।

এরই মধ্যে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার টিকিটের কাউন্টারে বিশাল লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে গেল। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা প্রত্যেককেই নিউ ইয়র্ক যাওয়ার কারণ বিস্তারিত জানতে চাইছেন। অতীব গুরুত্বপূর্ণ না হলে অনেককেই তাঁরা এ যাত্রা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। প্রচুর আমেরিকান নাগরিক হিথরো বিমানবন্দরে আশঙ্কায় সময় কাটাচ্ছেন, তাই এ ব্যবস্থা। আমি একটু ভয় পেলাম। কারণ, অনেক আমেরিকান দুর্ভাগা নাগরিক আমার সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে, যাঁরা তখনো জানতেন না তাঁদের স্বজনদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।

মা কিছুক্ষণ পরপর ফোন করে টিকিট পেলাম কি না জানতে চাইছেন। আমার মা খুবই ইতিবাচক ধরনের এবং সব সময় উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এই দুর্দিনে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি শুনে তিনি একবারও না করেননি বরং অন্য সবার মতো সেখানে আসলে কী ঘটেছে তা জানতে তিনিও উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

মাকে শান্ত থাকতে বললাম। এদিকে ডেইজির ছুটি হবে কয়েক দিন পরই। তাই আমার আসতে দেরি হলেও মা-বাবা যেন ডেইজিকে বাড়ি নিয়ে আসেন, এর জন্য অনুরোধ জানালাম। মা-বাবার ওপর ডেইজির দায়িত্ব দিয়ে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার জন্য একটু সাহস পেলাম।

অপেক্ষার পালা যেন আর শেষ হচ্ছিল না। যখন কাউন্টারের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি, ঠিক তখনই আমার বস জিম ফোন করল। জিমের কথা শুনে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। নিউ ইয়র্কগামী বিমানের টিকিট কাটার আগ মুহূর্তে জিম আমাকে টিকিট কাটতে নিষেধ করল। পরিবর্তে তক্ষুনি ইসলামাবাদের ফ্লাইট ধরার প্রস্তুতি নিতে বলল। আমার মাথা যেন কাজ করছিল না। নিউ ইয়র্ক যাওয়ার জন্য আমি ব্যাগ গুছিয়েছি, এশিয়ার কোনো বিশ্রী বাজে শহরে সময় কাটানোর জন্য নয়। মনে মনে পরিস্থিতিকে গালি না দিয়ে থাকতে পারলাম না।

ওই মুহূর্তটায় জিমকে খুব অপরিচিত লাগছিল। যদিও জিমের সঙ্গে পরিচয় বেশি দিনের নয়, তবে ও অনেক গুছিয়ে কাজ করে। আজকাল নারী প্রতিবেদকদের সঙ্গে কাজ করতে অনেক সম্পাদক অস্বস্তিতে ভোগে। অথচ জিম মোটেই এমন নয়।

কথা বলতে বলতে জিমের বিচারবুদ্ধি নিয়ে আমার সন্দেহ হতে শুরু করল। ইসলামাবাদ যেতে আমি অনিচ্ছুক–টের পেয়ে জিম জানাল, নিউ ইয়র্কে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যোগসূত্র রয়েছে বলে ইতিমধ্যেই খবর বেরিয়েছে। তাই পরবর্তী সংবাদ

সংগ্রহের জন্য এশিয়ার দিকে ধাবিত হওয়াই একজন বুদ্ধিমান অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। প্রচণ্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসের আদেশ শিরোধার্য বলে কোনো রকমে ইসলামাবাদ যেতে রাজি হলাম। তবে ওই দিন ব্রিটিশ বিমান পাকিস্তানগামী সব ফ্লাইট বাতিল করেছিল। কেউ একজন সামনের টার্মিনালে গিয়ে এমিরেটসে টিকিট কাটার পরামর্শ দিল।

গোমড়া মুখে এমিরেটসের কাউন্টারের দিকে ধাবিত হলাম। সেখানকার একজন কর্মকর্তা আমাকে দুবাই হয়ে লাহোর যাওয়ার টিকিট ক্রয়ের পরামর্শ দিলেন। লাহোর থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ধরে আমি ইসলামাবাদ যেতে পারবো বলে তাঁরা জানালেন। গজরাতে গজরাতে বিমানবন্দরের মেঝেতে হিল জুতো ঠুকে ঠুকে এমিরেটসের বিমানে ওঠার জন্য এগিয়ে গেলাম। চতুর জিমকে ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদ যাচ্ছি বলে জানিয়ে দিলাম। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে বিমানটা ছিল বিলাসবহুল ও আরামদায়ক। সিটে বসে জোনসের সিনেমা দেখতে লাগলাম। সাধারণত, যাত্রাপথে আমি বই পড়ি। তবে তখন কিছুই ভালো লাগছিল না।

মুভি শেষ হয়ে এলে সামনের কম্পিউটার পর্দায় দাবা খেলতে শুরু করলাম। কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যখন প্রায় হারিয়ে দিয়েছি, তখন বিমানের চাকা দুবাইয়ের মাটি ছুঁয়েছে।

দুবাই আমার পছন্দের শহর। অনেক সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই শহর। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমি নিউক্যাসলের *সানডে সান*-এ কাজ করি। তখন চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করত মাইক স্কট। যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে আমি আর মাইক তখন ছোটখাটো হারকিউলিস বিমানে করে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আকাশে রুদ্ধশ্বাসে চক্কর দিয়েছি।

বুদ্ধিটা তখন ভালোই কাজে দিয়েছিল এবং প্রায়ই আমরা হরমুজ প্রণালিতে অবস্থান করা রাজকীয় যুদ্ধজাহাজের বহরের বিভিন্ন রণতরিতে ঘুমিয়েছি। সবকিছুই হিসাবমতো এগোচ্ছিল, শুধু শেষ ফ্লাইটের আগে আমরা হঠাৎ ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়ায় দুবাইতে আটকা পড়ে গেলাম।

আমার কাছে তখনো আমার দ্বিতীয় স্বামীর ক্রেডিট কার্ড ছিল। তাই দুবাইতে অবরুদ্ধ থাকার এক সপ্তাহ ক্রেডিট কার্ডটির সদ্ব্যবহার করলাম। ওখানকার বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করেছিলাম আর পুরো শহর চষে বেড়িয়েছি।

আমি আমার বস জনের নিকট ভ্রমণ খরচ বাবদ দুই হাজার পাউন্ড দাবি করতেই আমার বস প্রায় হার্ট অ্যাটাক করে বসলেন। এত টাকা বাজেটে নেই বলে তিনি আমাকে দিতে অক্ষমতা ব্যক্ত করলেন। এতে দমে না গিয়ে আমি বসকে সোজাসাপটা জানিয়ে দিলাম–আমি আমার স্বামীর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে সব খরচ মিটিয়েছি এবং যদি তাঁকে আমার উপসাগরীয় অঞ্চলে ভ্রমণের খরচ মেটাতে হয়, তাহলে তিনি যেন নিজ দায়িত্বে আমাকে তা জানিয়ে দেন।

তবে কিছুদিন পরই জিম ও তাঁর সহকারী প্রতিবেদন বাজেট তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে টাকাটা বের করতে সমর্থ হলেন। নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দে কিছু টাকা অতিরিক্ত পড়ে ছিল এবং তা দিয়েই তাঁরা আমার খরচ মেটালেন। তবে খরচটা মোটেই বেহুদা ছিল না। আমি আর মাইক প্রচুর ছবি ও গল্প নিয়ে ফিরে আসি, যা *সানডে সান*-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পুরোটা সময়ের সংবাদ ছাপানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

জন এরপর *ডেইলি রেকর্ড* ও স্কটল্যান্ডে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি এডিনবার্গভিত্তিক স্কটমিডিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

তবে যা-ই হোক, নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে ২০০১ সালে আবার দুবাই এসে আমি ইসলামাবাদে কাজ করার পরিকল্পনা সাজাতে লাগলাম। কাজটা আমার কাছে একই সঙ্গে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মতো। যদিও আমি নিউ ইয়র্কে যেতে চেয়েছিলাম, তবে ওখানকার পরিস্থিতি ও মানুষের কষ্ট দেখে শহরটাকে ঘিরে আমার সুখস্মৃতিগুলো মুছে যেতো।

হ্যাঁ, ওই সময় জিম সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিউ ইয়র্কে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। এই দৃশ্যের পরবর্তী অংশগুলো ইসলামাবাদকে ঘিরেই বাস্তবায়িত হবে। ভয়ংকর মর্মস্পর্শী এই হামলার পরবর্তী ইতিহাস নিউ ইয়র্কেই লেখা হবে।

ওই মুহূর্তে আমার মায়ের ফোন এলো। চিন্তা করে দেখুন, মা কী পরিমাণ অবাকই না হয়েছিলেন, যখন তিনি আমি নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছি কি না জানতে চাইলেন আর আমি বললাম যে আমি ইসলামাবাদ! তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন–কেন আমি ইসলামাবাদ যাচ্ছি? আমি অভয় দিয়ে মাকে চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। আমার বলা উচিত ছিল, যেন শয়তানের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে যাচ্ছি।

আমার বয়স ৪৩ (এখন পুরো পৃথিবী জানে আমার বয়স) হলেও মা আমাকে এখনো কোলের শিশুই মনে করেন। আমি যেন পরিবারের সেই ছোট্ট মেয়েটি। আমি মাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকলেও তাঁর উদ্বেগ বেড়েই যাচ্ছিল। যখনই আমি আকণ্ঠ বিপদে নিমজ্জিত হই এবং এর পেছনে কোনো পুরুষের দায় থাকে, তখনই জয়েস জিম মুরের প্রতি বন্দুক তাক করেন। মা তখন পারলে সেই ব্যক্তিকে একরকম খেয়েই ফেলবেন। তিনি ভাবেন, ওই পুরুষ ব্যক্তি আমাকে রাশিয়ার পতিতালয়ে বিক্রি করে দেবেন এবং তিনি কখনোই আর আমার দেখা পাবেন না।

এরই মধ্যে বাবাও ফোনে চলে এলেন এবং তিনি আমাকে ফিরতি ফ্লাইট ধরেই লন্ডন চলে আসার আদেশ দিলেন। আমার আরও দায়িত্বশীল চাকরি খোঁজা উচিত বলেও তিনি জানালেন। যদিও মা-বাবার চিন্তা করাটা যৌক্তিক, তবে একই সঙ্গে ভয়ও লাগছিল, নতুন বসের কাছে আমার মানসম্মান ধুলোয় মিশে যেতে পারে। আমি মাকে উল্টাপাল্টা কিছু না করতে অনুরোধ জানালাম এবং সতর্ক করে দিলাম, যদি আমার অফিসে মা ফোন দেন, তাহলে আমি সবার কাছে হাসির পাত্র হয়ে যাবো।

মনে পড়ে গেল শেষ যখন তাঁরা আমাকে একটা উপযুক্ত চাকরি খুঁজতে বলেছিলেন। আমি তখন *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*-এ কাজ করতাম। এক সপ্তাহ বাবা-মা আমার সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। রাত দুইটার দিকে এক পার্টি শেষে বাসায় ফিরেছিলাম। পরনে ছিল টাইট জামা, পিভিসি স্কার্ট, উদ্ভট একটা গলাবন্ধনী ও কতগুলো রং-বেরঙের রুমাল ঝুলছিল কোমরের বেল্ট থেকে।

আমি প্রায় লুকিয়ে বাসায় ঢুকেছিলাম। একটু পরই মা একটা গরম চকলেট ড্রিংকস নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার সাজপোশাক দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মা যেন আবার আমাকে পতিতা ভাবতে শুরু না করেন তাই বললাম, সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। মা এরপরও আমাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মানের চাকরি বেছে নিতে বললেন।

আমি জানি, কাঁধে অনেক দায়িত্ব নিয়ে ঘুরি। বিশেষ করে, ডেইজির জন্য আমার অনেক কিছু করতে হবে। তবে আমি মেয়ে ও চাকরি দুটোকেই সমান ভালোবাসি। আমার মতে, দায়িত্ব কখনোই কাজের প্রতিপক্ষ হতে পারে না। বিশেষ করে, কন্যাসন্তানের মা হওয়া মানে এই নয় যে, আমি

আমার ভালোবাসার পেশাটাকে বিসর্জন দেবো। সাংবাদিক ছাড়া সাংবাদিকদের দুঃখ কেউ বোঝে না। তাই একজন সাংবাদিকের পক্ষে অন্য পেশার কারও সঙ্গে ঘরসংসার টিকিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার।

আমার প্রথম স্বামী কিম ছিল আমার বাল্যকালের বন্ধু। সে সাংবাদিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তার মতে, এটা একেবারেই অসম্মানের এবং এর জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। নয়টা-পাঁচটার নির্ধারিত অফিসে কাজ করলে ও আরও খুশি হতো বলে আমি নিশ্চিত। বিয়ের পরপরই আমি ফ্লিট স্ট্রিটে *ডেইলি মেইল*-এর চাকরি ছেড়ে নন্দার্ন ইকোতে যোগ দিই। অথচ, কিমের গলা যেন টাইনে ব্রিজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমার সঙ্গে দেখা করার সময়ই পেত না সে।

এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই আমাদের সংসার নরকে পরিণত হলো। আট বছরের একটা সম্পর্কের বাঁধন আলগা হয়ে এল। প্রায় দুই বছর পর আমি পুলিশের আঞ্চলিক অপরাধ বিভাগের সার্জেন্ট জিম ম্যাকিন্টোশকে বিয়ে করি। আমার চেয়ে ২০ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও সে খুবই সুদর্শন ছিল। তার চাকরিতে সে ভালোই সুনাম অর্জন করেছিল। আমার দিনও বেশ চলে যাচ্ছিল। ওই সময় আমি প্রথমে *নিউক্যাসল জার্নাল*-এ কাজ করতাম। পরে সাপ্তাহিক *সানডে সান*-এ যোগ দিই। সেখানে আমার প্রথম রবিবারের সাপ্তাহিকে কাজ করার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়।

আবারও ফ্লিট স্ট্রিট ঝামেলা পাকায়। এই সড়কে প্রচুর সংবাদপত্রের অফিস রয়েছে। কিম কিছুতেই লন্ডনে আসতে চাইত না। কিম টাইনে ব্রিজের সঙ্গে আঠা দিয়ে লেগে থাকলেও জিম যেন আসন পেতে বসে ছিল সেখানে।

আমি অবশ্যই ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করি। তাই জিমকে যতই উগ্রবাদী বলে গালি দিতাম না কেন, তাতে করে ঝগড়ার সুতা টানা সম্ভব হয়নি। বোকার স্বর্গে থাকাটা সুখকর হলো না। এর পরের কয়েক বছর এখানে-সেখানে স্থানীয় পত্রিকার অফিসে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ালাম। তবে প্রতিটা অফিস থেকেই একটু একটু করে অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারী করে বের হতাম। নিজস্ব সাংবাদিকতার জগতে একটু একটু করে পরিচিতি বাড়তে লাগল। ১৯৯০ সালের দিকে আমি আর জিম বহুদূরে চলে গেলাম। এর পরই মনে হয় জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করে বোধ হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম। দুই বছর পর হঠাৎ ডেইজির বাবা দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। চার বছর আমরা

সুখে-দুঃখে কাটিয়েছি। এর পরে ইসরায়েলি রনি হেমশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধি। দুই বছর পর আবার পুরোনো চক্রেই আমার বিয়ের ভাগ্য ঘুরপাক খেতে লাগল। আবার পৃথক হয়ে গেলাম। তবে দাউদের সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। কিন্তু রনির সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে কোনো দিন যোগাযোগ হয়নি।

যা-ই হোক, দুবাই বিমানবন্দরের বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনটা অস্থির হয়ে গেল। লাইনটা কেটে দিয়ে একটু সামনে এগোতেই সুন্দর একটা সামুদ্রিক খাবারের দোকান চোখে পড়ল। মায়ের ওপর রাগ ঝারতে একটা মাছের ডিম, লবস্টার ও আরও কিছু সামুদ্রিক মাছের অর্ডার করলাম। মা আমার ছোটখাটো অপব্যয়গুলো একদমই সহ্য করেন না। আজ টাকা একটু বেশি খরচ হলে হোক। খাবারটা বেশ সুস্বাদু ছিল এবং চেটেপুটেই সব শেষ করলাম। পাকিস্তান যাওয়ার পর এভাবে ইচ্ছামতো আরাম করে খাওয়ার সুযোগ মিলবে না, তা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

গরম ও মসলাদার খাবার আমার একদমই পছন্দ নয়। ফলমূল ও সবজিও আমার পেটে সয় না। পাকিস্তানের অখাদ্য খাবার দিয়ে ক্ষুধা মিটবে কি না তা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল, ক্ষুধা মেটাতে সিগারেটই যথেষ্ট।

ওয়াইনের শেষ ফোঁটাটুকু পেটে চালান করে দিলাম। মুখে একটা বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল। মায়ের সঙ্গে এ যাত্রা জিতে গেলেও যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো জেতা হয়নি। আমি খোদার কাছে মিনতি জানালাম, মা যেন আমার সম্পাদককে ফোন না দেন। কবে জানি মা আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগান অথবা আমার লেখার কাগজে বিষ মিশিয়ে রাখেন, মা সম্পাদককে ফোন দিয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবেদক সন্তানকে দূরে পাঠানোর জন্য তিরস্কার করছেন, দৃশ্যটা আমার জন্য কতোটা অপমানের।

আমি মা ও বাবাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভালোবাসি। তবে আমাকে নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা আমার পছন্দ নয়। মাঝেমধ্যে ভয় লাগে, ডেইজি বড় হলে আমিও কি এমন অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হয়ে যাব? তবে ডেইজি মোটেও হেঁয়ালি মেয়ে নয়। ও অনেকটা শক্ত ধাতুতে গড়া। ও জীবনেও যা-ই করুক না কেন, আমার বিশ্বাস তা কখনোই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। এতো বিশ্বাস আমার ওর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই জন্মেছে।

আমার কেনিয়ার মরুভূমিতে সাফারির কথা মনে পড়ে গেল। আমি আর ডেইজি বিশালাকৃতির কচ্ছপের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। কচ্ছপের মালিক ডেইজিকে কচ্ছপের পিঠে ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

আমি পুরোনো অভ্যাসের মতোই ওর কানে কানে বললাম, সুযোগের সদ্ব্যবহার করো মেয়ে, কিন্তু সে একবারও রাজি হলো না। একসময় কেনিয়ান কর্মীরা একরকম জোর করেই ওকে প্রাণীদের পিঠে তুলে দিল। কয়েক সেকেন্ড পর ডেইজির ভয়ার্ত চেহারাটা বদলে গিয়ে মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটে ওঠে। ও ছবি তোলার জন্য আমাকে চিৎকার করে বলতে থাকে। পরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ও প্রথমবার উঠতে চায়নি। ডেইজি ভেবেছিল, এটা ওকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাবে। আমরা দুজনই হেসে দিই কথা শুনে। এরপর আমি আরও একবার ওকে বলি, সব সময় সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়। কোনো কোনো সুযোগ দ্বিতীয়বার আসে না।

দুবাই থেকে উড়োজাহাজ উড়াল দেওয়ার পর থেকেই পূর্ব দিকে সময়ের ব্যবধান কমতে লাগল এবং লাহোরে নামার আগ পর্যন্ত আমি ঝিম মেরে বসে রইলাম। বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ বিমান ধরার জন্য দুই ঘণ্টা বসে থাকি। বিমানবন্দরেই দুজন সাংবাদিককে ইতস্তত পায়চারি করতে দেখলাম। তাঁদের চলন-বলন ও জিনিসপত্র দেখেই বুঝে ফেলি আমরা একই পথের পথিক। এগিয়ে এসে আমিই তাঁদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করি। দুজনই চেক টেলিভিশনের কর্মী। তাঁরা আমার থেকেও দুঃসাহসী। উত্তর পাকিস্তানের পেশোয়ার সীমান্ত পেরিয়ে তাঁদের আফগানিস্তানে ঢোকার অভিপ্রায়। আমি তাঁদের শুভকামনা জানালাম। আমরা একই বিমানে ইসলামাবাদ পর্যন্ত গেলাম।

ইসলামাবাদে নামার পরই *এক্সপ্রেস* পত্রিকার অফিস থেকে খুদে বার্তা পেলাম। তারা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো পশ্চিমা ধাঁচের হোটেলেই একটি রুম ঠিক করে রেখেছে। সেই সঙ্গে ভাড়ায় চালিত একটি গাড়ির দোকানের নাম্বারও পাঠিয়েছে। অথচ আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে গাড়িচালক। আমার মতে, মেয়েরা ভালো গাড়ি চালাতে পারে না। আমি একরকম কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছিলাম যে, আর যা-ই হোক, পাকিস্তানে আমি নিজ হাতে গাড়ি চালাতে যাচ্ছি না।

একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আমি হোটেলে চলে এলাম। টানা ৩৬ ঘণ্টা শুধু আকাশপথেই ভ্রমণ করেছি এই কদিন। এর মাঝে হিথরো বিমানবন্দরেই থাকতে হয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এতো দীর্ঘ ভ্রমণে গা থেকে উটচালকের পোশাকের মতো দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। দ্রুতই আমাকে দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করে ফ্রেশ হতে হবে। আমার মেজাজও একই সঙ্গে বিগড়ে গেছে ক্লান্তিকর ভ্রমণে।

অভ্যর্থনা ডেস্কের লোকটা আমার কথা শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমার নামের বুকিং নাকি বাতিল হয়ে গেছে এবং হোটেলে নাকি কোনো সিট খালি নেই। খুব সম্ভব কোনো একজন সাংবাদিক এই চালাকিটা করেছে। কোনো প্রতিবেদক হয়তো হোটেলে এসে রুম খালি না পেয়ে আমার নামের বুকিং বাতিল করে দিয়েছে। আমি যে পাকিস্তানে এসেছি, তা ততোক্ষণে সাংবাদিকমহলে রটে গেছে।

দুর্ঘটনা যতোই ভয়াবহ বা দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন, অনেক কনিষ্ঠ সাংবাদিক পেশাদারির ধারেকাছ দিয়েও হাঁটে না। এরা সবসময়ই নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে এবং সবার আগে নিজের পত্রিকা বা চ্যানেলে খবর প্রচারের জন্য নৈতিকতার ধার ধারে না। আমার মনে আছে, ১৯৮৮ সালের দিকে যখন লকারবির আকাশে বিমান দুর্ঘটনা ঘটে, তখন থাকার জায়গা ও খাবার নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে কতো অপেশাদার আচরণ ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল।

বিশেষ করে, *ডেইলি স্টার*-এর একজন প্রতিবেদক সকালের নাশতা খেতে সবাই যখন হোটেলের নিচে গেছে, তখন একজন টেলিভিশন কর্মীর ব্যাগ গুছিয়ে করিডরে ঠেলে দিয়ে হোটেলকক্ষ দখলে নিয়ে নেয়। খবরটি শুনে হোটেল ব্যবস্থাপকও ভিরমি খেয়ে পড়েন। কারণ, *ডেইলি স্টার*-এর ওই প্রতিবেদক আসার একটু আগেই তিনি নাকি একটা ফোন কল পেয়েছিলেন, যাতে টেলিভিশন কর্মীর ব্যাগ গুছিয়ে দ্রুত নিচে নিয়ে যেতে বলা হয়।

তাই বুঝতেই পারলাম, এই সস্তা প্রতারণা করে কোনো বদমাশ আমার রুমটার দখল নিয়েছে। আমিও ওই নচ্ছার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারতাম। কিন্তু ক্লান্তিতে আমার শরীর বিদ্রোহ করে বসে। একই সময় আরেকটা ট্যাক্সি এসে আমাকে ম্যারিয়টে নিয়ে যায়, যেখানেও আমি কোনো

কক্ষই খালি পেলাম না। মনে হচ্ছিল, দুনিয়ার সব পত্রিকা, টেলিভিশন ও বেতারের কর্মীরা ইসলামাবাদে এসে জড়ো হয়েছেন।

ম্যারিয়টের অভ্যর্থনাকর্মী হয়তো সত্যিই আমার জন্য সমবেদনা দেখিয়েছিল অথবা আমাকে দ্রুতই হোটেল লবি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। কারণ, কয়েকটা ফোন করেই সে আমাকে ক্রাউন প্লাজায় পাঠিয়ে দেয়।

ক্রাউন প্লাজায় পৌঁছেই যখন দেখলাম হোটেলে দুনিয়ার নানা প্রান্তের সাংবাদিক গিজগিজ করছে এবং যুক্তরাজ্যের কেউই সেখানে নেই, তখন ভাবলাম, এর চেয়ে ভালো কিছু হতেই পারত না। আমি একটু নিভৃতচারী এবং ব্যাগ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে সংকোচ কাজ করে। পরিচিত কোনো সহকর্মী না থাকায় আমি একাই কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই কাজ করতে পারব। কারণ, পরিচিত কাউকে পেলেই সাংবাদিকেরা গল্পের ছলে আরেকজনের প্রতিবেদন বা অনুসন্ধান সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করে।

তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*-এ কাজ করার সময় কেউই তার পাশের ডেস্কের সহকর্মীকে তার কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেত না। সেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল এতোই কঠোর। এখানকার অফিসের পরিবেশে পেশাদারির অসাধারণ ছাপ ছিল, যা দুনিয়ার অন্যতম সেরা। যদিও এদের বিরুদ্ধে গল্প ফাঁদার অভিযোগ রয়েছে, তবে তা সত্যি নয়।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*-এর সম্পাদক মূল খবরের ২০ শতাংশ তথ্য হাতে রেখেই খবর ছাপাতেন, যাতে করে অপরাধী বা নির্যাতিত ব্যক্তি অভিযোগ জানালে অথবা মামলা করলে তার জবাব দেওয়া সম্ভব হয়। কেউ এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলেই অবশিষ্ট খবর পরবর্তী সপ্তাহে আকর্ষণীয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে ছাপিয়ে দেওয়া হতো।

এখান থেকেই আমি *সানডে টাইমস*-এ যোগদান করি, যেখানে অনুসন্ধানী খবরের দলে ডেভিডের অধীনে কাজ করি। ডেভিড পরে বার্তাকক্ষের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। ডেভিডের সঙ্গে কাজ করার সময়টা খুব আনন্দে কাটত। ও ছিল সব গোপন খবরের সিন্দুক। তবে কখনো কোনো গোপন সূত্রের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে ও ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আমি সর্বদাই ডেভিডের কাজের প্রশংসা করতাম এবং ওর সঙ্গে

অনুসন্ধানী দলে থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের আগাগোড়া সব শিখে ফেলি। আজকের পরিস্থিতিতে থাকলে ডেভিডও একা কাজ করা পছন্দ করত।

এবং তা-ই হলো। ক্রাউন প্লাজায় আমি নিরিবিলি একটা কক্ষ পেয়ে গেলাম। জিমকে ফোন করে ওকে বেশ হাসিখুশিই মনে হলো। তার মানে, মা ওকে ফোন দিয়ে আমাকে ফেরত নিয়ে টেবিলে বসে করা কাজের চাকরি দিতে বলেননি।

জিমকে বললাম, আমি ঘেমে নেয়ে একাকার, গা দিয়ে উৎকট গন্ধ বের হচ্ছে। গোসল করাটা অতীব জরুরি। খুব স্বাভাবিক ও নির্বিকার ভঙ্গিতে জিম আমাকে বলল, খুব তাড়াহুড়ো নেই। তবে আমি যেন বিকেল তিনটার মধ্যে এক হাজার শব্দের একটা প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিই। কীভাবে গেলাম, কোথায় নামলাম, কোথায় উঠলাম–এসব ছোটখাটো ব্যাপার। মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি, রাগে জিমের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করল।

আমি আমার দামি ও পছন্দের লুইস ভিটনের স্যুটকেসটা খুলতে গিয়েই দেখি, কোন হতচ্ছাড়া চেইনের মাঝের একটা সেলাই কেটে ফেলেছে। সব বের করার পর খুঁজে দেখলাম, মাত্র তিনটা জিনিস নেই। বাবার এক জোড়া মোজা (এখন বাবা বুঝতে পারবেন কেন তিনি কখনোই মোজা খুঁজে পান না। সব তো তাঁর আদরের মেয়েই লুকিয়ে মেরে দেয়) এবং অর্ধেক খালি একটা টুথপেস্টের টিউব। দুনিয়া কত বিচিত্র!

যা-ই হোক, উৎকট দুর্গন্ধ তাড়াতে সময় নিয়ে গোসল সেরে নিলাম। কোথায় যাব, কী করব এসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। আর মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে জিমকে একটা এক হাজার শব্দের বিরক্তিকর প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

চমৎকার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক শহরে উঠেছি, যেখানে আমি তিনটি হোটেলের অভ্যর্থনাকারীদের ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। এবং এদের কারও সঙ্গেই আমার বেশি কথাবার্তা হয়নি। এখানকার ভিন্ন সংস্কৃতির উপযোগী গায়ে দেওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। চুলগুলোও কেমন জট পাকিয়ে আছে। আমার আগে থেকেই সব প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় পেলাম কোথায়? একই সঙ্গে চুলের দুঃখে কান্না পেল আমার। কেন যেন আমার ছুটির দিন সোমবারে কোনো চুলের রূপচর্চাকারী কাজ করে

না। পৃথিবীর দুটি রহস্যের অন্যতম একটি রহস্য এটা। আরেকটি হলো, কেন ছেলেদের স্তনগ্রন্থি থাকে।

এসব উদ্ভট অর্থহীন চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। ভীষণ ক্লান্তি এসে ভর করলেও কাজে মনোনিবেশ করলাম। বার্তাকক্ষ আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

# জালোজায়ির রোদনভরা দৃশ্য

প্রথম যে জিনিসটা আমার খুব দরকার ছিল, তা হলো ইংরেজি জানা একজন ড্রাইভার। আমি লবিতে গিয়ে রিসেপশনিস্টকে জানাতেই সে দ্রুত আমার জন্য ইংরেজি জানা একজন ড্রাইভার ডেকে দিল এবং আমরা বেরিয়ে পড়লাম। খানিক বাদেই আবিষ্কার করলাম, তার ইংরেজির ভাণ্ডারে শুধু 'ওকে' শব্দটাই রয়েছে। হায় খোদা, আমাকে অন্ধ করে দাও! আমার মনে হতে লাগল, ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি হোটেল লবিতে ফিরে এলাম এবং বিনয়ের সঙ্গে একজন প্রকৃত ইংরেজি জানা ড্রাইভার খুঁজে পেতে সাহায্য চাইলাম। পাকিস্তানিদের আমার খুব ভালো লাগে। তারা খুবই সাহায্যপ্রবণ। কেউ কোনো সাহায্য চাইলে তারা অপারগতা প্রকাশ না করে কিছু একটা করার চেষ্টা করে।

যা-ই হোক, ক্রাউন প্লাজার কর্মীরা এবার আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করল। মিনিট পাঁচেক পরই পাশার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। ৩০ মিনিটের মধ্যেই ওকে আমার নতুন বন্ধুর তালিকায় যোগ করে ফেললাম।

পাশা অনর্গল ইংরেজি বলে। ও সারা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেছে এবং খুব হাসিখুশি ও আন্তরিক। আমি যা চাইতাম ও তাই জোগাড় করার চেষ্টা করত। সহজ, সরল, অসাধারণ পাশা।

পাশার বাদামি চোখ দুটো খুব মায়াবী। ওর গোলগাল মুখের চিবুকটাতে এক গোছা দাড়ি। ওর মাথার ঘন কালো চুলের ঘনত্ব কমে আসছিল এবং মনে হলো ও সদ্য চল্লিশের ঘরে পা দিয়েছে। হাসলে ওর মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত। সামনের দিকে দাঁতের মাঝে একটু ফাঁকা ছিল। যদিও অত বেশি লম্বা নয়, তবে কয়েক দিন আগে নাকি বাস্কেটবল

খেলতে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে। এখন ক'দিন তাই খেলা বন্ধ। পরের দিকে মাঝেমধ্যে ওর হাঁটা দেখে বুঝতে পারতাম যে ওর পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা করছে। কিন্তু পাশা কোনো দিনই এ নিয়ে অভিযোগ করেনি।

আমার লক্ষ্য ছিল কয়েকজন রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে সীমান্তের ওপারে ঘটে চলা রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কথা বলা এবং পাকিস্তানের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে, তা জানতে চাওয়া।

আমরা কাছেই ছোট একটা রেস্তোরাঁয় গেলাম এবং সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচিত হলাম। চা খেতে খেতে গল্প জমে উঠল, এক ঘণ্টা ধরে গল্প চলতেই লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি আমার ওই দিনের প্রতিবেদনের যাবতীয় তথ্য পেয়ে গেলাম। অফিসে জানানোর জন্য হোটেলে ফিরে এলাম।

সাংবাদিকতার মাপকাঠিতে এটা খুব বড়সড় কাজ ছিল না। তবে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে খবরের পাতায় বড় আকারের শিরোনাম দেওয়ার মওকা সৃষ্টি হলো : 'ইভন রিডলি ইসলামাবাদে'!

খবরের জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় খাপছাড়া এবং আমরা খুব আনন্দিত হলাম যখন জানতে পারলাম, *মেইল অন সানডে*র প্রতিবেদক আবুধাবি বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্বের কারণে আটকা পড়েছে এবং তখনো কোনো প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি।

এরই মধ্যে *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর কোনো বিভীষণ *মেইল অন সানডে*কে জানিয়ে দিয়েছে, আমি ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদে পৌঁছে গেছি। তাই আমার পিছু পিছু তারাও কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছে। হাল ছাড়তে কেউই রাজি নয়।

আমাকে জানানো হয়েছিল, *মেইল অন সানডে* আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু ইভান গোলাঘ্যারকে পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। যদিও আমি ওর সঙ্গ দারুণ পছন্দ করি, তবু পেশাদারির খাতিরে চাইছিলাম ও অন্য কোনো হোটেলে উঠুক। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বোধ করি, ইভান পেশোয়ারে অবতরণ করে এবং পার্ল কন্টিনেন্টালে ঘাঁটি গাড়ে।

রোববার আমরা একটা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণে গেলাম। পাশার মতে এটা ছিল কোনো একটা মাদরাসা বা ইসলামি বিদ্যালয় ধরনের এবং মুসলিম বিশ্বে এর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে আমাকে স্থানীয় পোশাক ও মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধতে অনুরোধ করল। তাই আমরা রাওয়ালপিন্ডির একটা বাজারে ঢুঁ মারলাম। একটা পাশমিনা শাল খুব পছন্দ হলো। আমি

পাশাকে নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও স্থানীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে ধারণা দিতে অনুরোধ করি। এ-ও বলে দিই, আমি যদি কখনো ওর সঙ্গে অথবা অন্য কারও সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করি, তাহলে ও যেন আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দেয়। এই দেশে আমি এর আগে কোনোদিন আসিনি। স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।

একটা লম্বা কালোমতো পোশাক গায়ে জড়ালাম এবং আরামদায়ক চামড়ার জুতা জোড়া পায়ে গলিয়ে দিলাম।

অবশেষে উত্তর প্রদেশের নওশারাতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে একটা খুবই সাধারণ সাদা রং করা ছোট গম্বুজবিশিষ্ট একটা মসজিদ দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, এটা কি মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান!

জানতে পারলাম, প্রতিবছর বাদামি চামড়ার শ্মশ্রুমণ্ডিত হাজার হাজার তরুণ এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং এদের ৯০ শতাংশই তাদের স্বপ্নের নায়ক উসামা বিন লাদেন ও তালেবানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আফগানিস্তানে চলে যায়। বিন লাদেনকে এই আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক একটা ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা একে জামিয়া হাক্কানিয়া বলে ডাকে।

আমি নিশ্চিত, আমেরিকানরা একে সন্ত্রাসের সূতিকাগার বলে অভিহিত করবে। তবে যত দিন পর্যন্ত এখানকার শিক্ষকেরা সচেতন থাকবেন, তত দিন এটি হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের মতোই একটি বিশ্ববিদ্যালয়। আট বছরের শিক্ষাজীবনে ছাত্রদের ইসলামি জ্ঞানের প্রতিটি দিক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মুসলিম যুবক এখানে পড়তে আসেন। মাওলানা (অধ্যাপক) সামিউল হক প্রতিষ্ঠানটি চালানোর দায়িত্বে আছেন। তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও খুবই সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা যেদিন গেলাম, সেদিন তিনি লাহোরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলিম পণ্ডিতদের সঙ্গে একটা বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। একই রাতে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আমাকে একটা ছোট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বসে অপেক্ষা করতে বলা হলো। দুজন অল্পবয়সী ছেলে বিছানায় ঘুমাচ্ছিলেন। একটু পরই মাওলানার ছেলে হামিদুল হক এলেন এবং আমরা সবাই পায়ের ওপর পা তুলে বসে কথা বলতে লাগলাম।

হামিদ, যিনি নিজেও একজন মাওলানা, আমাকে নিশ্চিত করলেন, প্রতিষ্ঠানের অনেক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বেশ কয়েকবার বিন লাদেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা সবাই তাঁকে একজন সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, লাদেন একজন ধার্মিক মানুষ, যিনি পাশ্চাত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না, জর্জ বুশ অথবা টনি ব্লেয়ার উনার কথার সঙ্গে একমত হবেন কি না। তবে আমি এই উৎসাহী তরুণ ব্যক্তির কথা শুনতে লাগলাম।

তিনি জানান, আমেরিকার প্রতিশোধের কথা শুনে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এই মাদরাসায় কোনো উগ্রবাদী অথবা হবু জঙ্গিদের আস্তানা রয়েছে, এমন কথায় তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বেশ দৃঢ়চিত্তেই বললেন, এখানে সবকিছুই শৃঙ্খলার গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং কোনো অস্ত্র তো দূরে থাক, একটা বোমাও সেখানে নেই। আমেরিকানরা যে হামলার পেছনে বিন লাদেনই কলকাঠি নেড়েছেন বলে অভিযোগ করছে, তা নাকচ করে দিলেন তিনি। এই ঘটনাকে তিনি একটি দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করলেন। পশ্চিমাদের কাছে যতই অশোভন মনে হোক না কেন, পাকিস্তানে আমি যার সঙ্গেই কথা বলেছি, অধিকাংশ ব্যক্তি এই পাশবিকতাকে খুব সুন্দর করে একটি দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছে।

হামিদ বললেন, উসামা বিন লাদেন যখন আমেরিকার টাকায় রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তখন তিনি ছিলেন আমেরিকার নায়ক। এখন তারাই আবার তাঁকে শত্রু বানিয়েছে। এই কথার লড়াই চলতে থাকলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে। এর ফলে অসংখ্য মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি মারা যাবে বলে হামিদ ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

এই কথা বলার সময় হামিদ খুব শান্ত, ধীরস্থির ছিলেন এবং তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথাটা বলেন; যা শুনে আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেল।

চলে আসার সময় আমি পাশার বক্তব্য শুনতে চাইলাম। পাশা তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়েই বেশি চিন্তিত এবং তাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসার

চিন্তা করছে বলে জানায়। পাকিস্তানের আট কোটি মধ্যমপন্থী মুসলমানের মতো সেও যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার শঙ্কায় ছিল। কথা শুনে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পরিণতি নিয়ে সে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বলে মনে হলো।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফের আবেগপূর্ণ বক্তব্যের আগেই এত সব ঘটেছিল। তিনি জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং জনগণের সমর্থন কামনা করেন। লোকটা শাখের করাতের নিচে আটকা পড়ে ছিল। তবে টিভিতে তাঁকে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নই মনে হলো।

তালেবানরা ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে যুদ্ধে কোনোরূপ সাহায্য না করার জন্য সতর্ক করে দিয়ে এর পরিণতি পাকিস্তানের জন্য ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এর কিছুদিন পরই জানতে পারি, খাইবার পাসের সন্নিকটে তোরখাম সীমান্তে চারটা স্কাড মিসাইল আমাদের দিকে তাক করে মোতায়েন করা হয়েছে।

আমি বন্ধু সামরিক উপদেষ্টা পল বিভারকে ফোন করে স্কাড নিয়ে মতামত জানতে চাইলাম। জবাবে ও ভয়ের আশঙ্কা নাকচ করে দিয়ে জানাল, এসব পুরোনো প্রযুক্তির স্কাড কখনোই ইসলামাবাদে আঘাত হানতে পারবে না। তবে সে একই সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডি ও পেশোয়ার থেকে ১০০ হাত দূরে থাকতে উপদেশ দিল। আমি লন্ডনের খবরাখবর জানতে চাইলাম এবং বাড়ি ফেরার জন্য উদাস হয়ে গেলাম।

আমি পাশাকে জানালাম, আমি আফগানিস্তান যেতে চাই। সে অনুযায়ী প্রথম সোমবার আমরা দূতাবাসে ভিসা সংগ্রহের জন্য গেলাম। তবে *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর বার্তা প্রতিবেদক ডেভিড লেভ আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তার মতে, আমি ভিসা পেয়ে যেতে পারি কিন্তু আফগানিস্তান থেকে সব সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে আমাকে উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনের উপদেশ দেয়।

আমি ওর কথায় থোড়াই কেয়ার করলাম। পাশাকে আমার *ডেইলি মেইল* ও *সানডে*র দুই পুরুষ বসের ব্যাপারে গল্প শোনালাম। ও আমার বকবক শুনে দারুণ মজা পেল। ম্যাডামের কথায় (ও আমাকে এভাবেই ডাকে) ও হাসতে লাগল।

আমার তখনো শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা ভেবে নিজেকে ধন্য মনে হলো। সবকিছু সত্ত্বেও এই পুরুষ বার্তা প্রতিবেদক সত্যিকারের ভালো সাংবাদিক। আমি তখনো একটুও বিচলিত হইনি এবং সামনের দিনগুলো নিয়ে আমার খুব বেশি উদ্বেগ হয়নি।

তবে ডেভিড গল্প বিক্রি করতে বেশ উস্তাদ। সম্পাদকদের যেকোনো বৈঠক, যেখানে পরবর্তী ইস্যু নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়, সেখানেও ডেভিড তার প্রতি আকর্ষণ ধরে রাখতে চেষ্টা করে। কনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে সে অনেক ভালো ও সহযোগিতামূলক আচরণ করে।

ডেভিডের আগের জন ছিল একেবারেই অন্য রকম। তার সঙ্গেও আমার ভালো সম্পর্ক ছিল তত দিন, যত দিন ওই ব্যাটা পদোন্নতি পায়নি। এরপর তার মাঝে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তাকে একদমই সহ্য করা যেত না। সে চলে যাওয়ার পরে মনে হয় না আমার থেকে বেশি কেউ খুশি হয়েছে। কারণ, তত দিনে আমি আবার মনোযোগ কেড়ে নিয়ে প্রথম পাতায় চলে এসেছি। আহ্ কী শান্তি!

পাশার সঙ্গে পরনিন্দা করতে করতে একসময় পেশোয়ারের উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছে গেলাম। এখানকার অবস্থা সত্যিই করুণ। কিছু কিছু দৃশ্য ছিল দারুণ বেদনাদায়ক। বাস্তবতার এই নির্মম পরিহাস দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে বদলে দেয়। অফিসের নোংরা রাজনীতি ভুলে গিয়ে আমি মানবতার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেছি।

আমাদের সঙ্গে পেশোয়ারে এক আফগান আলোকচিত্রী গাফফার বেগের পরিচয় হলো। সেও আমাদের সঙ্গে এখানে চলে আসে। পাকিস্তানের পরিস্থিতি প্রায়ই মশা মারতে কামান দাগার মতো হয়ে দাঁড়ায়। ডন গ্রুপের পত্রিকার সাংবাদিক গাফফারের সহকর্মী মোহাম্মদ রিয়াজও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মোহাম্মদ ১৯৯৯ সালে কিছুদিন লন্ডনে *গার্ডিয়ান* ও *অবজারভার* পত্রিকায় কাজ করেছে ফারিঙ্গটন রোডে। উদ্বাস্তু শিবিরের কর্মকর্তাদের ওপর ওর বেশ প্রভাব ছিল। ওর কারণে আমার শিবিরে কাজ করতে গিয়ে খুব একটা সমস্যা পোহাতে হয়নি।

শিবিরের রাস্তা ধরে হাঁটতে গিয়ে আমার নিজেকে বংশীবাদক মনে হতে লাগল। আমার সঙ্গে গাফফার, মোহাম্মদ, ওখানকার কর্মকর্তা হাঁটছিল। পেছন পেছন আসছিল একদল উৎসাহী বাচ্চাকাচ্চা। এদের বাদেও আরও

অনেকেই উৎসুক হয়ে আমাকে দেখছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা হাঁটছিল। আমি থেমে গেলে ওরাও থেমে যেত। আমার মনে হলো, কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এখানকার উদ্বাস্তুরা প্রকৃত চিত্র তুলে না-ও ধরতে পারে। আমি বারবার বারণ করলেও কর্মকর্তারা আমাকে একলা পায়চারি করার অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

আমি মোহাম্মদকে বললাম, এদের সঙ্গে আমি কথা বলতে আগ্রহী নই। আমার সঙ্গে যারা কথা বলছিল, তারা ৫ থেকে ১০ বছর ধরে এখানেই পড়ে আছে। আমি চাচ্ছিলাম অল্প কিছুদিন আগে এসেছে এমন উদ্বাস্তুদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে।

কথা শুনে পাশা, গাফফার ও মোহাম্মদ তিনজনই আমাকে পার্শ্ববর্তী এক ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চাইল। তবে সেখানে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হবে। ওদের বললাম, আগে অনুমতি চাইলে ওরা না-ও করে দিতে পারে। তবে যদি আমরা প্রবেশ করেই ফেলি, সে ক্ষেত্রে ওরা না করতে পারবে না। আমার বুদ্ধি ওদের পছন্দ হলেও এর জন্য বিপদে পড়তে পারি বলে ওরা সতর্ক করে দেয়।

মোহাম্মদ ভ্রমণ-সংক্রান্ত কিছু কাগজ সংগ্রহ করার জন্য চলে যায়। তবে ও খুব দৃঢ়ভাবেই বলে গেল, আফগানিস্তান যাওয়ার ভিসা ও সংগ্রহ করবেই। আমিও ওকে উৎসাহ দিলাম।

যা-ই হোক, আমরা পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ উদ্বাস্তু শিবির জালোজায়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। ওখানকার অবস্থা ছিল আরও করুণ, মর্মান্তিক। এই রকম দারিদ্র্যপীড়িত নোংরা পরিবেশে অনেক আফগান ছিল, যারা ২০ বছর আগে যখন প্রথম আফগানে যুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠে, তখন থেকেই এই শিবিরে বসবাস করছে।

বাড়িগুলো ইট ও মাটি দিয়ে তৈরি। নতুন আসা উদ্বাস্তুরা জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা কাপড়ের তাঁবুতে অবস্থান করছিল। পুরুষেরা অকারণে অলসভাবে বসে গল্প করছিল আর বাচ্চারা খেলছিল। কোথাও কোনো নারী চোখে পড়ল না। অবশ্য পুরুষশাসিত এই সমাজে এমন দৃশ্য বিরল নয়।

কখনো ঘরের বাইরে বের হলে তারা আপাদমস্তক নীল কাপড়ের একটা পোশাক পরে, যাকে বোরকা বলা হয়। এটা দেখতেই গরম লাগে এবং খুব অস্বস্তিকর। আমি মরে গেলেও এমন কিছু গায়ে তুলব না। যদিও আমাদের

পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষেরা এখনো অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তবু আমরা মেয়েরা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আছি।

আমি খেয়াল করলাম, নারীরা দিনের আলো কমে আসার আগে একদম ঘর থেকে বেরোয় না। সন্ধ্যার দিকে তারা পাবলিক টয়লেট ও গোসলখানায় যায়। কাউকে যদি দিনের বেলা রাস্তায় দেখা যায়, তবে তা দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

আমি সত্যিই দুঃখ পেলাম। পুরুষদের মতো সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে কেন এখনো মেয়েদের অপেক্ষা করতে হবে? পূর্ব অথবা পশ্চিম যেখানেই হোক, একবার ভেবে দেখুন, মেয়েদের বলা হলো– তোমরা সন্ধ্যার আগে টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে না! এই রকম কথা বললে কত ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে ভাবা যায়? আমার চোখে তখন লিঙ্গবৈষম্য নাটকের মূল অঙ্ক দৃশ্যমান হচ্ছে।

এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আমি পুরুষদের ক্ষোভের মুখে পড়তে পারি। তাই শিবিরের মেয়েদের দুরবস্থার প্রসঙ্গটা কীভাবে জুতসই ভঙ্গিতে তোলা যায়, এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার চোখ আটকে গেল এক দিকে। শিবিরের এক কোনায় খোলা জায়গায় কেটলিতে গরম পানি ফুটছিল। ছোট একটা মেয়ে কেটলিতে লাঠি দিয়ে টুংটাং শব্দ করছিল। মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসে ছিল। ধুলায় মলিন ওর পা দুটো। উজ্জ্বল বাদামি রঙের চাপা মুখ। বাদামি চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। অবহেলিত কোঁকড়া চুলগুলো জট পেকে আছে। কেটলির আগুনের ধোঁয়ায় মেয়েটির গায়ে কালি জমে গেছে।

মেয়েটির মলিন দশাই এই শিবিরে তারা কতটা ভালো আছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। তবে মেয়েটির করুণ দশা দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসেনি। এটা তো আমার ডেইজিও হতে পারত। দেখতে ঠিক এই মেয়ের মতোই। লক্ষ করলাম, আমার চোখের কোণে জল জমে গেছে এবং গলা ধরে আসছে।

আমার মেয়েটা হয়তো এখন পরিষ্কার ভাঁজ করা ড্রেস পরে স্কুলে তার সহপাঠীদের সঙ্গে বসে আছে। ওর স্কুলটা লেক ডিস্ট্রিক্টের এক পাশে পাহাড়ের ওপর। সামনে থেকে তাকালে বিয়েট্রিক্স পটার প্রদেশের উইন্ডারমায়ার লেক দেখা যায়। প্রতি রাতেই ও বন্ধুদের সঙ্গে খেলা শেষে

গরম পানি দিয়ে গোসল করে। তারপর হয়তো বালিশযুদ্ধ শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে নাশতা করে। ডেইজি আধা ফিলিস্তিনি। অন্য ফিলিস্তিনি বাচ্চাদের চেয়ে ওর কপাল হাজার গুণ ভালো।

অথচ এই ছোট আফগান মেয়েটা একটা মলিন ছেঁড়া জামা পরে বসে আছে। ওর শৈশব আনন্দে কাটছে বলে মনে হয় না। ওর কোনো শিক্ষা নেই, খেলনা নেই, নিশ্চিত কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই মুহূর্তে গরম পানির কেটলি, যেখান থেকে পানি উপচে পড়ে, যেকোনো মুহূর্তে ওর বাদামি পা ঝলসে দিতে পারে। মেয়েটা পরের বেলায় কী খাবে, তা-ই জানে না। নরকযন্ত্রণার উদ্বাস্তু শিবিরে ও বিপজ্জনক ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে।

জীবন বড়ই পক্ষপাতী। এই মেয়েটার কী অপরাধ, যার জন্য ওকে এই নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে যে কারও ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গাটি নড়ে উঠবে। এই ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য আমাকে অনেক দিন ভোগাবে।

আমি এত দিন যাবৎ অনেক পেশাদার আচরণ করে আসছিলাম। হঠাৎ এই দৃশ্যের অবতারণা মনে করিয়ে দিল আমিও একজন মা। এখনো আমার গলা আটকে যায়, যখন ওই করুণ সুন্দর মেয়েটার কথা মনে পড়ে।

উদ্বাস্তু শিবিরে সবার সঙ্গেই আমরা গাফফারের মাধ্যমে কথা বলছিলাম। সবাই আফগানিস্তানের ভাষা পশতুতে কথা বলছিল। গাফফার সেটা উর্দুতে ভাষান্তরিত করছিল। আর পাশা সেটা শুনে আমাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তিন ভাষার বাধা পেরিয়ে আমি ওদের অভিব্যক্তি বুঝতে পারছিলাম। আমরা ছিলাম দুর্দান্ত একটা অনুসন্ধানী দল। আফগানি ও পাকিস্তানি লোক সঙ্গে থাকায় আমরা একটা সুন্দর আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের দল গঠন করতে সক্ষম হই।

ওই দিনও সকালে আমরা জানতে পারি, বিবিসির একজন কর্মীকে এক উদ্বাস্তু শিবিরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল ওদের দেশে বিমান হামলার জবাবে। আর দুজন পশ্চিমা সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, উদ্বাস্তুরা নিজেদের চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো দর্শনীয় বস্তু মনে করতে শুরু

করে। গণমাধ্যমের অনুপ্রবেশ নিয়ে ওদের অভিযোগের শেষ ছিল না। সত্যিই আমি ওদের খুব একটা দোষ দিতে পারি না।

আমি লক্ষ করলাম, সাহায্যকারী সংস্থার কেউ উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে নেই এবং তাদের কার্যালয়গুলো খালি পড়ে আছে। পরে জানতে পারলাম, সব সাহায্যকারী সংস্থাকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আফগান মাটিতে আমেরিকা ও ব্রিটিশদের বোমা আঘাত হানতে শুরু করলে উদ্বাস্তুরা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা নিয়ে চিন্তিত ছিল। কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছিল, শিবিরগুলোতে লুকিয়ে লুকিয়ে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জমা করা হয়েছে পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে।

আফগান জনগণ জন্ম থেকেই যোদ্ধা প্রকৃতির। টিনএজ পার হতে না হতেই তাদের ঘাড়ে সেমি অটোমেটিক অথবা কালাশনিকভ রাইফেল ঝুলতে থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ তাদের সময় কাটানোর অন্যতম অনুষঙ্গ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা নিজেদের মধ্যেই অথবা তাদের মাটিতে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। পরে জানতে পারি, আফগান নারীরা আরও অধিক কঠোর মানসিকতার অধিকারী।

পাকিস্তানে লাখ লাখ আফগান উদ্বাস্তু বাস করে। পেশোয়ারকে একরকম আফগানিস্তানের অংশ হিসেবেই ধরা হয়। এই অঞ্চলে আমেরিকান ব্রিটিশ হামলার পক্ষে কথা বলতে যাওয়া মানে উনুনে ঘি ছড়ানো।

আফগানিরা খুব ঘাড়ত্যাড়া ধরনের এবং কারও অধীনে থাকতে রাজি নয়, এটা সর্বজনগৃহীত সত্য। এদের সঙ্গে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোর মিল রয়েছে। সেখানে কেউই সরকারের নির্দেশ মোতাবেক চলে না। সাধারণ মানুষ তো বটেই, রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না।

*এক্সপ্রেস*-এর বিদেশ প্রতিনিধি আমাকে ফোন করে ছাপানোর জন্য একটা আবেগময় বর্ণিল শিরোনাম বানিয়ে দিতে অনুরোধ করে। আমি নিজেও এমন এক শিরোনামের সন্ধানে ছিলাম। তবে বাস্তবতা হলো, ছাপাখানায় পৌঁছানোর আগেই কেউ একজন এই শিরোনাম বদলে একটা নিরস কঠিন শিরোনাম জুড়ে দেবে, আমাদের জন্য যা দারুণ হতাশার।

পরদিন পাশাকে নিয়ে ভিসাপ্রাপ্তির খবর জানতে আফগান দূতাবাসে গেলাম। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতে হলে একটা চত্বর পেরোতে হয়। সেখানে বেশ কিছু মানুষ চুপচাপ বসে ছিল। তাদের কেমন জানি ভাবলেশহীন

দেখাচ্ছিল। আমি মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছি এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েই বের হয়েছি। আমি সেই আরামদায়ক চামড়ার জুতাটাই পায়ে গলিয়েছি। জুতার ফাঁক দিয়ে আমার উজ্জ্বল পালিশ করা নখ দেখা যাচ্ছিল।

আমি ওদের সংস্কৃতির প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল ভাব দেখাই না কেন, তাতে করে ভিসা অফিসের কর্মকর্তার মন একটুও গলল না। তিনি অন্য দশজনের আবেদনপত্রের সঙ্গে আমার আবেদনপত্রটাও ছুড়ে মারলেন। তার কথার এক বিন্দুও আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। তবে এইটা বুঝলাম, পরদিন সকাল নয়টার মধ্যে আমি ভিসা পেয়ে যাব।

পাশা জানাল, ভিসা পেয়ে গেলে সেও আমার সঙ্গে আফগানিস্তান যাবে। তার ভাষ্য হলো, আমাকে সে একা সেখানে যেতে দিতে পারে না। আমাকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই কারও দরকার আছে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে একটা গ্রামে যাওয়ার। এই গ্রামটা নানা অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির জন্য কুখ্যাত। ছোট ছোট কারখানায় নানা রকম মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি হয়। আট বছরের বাচ্চারাও নাকি অস্ত্র বানাতে জানে। নিজ চোখে দেখার জন্য আমার আর তর সইছিল না।

আমরা আদম খলিলের ডেরায় পৌঁছে গেলাম। এটা এক ঘোড়ার ছোট শহর, যেন কোন ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট।

পাশা ও আমি মূল সড়ক ছেড়ে একটা ছোট গলি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ছোট ছোট খোলা অনেকগুলো গ্যারেজ। ভেতরে ৮০ বছরের পুরোনো লেদ মেশিনে ঘটরঘটর শব্দে তৈরি হচ্ছে নানা রকম অস্ত্র। ছেলে-বুড়ো সবাই কাজ করছে। পাশা ওদের কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলতেই সবাই ফিক করে হেসে দিল। কারখানার মালিকমতো এক লোক এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে বসতে বলল। পাশার মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করলাম।

এসব অস্ত্রের কারিগরেরা যেকোনো চাহিদা মোতাবেক অস্ত্র বানাতে পারবে। অবাক হয়ে দেখলাম, তারা চায়নিজ পিস্তলের হুবহু কপি তৈরি করছে। এমনকি বিখ্যাত অস্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানি নরিনকোর লোগো ব্যবহার করে তারা। কত উদ্ধত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ। আমাকেও ৬০ ডলারের বিনিময়ে একটা অস্ত্র কিনতে বলা হলো। আমি অস্বীকার করায় কারখানার

মালিক একটু হতাশই হলেন। কালোবাজারের কল্যাণে মার্কিন ডলার পাকিস্তানের দ্বিতীয় অনানুষ্ঠানিক মুদ্রা।

এক ফাঁকে পিস্তল না কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পাশা আমাকে সাধুবাদ জানাল। ও জানাল, এগুলো মোটেই মানসম্মত নয়। ৫০ রাউন্ড গুলি ছোড়ার পরই অচল হয়ে যাবে। কেনই-বা আমি পিস্তল কিনতে যাব আর কেনই-বা আমি এক রাউন্ড গুলি ছুড়তে যাব, তা আমার ধারণাতেও এলো না। পাশা কী ভেবেছে কে জানে!

কল্পনায় দেখলাম, হিথরো বিমানবন্দরে শুল্ক বিভাগের একজন শুকনামুখের কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কোনো বিশেষ পণ্য আছে কি না? আমি বললাম, হ্যাঁ। একটা পিস্তল। কোনো সমস্যা অফিসার?

কৌতুকটা সহজভাবে গ্রহণ করুন। কখন যে কোন ঘটনায় কী মনে পড়ে যায়!

খানিক বাদেই আমি চলে গেলাম বৈরুত বিমানবন্দরে। সেদিন ছিল ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আমি লেবাননে অবস্থান করছিলাম। খুব চমৎকার জায়গা। সব সময়ের মতোই ফিরে যেতে দেরি করে ফেলি। আমি হাতব্যাগ ও একটা ভারী ব্যাগ নিয়ে দ্রুত বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ি। আমি অধৈর্য হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সামনের যাত্রীরা নিরাপত্তা ফটক দিয়ে তাদের ব্যাগ এক্স-রে মেশিনে পরীক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমার পালা এলে আমিও আমার ব্যাগ এক্স-রে মেশিনে চেক করে বের করে আনি।

যখন আমি নিরাপত্তা ফটক পেরিয়ে অপর পাশে চলে আসি, তখনই একজন লেবানিজ কর্মকর্তা ছুটে আসেন। তাঁর হাতে আমার হাতব্যাগ ধরে রাখা। তিনি ব্যাগখানা আমার কি না জানতে চাইলেন। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ব্যাগটা নিতে হাত বাড়ালাম। কর্মকর্তা আমাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি ব্যাগটা চিনতে পেরেছি কি না? ততক্ষণে উনি আমার ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করে আনলেন। পিস্তলটা তিনি বিপজ্জনকভাবে হাতে নিয়ে নাড়াচ্ছিলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার চোখজোড়া বিস্ফোরিত হয়ে যায়। আমি দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করে এই পিস্তলটা জীবনে চোখেও দেখিনি বলে জানাই। কেউ নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তখনই আমার মনে হলো, ওই নিরাপত্তা কর্মকর্তা একই কথা আরও অনেকবার শুনেছে হয়তো। পরিণতি

মনে করে শিউরে উঠলাম। আমি বৈরুতের জেলে বাকি জীবন কাটাতে যাচ্ছি কারও ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী হয়ে।

বন্ধুরা কী ভাববে আমায়? তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, মা কী মনে করবে? তারা নিশ্চয়ই ভাববে, আমি সাংবাদিকতার খুঁটির জোর দেখাতে গিয়ে উল্টো ধরা খেয়ে গেছি।

এমন সময় এক নারীর চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পাই। শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি, এক নারী আমার দিকে আঙুল তুলে তারস্বরে চিৎকার করছেন। তাঁর সঙ্গের ছোট বাচ্চাটাও জানি কেমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। নিরাপত্তা প্রহরী তাঁর দিকে কিছু একটা ছুড়ে মারল।

তিনি আমাকে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে অগ্রাহ্যমূলক দৃষ্টিতে তাকালেন। নিজেকে এতটাই ভারমুক্ত মনে হলো যে আমি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ না দেখেই এক দৌড়ে সেখান থেকে সরে এলাম। এবং সৌভাগ্যবশত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানে উঠে গেলাম।

বিমানে ওঠার আগে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনি আমার পেছনেই ছিলেন এবং পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি জানালেন, বাচ্চা ছেলেটা মজা করার ছলে আমার ব্যাগে লুকিয়ে তার মায়ের পিস্তলটা রেখে দেয়। কর্মকর্তার হাতে সেটা দেখতে পেয়ে আমি ওটা চুরি করেছি ভেবে তিনি চিৎকার করেন।

চিন্তা করে কোনো কূলকিনারা পেলাম না। ওই নারী পিস্তল নিয়ে বিমানবন্দরে কী করছিলেন? তবে সেদিন একটা চরম শিক্ষা পেলাম। কোনো অবস্থাতেই খোলা পোঁটলা অথবা হাতব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দরে যেতে নেই।

পাশা আমাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে সামনে এগিয়ে দিল। দ্রুতই আমি বৈরুত থেকে পাকিস্তানি বন্দুকের দোকানে ফিরে এলাম। হেঁটে বেড়ানোর সময় জানতে পারি, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের জাহাজভাঙার লোহালক্কড় থেকে এসব কারখানার ধাতব কাঁচামালের জোগান আসে। এখানে আসার পর ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ফেলে বন্দুক বা অস্ত্রের গড়ন দেওয়া হয়। এরপর ছেলে-বুড়োরা মিলে হাতে খেটে খুটে ও লেদ মেশিনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অস্ত্র তৈরির কাজ শেষ করে।

কয়েকটি ছবি তোলার অনুমতি চাইলে কারখানার মালিক ছোট বাচ্চাদের সরিয়ে দিয়ে নিজের লোকদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে ছবি তোলার পোজ দিলেন। যখনই আমি ছবির ফ্রেমে বাচ্চাদের আনতে চাইলাম, তখনই মালিকের চেহারা বদলে গেল। পাশা তখনই সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

পাশা বলল, কারখানার লোকজন আমাকে খ্রিষ্টান মিশনারি সাহায্য সংস্থার লোক ভেবেছে। তারা সাধারণত স্থানীয় শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কী অদ্ভুত! আমি ভাবতাম, একজন সাংবাদিককে দেখে একজন সাহায্যকর্মীর চেয়েও সহজে চেনা যায়। চলে যাওয়ার প্রাক্কালে একজন লোক আমার হাতে ধরে রাস্তার অপর পাশে তার কারখানা পরিদর্শন করতে অনুরোধ জানাল।

আমরা তার কারখানাতেও গেলাম। প্রবেশপথ থেকে একটা ভারী মোটা ছাগলকে সরিয়ে দিল, যাতে আমরা কারখানায় ঢুকতে পারি। সেখানে থরে থরে সেমি অটোমেটিক অস্ত্র সাজানো। কালশনিকভ ও অন্যান্য অস্ত্রও ছিল। সব অস্ত্রই নকল, তবে মানুষ মারার জন্য দারুণ উপযোগী। লোকটা আমাকে খুবই হালকা ধরনের একটা অস্ত্র দেখাল। এটা ছিল দেখতে ঠিক সিগারেটের লাইটারের মতো। তবে এর একটা বুলেট ছোড়াই যথেষ্ট।

পাশার সহায়তায় সে জানাল, এটা শুধুই একটা খেলনা অস্ত্র এবং খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কারও দিকে তাক না করলে এটার কাউকেই হত্যা করার ক্ষমতা নেই। আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময় বাতাসে সেমি অটোমেটিক অস্ত্রের ফায়ার করার শব্দ ভেসে এল। আমি শঙ্কিত হয়ে শব্দের উৎসের দিকে কান পাতলাম। পাশা অট্টহাসি দিল এবং কারখানার মালিক এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি সদ্যই মঙ্গল গ্রহ থেকে নেমে এসেছি।

তারা দুজন কথা বলছিল এবং আবার হাসতে লাগল। এরই মধ্যে আবার গুলির শব্দ ভেসে এল। আমি জানতে চাইলাম, কী হচ্ছে সেখানে? যা বুঝলাম তা হলো, এটা এখানকার খুবই স্বাভাবিক গোত্রীয় সংঘাত। এই জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা পরস্পরের মধ্যে গোলাগুলি করছে, যা নিত্যদিনের কাহিনি। এক কথায় এটা হলো ডাকাতের দেশ।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরেই এসব সংঘাত চলে আসছে এবং সামান্য ঘটনা নিয়েই এসব শুরু হয়। এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, তোমার হাত যদি তোমার আত্মীয় হয়, তাহলে তা কাটা পড়বেই। পাশা বিজ্ঞের

মতোই গড়গড় করে আমাকে এত তথ্য দিয়ে গেল। আমি ওর কথা শুনে মাথা নাড়লেও অনেক কিছুই তখনো সয়ে উঠতে পারিনি।

বাইরের পারিবারিক গোলাগুলি থেমে এলে আমরাও বাইরে বেরিয়ে আসি। চোখে কতগুলো রুপালি কাগজ চোখে পড়ল। রোদ পড়ে কেমন চকচক করছে। পাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ও আমাকে দ্রুত দরজার বাইরে নিয়ে এল। চকচকে কাগজগুলোয় হেরোইন সাজিয়ে রাখা ছিল এবং যে কেউ চাইলেই তা কিনতে পারত। পাশা আমাকে একদম জোর করেই ঠেলে গাড়িতে উঠিয়ে চলতে শুরু করল। আমি কিছুটা বিরক্ত হলাম। চলতে চলতে পাশা বলল, মাঝেমধ্যে আমি নিজের অজান্তেই বিপজ্জনক বিষয়ে নাক গলিয়ে ফেললে ওর দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা।

আমি ওকে জানালাম, স্বয়ং খোদা আমার সঙ্গে আছেন। আমার মতো বিচ্ছুকে নিজের মতো চলতে দেওয়াই ভালো। কথা শুনে পাশা হেসে দিল। তবে আমি হেরোইন নিয়ে গল্প লিখতে চাইলে ও কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এই কথায় আমি সানন্দে রাজি হয়ে যাই। কারণ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ঘেঁষে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হেরোইন উৎপন্ন হয়।

যদিও তালেবানরা এটা জোর গলায় অস্বীকার করে আসছে, তবু তাদের অস্ত্রভান্ডার সজ্জিত হয় হেরোইন বিক্রির বিশাল টাকা দিয়ে। এসব ড্রাগ বিদেশে পাচার হয় এবং নষ্ট পশ্চিমাদের হাতে পৌঁছায়। সম্ভবত, নেতারা এ কথা ভেবেই হেরোইন ব্যবসাকে বৈধ করার চেষ্টা করেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, হেরোইনের জগৎকে ঘিরেই পরবর্তী প্রতিবেদন তৈরি করব।

ওই দিন রাতে ক্রাউন প্লাজায় ফিরে জিমকে আমার প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিলাম। তোলা ছবিগুলোর ফিল্ম থেকে স্থানীয় এক দোকানে ছবি বের করে আনলাম। কিছু চমৎকার ছবি ওঠায় ইন্টারনেটযুক্ত এক জায়গায় ছবিগুলো স্ক্যান করে লন্ডনে পাঠিয়ে দিলাম।

আদর্শ পৃথিবীতে হয়তো আমাদের সঙ্গে ডিজিটাল ক্যামেরা থাকত এবং ছবিগুলো সরাসরিই পাঠিয়ে দেওয়া যেত। তবে এটা কোনো আদর্শ স্থান নয়। রয়ে সয়ে কাজ করতে হয়। তা ছাড়া লন্ডনে থাকা আমার চিত্রগ্রাহক

বন্ধুরা আমার ওপর রুষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমার একা কাজ করতেই ভালো লাগে। কারোর দায়িত্ব নিয়ে কথা শোনা আমার পছন্দ নয়।

অনেক চমৎকার প্রতিবেদক ও দক্ষ চিত্রগ্রাহকেরাও কোনো ছাপানো গল্প বা প্রতিবেদনের ভুলত্রুটি নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করার ঘটনা আমাদের ওখানে হরহামেশাই ঘটে। বিশেষ করে, টনি বার্থোলমোর কথা মনে পড়লেই এখনো বিরক্ত লাগে। ১৯৯০ সালে নর্দার্ন ইকোতে কাজ করার সময় ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে আবাসিক পদাতিক বাহিনী গ্রিন হাওয়ার্ডসের সঙ্গে কাজ করছিলাম। টনিকে আমার চিত্রগ্রাহক বলে পরিচয় করিয়ে দিই।

অথচ টনি আমার চিত্রগ্রাহক নয় বলে খেঁক করে উঠল। ভাবলাম, ও হয়তো একটু খ্যাপাটে স্বভাবের। কিন্তু ক'দিন পরে ও আমাকেই তার ছবির ক্যাপশন লেখক বলে সবার কাছে বলে বেড়াতে লাগল। ব্যাপারটা আমার আত্মসম্মানে লেগেছিল। কূপমণ্ডূক টনি।

আরেকবার ১৯৯১ সালে টাইন্সাইড দাঙ্গার সংবাদ নিতে গিয়েছিলাম। তখন আমি *সানডে সান*-এ কাজ করি। স্কটসউডের এক রাস্তার একদিকে দাঙ্গাপুলিশ বর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অপরদিকে কয়েক হাজার লোক বিপজ্জনকভাবে স্লোগান দিচ্ছিল।

দুই পক্ষই অবিশ্বাসের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তখন অফিসের গাড়িতে বসে পুরো ঘটনা অবলোকন করছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল একজন নতুন চিত্রগ্রাহক, যে এর আগে ফ্যাশনের দুনিয়া ও বন্য প্রকৃতিতে ছবি তুলে বেড়াত। খবরের জগতে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার বস ক্রিস কেউ একজন পেট্রল বোমা ছুড়ে মারছে এমন একটি দৃশ্য খুব কাছ থেকে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন। ক্রিস যা চায় তা না পেলে খুব মেজাজ দেখায়।

নতুন চিত্রগ্রাহক আমাদের চাহিদা বুঝতে পেরেছে বলে জানায়। তাই ওকে সঙ্গে করে বিক্ষোভরত জনগণের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ওকে অভয় দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে বললাম। আমার লক্ষ্য ছিল ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা এবং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে যাওয়া। সবশেষে মওকা মতো একটা ছবি তুলে জনগণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সটকে পড়তে চেয়েছিলাম।

এত কিছুর পরও ওর ভয় কাটেনি। আমি ওকে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিতে বারণ করলাম। এর ফলে ও বিক্ষোভরত জনতার লক্ষ্যে পরিণত হতে

পারে। সবকিছু এতক্ষণ শান্ত থাকলেও হঠাৎ চারদিকে বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেল।

আমি ঘুরে ওকে দৌড় দিতে না করব, এমন সময় দেখি ও নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ির দিকে ছুটছে এবং কয়েকজন ওকে ধাওয়া করেছে। আমি জনতার দিকে একনজর তাকিয়ে ওখান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি হালকাভাবে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই একটা ভাঙা ইটের টুকরা বনেটে বাড়ি খেয়ে আমার মুখে আঘাত করল। এরপর গাড়িতে আমাদের কী মধুর আলাপ হয়েছিল, তা আপনারা ভেবে নিন।

ছবি তোলা একটা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিষয়। বছরের পর বছর যারা ভালো ছবি তোলার কলাকৌশল রপ্ত করেছেন, তাদের চেয়ে আমি ভালো ছবি তুলতে সক্ষম হব–তা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবি না। তবে আমার প্রতিবেদন লেখার জন্য ডেভিড বেইলির মতো দক্ষতার প্রয়োজন পড়বে না।

আমার পক্ষে অবশ্যই ফ্যাশন জগতের মডেলদের ছবি তোলা, দাঙ্গা-বিক্ষোভের মোক্ষম সময়টাকে ধরে রাখা কিংবা কোনো খেলার মাঠ থেকে অসাধারণ কিছুর ছবি তোলা সম্ভব নয়। চিত্রগ্রাহকেরা বন্দিবহনকারীদের গাড়ি থেকে ভেতরের বন্দীর ছবি তোলার জন্য যে পরিশ্রম করেন, তা আমার সাধ্যের বাইরে।

যা-ই হোক, আফগান মাটিতে ছবি তুলে যেহেতু চিত্রগ্রাহকদের খ্যাতি নষ্ট করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি, সুতরাং থামার প্রশ্ন আসে না।

অবৈধ অস্ত্র কারখানার প্রতিবেদন পেয়ে আমার বস জিম মুরে দারুণ খুশি হয়। পরদিন আমাকে পেশোয়ারে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। জঙ্গিদের বিক্ষোভ ও হম্বিতম্বি প্রদর্শনের ঘটনাগুলো পেশোয়ারেই বেশি ঘটছিল। আমি ক্রাউন প্লাজায় আমার কক্ষটা ছেড়ে দিতে চাইছিলাম না। গণমাধ্যমকর্মীদের দৌরাত্ম্যে হোটেল ফাঁকা পাওয়া মুরগির দাঁতের মতোই দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে তত দিনে।

পেশোয়ারের পথে রাওয়ালপিন্ডির সন্নিকটে একটা বড়সড় সরকারি বাড়ির সামনে থামলাম। এটা পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক হামিদ গুলের বাসভবন। পাশার পরিচিত কারও ভাইয়ের বয় ছিল জেনারেল গুলের খালার শ্বশুরবাড়ির ভাতিজি। আমি নিজেও সম্পর্কটা বুঝে উঠতে পারিনি এবং বিশ্বাস করতে পারিনি। তবে গুল নিজেই বেরিয়ে এসে আমাকে বসতে আমন্ত্রণ জানালেন।

তিনি তালেবানদের ব্যাপারে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখালেন। ক'দিন আগেই আফগানিস্তানে তালেবানদের সামরিক মহড়া প্রদর্শনে তিনি অতিথি হয়ে গেছেন বলে জানান। শক্তির জানান দিতে তিন ঘণ্টা ধরে তালেবানরা মহড়াতে প্যারেড করেছে বলে তিনি জানান।

হামিদ তালেবানদের শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে ওদের ট্যাঙ্ক, মিসাইল ও অস্ত্রসজ্জার কথা বলে গেলেন। আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যরা আফগানিস্তান আক্রমণ করবে বলে আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তরুণ তালেবান সৈন্যরা হাতের তালু ঘষে আগুন জ্বালাচ্ছে। তাঁর মতে, আফগানরা অসাধারণ যোদ্ধা। গত শতাব্দীতে তারা দুবার ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়েছে। রাশিয়ানদের ১০ বছর ধরে ভুগিয়েছে।

মনে হচ্ছিল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই৫-এর মহাপরিচালক স্টেলা রিমিংটনের সামনে বসেই কথা বলছি। তবে গুলের চেয়ে তিনি অনেক নরম সুরে কথা বলেন।

এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তালেবানদের সঙ্গে পাকিস্তান ইন্টালিজেন্স আইএসআইয়ের সম্পর্ক অনেক গভীর। ব্যাপারটা তারা বারবার অস্বীকার করে এলেও তালেবানরা আইএসআইয়ের কাছ থেকে সব রকম সহযোগিতা পেয়ে এসেছে। বের হয়ে আসার আগে আমি আফগান দূতাবাসে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছি, সে ব্যাপারে গুলকে অবহিত করলাম। তিনি কিছু একটা করবেন বলে আমাকে ওয়াদা করলেন। প্রয়োজনে তিনি তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন এবং আমার হয়ে উকালতি করবেন বলে জানান। আগুনের গোলা অথবা বানের জল ভেসে আসুক, আমি সীমান্ত অতিক্রম করবই।

পেশোয়ারে এসে কোনো হোটেলেই ফাঁকা পেলাম না। শুধু তাই নয়, হোটেল ভাড়া ও খাওয়ার খরচ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, নিউ ইয়র্কে পর্যটকদের আনাগোনা শূন্যের কোঠায় নেমে এলেও পাকিস্তান পর্যকদের ভিড়ে রমরমা।

পেশোয়ারের ভালো হোটেলগুলোর মধ্যে পার্ল কন্টিনেন্টাল অন্যতম। একজনের সহায়তায় এখানেই একটা কক্ষে উঠতে সক্ষম হলাম। হোটেলের সঙ্গেই একটা ছোট গলি রয়েছে। একদিকে একটা বইয়ের দোকানও দেখতে পেলাম। রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই শহরটাকে এক খণ্ড

আফগানিস্তান বলে প্রতীয়মান হয়। তাই আমি আরও তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বইয়ের দোকানে রাশভারী ধরনের লম্বা এক লোক এসে খপ করে একটা বই ছিনিয়ে নিল। এই বইটা আমিও নিতে চেয়েছিলাম। লোকটা প্রায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা হবে। চলে যাওয়ার পর দেখি, লোকটা বইটার শেষ কপিটাই নিয়ে গেছে। উনি ছিলেন বিবিসির বিখ্যাত কর্মী জন সিম্পসন, আফগান যুদ্ধে যাঁর লেখনী পৃথিবীজুড়ে লাখ লাখ লোকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। জন আমার কাছ থেকে সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়ার এটাই শেষ নয়।

আমি যতই আত্মশ্লাঘায় ভুগি না কেন, যুগ্ম চিত্র সম্পাদক শন রাসেল আমার ছবির মানে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আমি নিজেকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী মনে করলেও স্ক্যান করা ছবিগুলো একদম বাজে বলে শন জানায়। এর মধ্যেই আবার গাফফারের সঙ্গে দেখা হলে ও খুশিমনেই ছবিগুলো নতুন করে লন্ডন পাঠানোর দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

সেই রাতে একটু আয়েশ করতে পার্লের পঞ্চম তলার বারে চলে যাই। ওখানে আগে থেকেই পুরোনো বন্ধু ইভান গ্যালাঘার ও *মেইল অন সান*ডের একজন চিত্রগ্রাহক অবস্থান করছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ইভানকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমি ইভানকে জড়িয়ে ধরে আবেগে কেঁদে ফেলি। গত কয়েক সপ্তাহে এই প্রথম কোনো দেশি মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। এর মাঝেই কয়েকজন শোরগোল করতে করতে এগিয়ে এল। এরা চেক টেলিভিশনের কর্মী, যাদের সঙ্গে লাহোর বিমানবন্দরে নেমেই কথা হয়েছিল।

আফগানিস্তানে ঢুকতে পেরেছে কি না জানতে চাইলে তাদের একজন হাত নেড়ে চোখ উল্টিয়ে না-বোধক জবাব দিল। তবে তারা এখনো চেষ্টা করছে বলে জানায়। আমি ওদের থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে ইভানের কাছে চলে এলাম এবং আমাকে সেদিন রাতে খাওয়ানোর জন্য বললাম।

অল্প একটু মদ খেতে চাইলেও এখানে পুরো বোতল কিনতে হবে। কী অদ্ভুত নিয়ম, জেরিতে এই নিয়ম চালু থাকলে লাভে রমরমা ব্যবসা চলত। যা-ই হোক, আমি এক বোতল বিয়ারেই সন্তুষ্ট রইলাম।

এর মধ্যেই *সান*-এর আরও কয়েকজন প্রতিবেদক জমায়েত হয়েছেন। সবাই মিলে একসঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে লাল পানীয় গোগ্রাসে গিললাম। আলাপ জমে উঠল আজ পাকিস্তানের চালচিত্র নিয়ে। সামনে কী হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে সবাই সন্দিহান হলেও আনন্দমুখর পরিবেশটা হালকাই

লাগল। তবে এত খোলাখুলি আলাপের পরও আমি সাংবাদিকতার গোপনীয়তার নিয়ম মেনে অস্ত্র কারখানায় ভ্রমণের ব্যাপারে টুঁ শব্দও উচ্চারণ করিনি।

২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পেশোয়ারে বড়সড় এক উত্তেজক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশার সঙ্গে মিছিল দেখতে গেলাম। আমি এর আগেও অনেক বড়সড় জমায়েতের প্রতিবেদন করেছি, তবে এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ছিল খুবই উত্তেজিত। বাতাসে কেমন যেন অশনিসংকেত উড়ে বেড়াচ্ছে। শুক্রবার সাধারণত মুসলমানরা ভাবগাম্ভীর্যতাপূর্ণ ছুটির দিন হিসেবে পালন করে। একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতার ডাকে অনেক মানুষ এই মিছিলে অংশ নেয়।

উত্তেজিত জনতা ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ও পাশা পুলিশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একদম সমস্ত শরীর আবৃত করে বেরিয়েছিলাম। আমার পোশাক কারও চোখে দৃষ্টিকটু মনে না হলেও যথেষ্ট ভয় লাগছিল। কানে কানে পাশা বলল, আমাদের চলে যাওয়া উচিত। গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে পাশার বিচারবুদ্ধিকে আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রুমে ফিরেই আমি জিমের সঙ্গে আজকের বিষয়ে আলাপ করলাম। আজকের অবস্থা দেখে আর কোনো মিছিলের সংবাদ সংগ্রহ করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে বলে ওকে জানাই। আমার উপস্থিতি সেখানে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কারণ, আমি একজন নারী আর এসব মিছিল উগ্র পুরুষবাদিতার প্রদর্শনী। মার খাওয়ার জন্য এটা মোটেই যথোপযুক্ত সংবাদ নয়। জিম কোনো প্রশ্ন না করেই শ্রদ্ধা রেখে আমার কথায় রাজি হলো।

এমন সময় হোটেলের একজন ব্যবস্থাপক আমাকে রুম খালি করে দিতে নির্দেশ দেন। অন্য কেউ একজন আমার আগেই বুকিং দিয়ে রেখেছে। রুম ছেড়ে দিলেও আমি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থান করছিলাম। নতুন কোনো থাকার জায়গা না পেলেও ওই দিনের কর্মসূচি তৈরি করতে হচ্ছিল। পাশা আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে বলে একদম চিন্তা করতে না করে। লোকটা ধীরে ধীরে আমার প্রবাস-সাংবাদিকতার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত থাকতে সাহায্য করছে।

ইতিমধ্যেই এক অসাধারণ আইরিশ প্রতিবেদক মিরিয়ামের সঙ্গে পরিচয় হলো। ও নাকি ক'দিন আগেই খাইবার পাস ঘুরে এসেছে। ও ছিল ডাবলিনভিত্তিক *আইরিশ টাইমস*-এর এশিয়া প্রতিনিধি। বেইজিংয়ের অফিস থেকে সে পেশোয়ারে বর্তমান সংকট, যা যেকোনো সময়ে সংঘাত বা যুদ্ধে রূপ নিতে পারে, এর সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে।

আমার খাইবার পাস যাওয়ার অভিপ্রায় জানতে পেরে ওদিকে সব গণমাধ্যমকর্মীর যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে মিরিয়াম জানায়। তবে ও আমাকে সেখানকার কিছু সংবাদ ও ছবি উপহার দিতে চাইলে জবাবে আমার মেইল ঠিকানা দিয়ে আসি। যত কিছুই হোক, অন্য সব সাংবাদিকের মতোই আমিও খাইবার পাস নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা মনের মধ্যে পুষে রাখি।

এমন সময় অফিসের ফোন বেজে উঠলে মিরিয়াম ফোন ধরে কাগজে দ্রুত কী সব লিখতে থাকে। কলম্বিয়ার বোগোটার এক রেডিও স্টেশন থেকে ফোনটা এসেছে। আমি কথা বলব কি না ও জানতে চায়। আমি ফোন কানে দিতেই ও প্রান্তের প্রতিবেদক আমার পরিচয় জানতে চায়। কেন এসেছি, ১১ তারিখের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আমার মতামত, সব নিয়েই কথা হয়।

যদিও আমি নিজস্ব মতামত অন্যত্র খুব কমই প্রকাশ করি, তবু মাঝেমধ্যে আন্তরিক সহকর্মীদের সাহায্য করতে মন্দ লাগে না। রেডিওর প্রতিবেদকের সঙ্গে কথায় আমি মোড়লিপনা করে প্রেসিডেন্ট বুশের ব্যাপারে মন্তব্য করতে শুরু করি। উসামা বিন লাদেনকে ধরতে হবে, জীবিত অথবা মৃত–এ ধরনের বাগাড়ম্বর বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তিকে মানায় না। ছোট শহরের শেরিফরাই কেবল এভাবে কথা বলতে পারে।

আমি বললাম, আমেরিকা কি রাতারাতি তাদের সংবিধানের অমিয় বাণী– 'সবাই নির্দোষ হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না তারা দোষী সাব্যস্ত হয়' ভুলে গেল? প্রেসিডেন্ট বুশ কিন্তু বিন লাদেনের অনুপস্থিতিতে কোনো বিচারকাজও পরিচালনা করেননি।

মূলত আমি আমেরিকাকে শাপশাপান্ত করে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। ভদ্রলোক শাখের করাতে আটকা পড়েছেন। আট কোটি মধ্যমপন্থী মুসলমানের দেশ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তিনি। যে দেশের অধিকাংশ লোক আফগানিস্তানে যেকোনো ধরনের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

পরিস্থিতি গরম উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে আমেরিকা ও ব্রিটেন সহযোগী সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করছে বলে মন্তব্য করলাম। এটি মোশাররফের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এমনকি এর ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে।

আমি বলেই চললাম, ১১ তারিখের নারকীয় ঘটনার জন্য সবাই শোকাহত। কিন্তু এর পেছনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মানুষ এখনো দুর্ঘটনার আকস্মিক ঘোর কাটিয়ে উঠতেই পারেনি। অনেকে এখনো শোকে মুহ্যমান। কারও কারও স্বজনদের দেহাবশেষ হয়তো আর পাওয়াই যাবে না। এই সময় যুদ্ধ অথবা ক্রুসেডের কথা বলা সমীচীন নয়। আমি পেছনে স্প্যানিশ ভাষায় কাউকে কথা বলতে শুনলাম। ব্যস্ত বার্তাকক্ষে কোনো একজন পুরুষ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

প্রতিবেদক আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বললেন। খানিক পরই তিনি জানালেন, আমার বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। হায় খোদা, আমি ভেবেছিলাম, কোনো একজন সহকর্মীর সঙ্গে গল্পচ্ছলে কথা বলছিলাম। অথচ মাত্রই দক্ষিণ আমেরিকার লাখ লাখ শ্রোতা আমার বক্তব্য শুনে ফেলেছেন।

মিরিয়ামকে জানাতেই ও হেসে দিল। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে *অবজারভার*-এর প্রধান প্রতিবেদক জ্যাসন বুর্কের সঙ্গে দেখা হলো। বহু বছর পরে দেখা হওয়ায় আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। এখন *অবজারভার*-এর হয়ে নিয়মিত দৈনন্দিন নিয়ম মেনে চাকরি করলেও জ্যাসন প্রায় দুই বছর লন্ডনে স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করে বেড়িয়েছে। পরে *অবজারভার* থেকে তাকে এশিয়ার প্রধান প্রতিবেদকের পদে নিযুক্ত করা হয়। *সানডে টাইমস*-এর অনুসন্ধানী দলে আমরা একই সঙ্গে কাজ করতাম। খবরের সন্ধানে এখানে-ওখানে চষে বেড়িয়েছি। ও বিদেশ চলে যাওয়ার পরও আমাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে ই-মেইলে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

অনেক দিন পর এই বিদেশ বিভুঁইয়ে সাক্ষাৎ হওয়ায় ভালোই লাগল। জ্যাসন *সানডে টেলিগ্রাফ*-এর ক্রিস্টিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। একটা কাজে জ্যাসন কোথাও চলে গেলে আমি আর ক্রিস্টিনা একই সঙ্গে রাতের খাবার সারি। আমার কাছে সামান্য পরিমাণ পাকিস্তানি রুপি ছিল। তাই ক্রিস্টিনা বিল দিতে চাইলে আমি অস্বীকার না করে পরের বেলায় আমিই খাওয়াব বলে কথা দিলাম। ক্রেডিট কার্ড থাকলেও সম্ভব হলে রুপিতেই বিল

পরিশোধ করতাম। (এই বইটা লেখার সময়ও ক্রিস্টিনাকে এক বেলা খাওয়াতে আমি হন্যে হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।)

কয়েক সপ্তাহ পরে ক্রিস্টিনা নিজেই খবরের শিরোনাম হয়ে যায়। ও আর ওর চিত্রগ্রাহক জাস্টিনকে কোয়েটা পুলিশ সেরেনা হোটেলের রুম থেকে ধরে নিয়ে যায়। শুনেছি, ক্রিস্টিনা উসামা বিন লাদেন নামটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ একটা ফ্লাইটে বুকিং দেওয়ার চেষ্টা করছিল। নভেম্বরের দিকে ক্রিস্টিনাকে পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরে এক স্থানীয় পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে দাবি করে, তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সে শুধু কোয়েটা থেকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সযোগে একটা ফ্লাইট বুকিং দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমরা সেদিন রাতে খেতে খেতে খুব আপন মানুষের মতোই মিশে গিয়েছিলাম। দুজন সাংবাদিকের মধ্যে প্রেম ও এর পরিণতি নিয়ে আমরা চুটিয়ে গল্প করেছি। বার্তা কক্ষগুলো সব সময়ই এসব রসালো গল্পের জন্য কান পেতে থাকে। যদিও আমি আগেই বলেছি, একজন সাংবাদিকের জন্য সাংবাদিক ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তবু আমি পেশাগত জীবনে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে নিজেকে সযতনে দূরে সরিয়ে রাখতাম। কারণ, সাংবাদিকেরা অনেক অসতর্ক ও অবিবেচক হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের যেকোনো খবর আগেভাগে প্রচার করার প্রবণতা কখনো কখনো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে।

গল্পের ফাঁকে জন সিম্পসনের খবরে আমাদের মনোযোগ ছুটে গেল। এই দণ্ডায়মান পর্বত বোরকার আড়ালে এক গোপন মিশনে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছেন। এক খোলা ওয়াগনে সবার শেষে নিচু হয়ে নারীদের মতো সাজপোশাকে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছেন।

এটা ছিল নীতিবহির্ভূত হাস্যকর সংবাদ। তিনি কাজের প্রতি চরম নিষ্ঠাবান এবং কখনোই হাল ছাড়েন না। তার পরও আমি এসবের পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। হয়তো এর পেছনের গুরুত্বপূর্ণ কারণটি আমার চোখে ধরা পড়েনি। তবে বোরকা পরে জন সিম্পসনের খবর সংগ্রহের জন্য অবৈধভাবে ছদ্মবেশে আফগানিস্তানে ঢোকার সংবাদ হাস্যকর মনে হলো। আমি ও ক্রিস্টিনা দুজনই হেসে দিলাম। কিছুটা প্রশংসায় এবং কিছুটা বিষয়টি হাস্য রসাত্মক হওয়ায়।

তবে এর মাধ্যমে মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে গেল। 'বোরকা' ও 'অদৃশ্য' শব্দদ্বয় মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করে এবং তখন থেকেই একটা দুঃসাহসী ইচ্ছার উদ্রেক ঘটে।

সেই রাতে আমি পঞ্চম তলার বারে আবার গেলাম, যেখানে শুধু বিদেশি মেহমানদের জন্য মদ সরবরাহ করা হয়। চারদিকে সব পুরোনো মুখেরা ভিড় করে আছে। ইভান গ্যালাঘারও সেখানে ছিল, কিন্তু দ্রুতই সে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছিল। বিষয়টা সন্দেহজনক। ইভান নিশ্চিত অন্য কোনো ধান্দা করছে। আমার জিজ্ঞাসু মন আরও একবার উৎসুক হয়ে উঠল। কোথাও সন্দেহের গন্ধ পেলেই সেটা নিয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শন সাংবাদিকদের সহজাত স্বভাব।

তবে বিষয়টা খুব একটা পাত্তা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বরং স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত নিউ ইয়র্কের এক চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। ও মাত্রই ইসরায়েলে তার কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সে বাড়ি যেতে চায় বলে আকুতি প্রকাশ করে। লম্বা টুইন টাওয়ার ব্যতীত নিউ ইয়র্ক কেমন অদ্ভুত ভুতুড়ে দেখাবে, এ নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই।

একই সঙ্গে *নিউ ইয়র্ক ডেইলি* ও *নিউজ* ডের হয়ে ছবি তোলে স্প্যানিশ এই চিত্রগ্রাহক। বাইরে খুব হাসিমুখে কথা বললেও বুঝতে পারি, ওর ভেতরটা ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। বান্ধবীর সঙ্গেও তার ঝগড়া চলছে। বেচারার এই সময়ে বান্ধবীর সঙ্গে দূরে কোথাও ছুটি কাটানোর কথা। অথচ এখন তাকে পেশোয়ারের উদ্বিগ্ন শহরে ছবি তুলতে হচ্ছে। আমি তাকে সমবেদনা জানিয়ে বোঝাই কী কঠিন এক পেশায় আমরা সবাই নিয়োজিত। এ পেশার অন্দরে না ঢুকলে এর সত্যিকার পরিস্থিতি কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

কথা শুনে ওর বান্ধবীও ওর মতোই চিত্রগ্রাহক বলে ও হাসাহাসিতে ফেটে পড়ল। এই ফাঁকে এক লেবানিজ টেলিভিশনের এক কর্মী আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে এল। হাসিমুখে আমরা পরিচিত হলাম। লেবানিজ সংবাদ সংস্থার কর্মী তানিয়া মেহান্না দেখতে ভীষণ সুন্দরী। শান্ত, সৌম্য চেহারার মেয়েটা যে এত চটুল মজা করতে পারে, কে বলবে ওকে দেখে? দ্রুতই ওকে আমার ভালো লেগে যায়। সকালে আমরা একই

মিছিলের খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। হাতে ধরা বোতলটা খালি হয়ে যাওয়ায় আমি বিদায় নিয়ে চলে আসি।

মেয়েটিকে নাকি লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে উত্তেজিত জনতা। এ ছাড়া একজন ফ্রেঞ্চ সাংবাদিকের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারা হয়েছে। তাহলে পাশার ধারণাই সত্যি হলো। গল্পে গল্পে রাত গভীর হতে থাকলে বিয়ারের স্বাদও পানসে হয়ে এল। আমরা তিনজনই রাতটাকে আরও বেশি উপভোগ করার জন্য হুইস্কির মতো দেখতে নতুন একটা পানীয় নিলাম। এরপর সারা রাত দিল খুলে আড্ডার সঙ্গে কোক ও হুইস্কির স্বাদে দেহমন চনমনে হয়ে উঠল।

মনে পড়ে, কেউ একজন বলছিল– হুইস্কির স্বাদ কখনো নষ্ট হয় না। তবে পাঁচতলার বারের এই বোতলটা ছিল খুব কড়া। এর স্বাদ অনেকটা পুরোনো আইরিশ পটিনের মতো। *নিউক্যাসল জার্নাল*-এ একবার সারা রাত কাজের পরে পটিন খেয়ে মাতাল হয়েছিলাম। সারা রাত কাজ করলেও তা খুব একটা ফলদায়ক হয় না। একঘেয়েমি কাটাতে শব্দজট মেলাতে মেলাতে পটিনে গলা ভেজানো ছিল আমাদের নিত্যদিনের রুটিন।

সময় ভুলে গিয়ে *টাইমস*-এর পাতায় শব্দজট মেলাতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পটিনের কড়া স্বাদ রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। একসময় আমরা শব্দজটের সমাধান জানতে *টাইমস*-এর অফিসে ফোন দিই। তখন ভোর পাঁচটা। ও পাশ থেকে আমাদের সমাধান জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সকালবেলা পত্রিকাটি কিনে সমাধান দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। হঠাৎ আমার দ্বিতীয় স্বামীর কথা মনে পড়লে একটা ট্যাক্সি ডেকে দ্রুত বাসায় ফিরি। পুলিশ স্বামী আমাকে পরকীয়ার দায়ে অভিযুক্ত করে। কী সাহস! এমন একজন পরকীয়ার অভিযোগ করছে যে একসময় অন্য এক নারীর জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

যত কিছুই হোক, মদের গন্ধ মুখে নিয়ে বাসায় ফেরা মোটেই সমীচীন কাজ নয়। আমি আমতা আমতা করে কাজ থেকে ফিরেছি বললেও উনি বিশ্বাস করছিলেন না। সবাইকে নিজের পাল্লায় মাপা উচিত নয় বলে চিৎকার দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালবেলা উঠে নিজেকে খালি ঘরে একলা আবিষ্কার করি।

যাকগে, তখন ইসলামাবাদ নগরী মধ্যরাতে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। আমরা তখনো ঢকঢক করে কোক ও হুইস্কির গ্লাস খালি করে যাচ্ছি। আমরা

এতই আপন হয়ে যাই যে, সারা জীবন যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলি। বিচিত্র জায়গা থেকে এক পেশার বিচিত্র মানুষ আমরা। সবার জন্য একজন, একজনের জন্য সবাই জান দিয়ে দেব।

আমি হেলেদুলে লিফটে গিয়ে নিচতলায় নেমে আসি, যেখানে পাশা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে ছিল। আমি সোজা হয়ে হাঁটার চেষ্টা করছিলাম। মুসলমান সমাজে মদ্যপান এখনো অশোভনীয় ও অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য।

পাশার রংচঙা হলুদ ক্যাবে উঠে ও যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, সেখানে চলে যাই। আমার শুধু এতটুকুই মনে পড়ে, আমি পা টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি। চোখের সামনে হাজার হাজার তারা নাচছে। একটা ছিমছাম কক্ষ, একটা টেলিভিশন, সঙ্গেই বাথরুম। বিছানায় টলে পড়ি। এরপর সকাল ছয়টা পর্যন্ত আমার আর কিছু মনে নেই।

বিকট শব্দে নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া জঙ্গিবিমানের কানফাটানো শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। একটার পর একটা উড়েই যাচ্ছিল। অবশেষে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তখনো আমি শুয়ে শুয়ে সময় নষ্ট করছি।

তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠেই আমি গায়ে আগের দিনের কাপড় জড়িয়ে নিই। খালি পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়েই সামনে একটা সিঁড়ি দেখতে পেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ওপরে উঠে দ্রুত ছাদে চলে আসি। অবাক হয়ে লক্ষ করি, ছাদ থেকে বিমানবন্দর দেখা যাচ্ছে। পাশা বিমানবন্দরের পাশেই আমার থাকার জায়গা ঠিক করেছে। শুয়ে শুয়ে আমি সকালবেলার কতগুলো বিমান উড্ডয়নের শব্দ শুনেছি। এতই বোকা আমি, তবে আগের রাতের বেশভূষায় খালি পায়ে মাতাল রিডলিকে তখন শূন্য ছাদে কেউ দেখতে পায়নি। শয়নকক্ষে ফিরে এসে আমি কাপড়চোপড় বদলে ভদ্র সাজ ধারণ করি।

নাশতা খেতে খেতে পাশাকে খাইবার পাস যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। বিদেশি সাংবাদিকদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি না থাকায় এটা নিতান্তই অসম্ভব বলে পাশা জানায়।

আমি কখন না-বোধক উত্তর গ্রহণ করি না। তাই আমাকে যেতেই হবে। আমার তীব্র সংকল্প বুঝতে পেরে পাশা হেসে দিল। একসময় ও চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে জানায়, ওখানে কেউ যেতে পারলে একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব।

গাফফারের সঙ্গে যোগাযোগ করে উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক অফিসে চলে যাই। সেখানে বিরস গোমড়ামুখো সরকারি এক চাকুরে সব সাংবাদিকের অনুরোধ উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। ছোটখাটো একটা জাতিসংঘের মতো– জার্মান, ফ্রেঞ্চ, জাপানি, চেক প্রজাতন্ত্র, আমেরিকান, স্প্যানিশ ও আমি।

খুব অমায়িকভাবে আমি লোকটাকে খাইবার পাস হয়ে ভ্রমণের একটা ট্র্যাভেল কাগজ প্রদানের অনুরোধ জানাই।

কোনো সাংবাদিক পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে যেতে পারবে না বলে লোকটা সোজাসাপ্টা বলে দেয়। অনেক সাংবাদিক হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে গেছে। আবার অনেকেই আরও একবার না শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

'কেন?' কণ্ঠস্বর উঁচু করে একটু জোরেই প্রশ্নটা করে বসি। ইতিমধ্যে লোকটা উঠে কোথাও চলে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে সে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমি সেখানে যেতে পারব না। অযথাই আমরা তার সময় নষ্ট করছি।

একটু উত্তেজিত হয়ে যাই। লোকটা সিদ্ধান্ত প্রদানের কেউ নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। আমি সরাসরি তার বসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুখ থেকেই নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে চাই বলে দাবি তুলি।

লোকটা আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। এরপর পাশাকে কিছু একটা বলতেই ও রেগে তার জবাব দিতে শুরু করে। বুঝতে পারলাম, এই সরকারি চাকুরে খারাপ কিছুই বলেছে। কারণ, পাশাকে এত বেশি রাগতে আমি আগে কখনোই দেখিনি।

'ম্যাডাম, আমি এই অঞ্চলের অধিবাসী নই বলে লোকটা আমাকে অশিক্ষিত ভেবেছে। আপনার কথায় সে অনেক রেগে আছে এবং তার বসের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে। লোকটা রেগে গেছে।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে দম নেয় পাশা।

আমি পাশাকে বললাম, নিউক্যাসলের অধিবাসী আর আটপৌড়ে বাচনভঙ্গি অনেক উন্নাসিক লোকের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লোকটা কী বুঝল কে জানে, তবে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

কাগুজে কেরানি কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি ওর পায়ে লেগে থাকা বিশ্রী

ময়লা। একটা দরজা দেখিয়ে সেখানে যেতে বলায় আমি ও পাশা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে বিশাল টেবিলের পেছনে বসে ছিলেন শাহজাদা জিয়াউদ্দিন আলি। দুপাশে উর্দিপরা চাপরাশিরা দাঁড়ানো। পেশোয়ারের নিরাপত্তা বিভাগের ডেপুটি চিফ।

তিনি আমার খাইবার পাস যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সবিনয়ে আমি এটা আমার বসের নির্দেশ বলে জানাই। এ-ও বলি যে, আমি একজন সাংবাদিক এবং এই ঐতিহাসিক উপত্যকা নিয়ে একটা প্রতিবেদন করতে চাই। আমি আপনার অসুবিধা বুঝতে পারছি। আপনি একজন সমঝদার লোক হলেও আমার বস খুবই একরোখা। আমি যেতে পারিনি বললে তিনি বিশ্বাস না করে আমাকে অলস ভাববেন।

আমি খাইবার পাসের ওপর দুটি বই কেনার কথা উল্লেখ করি। দয়া করে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। আপনার দেশের সৌন্দর্যের সুবিচার যেন নিজ হাতের লেখনীতে প্রকাশ করতে পারি।

তিনি কঠোর ভঙ্গিমায় টেবিলের ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকালেন। তারপর একটা মৃদু হাসি দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে বলে জানান। তবে একদমই ছবি তোলা যাবে না বলে বারণ করেন। একই সঙ্গে আমাকে সশস্ত্র পাহারায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং আমি গাড়ি থেকে নামতে পারব না বলে অবহিত করেন।

আমি তাকে উষ্ণ ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে চলে আসি। সেখানে তখনো বিদেশি সাংবাদিকেরা বিরস বদনে অপেক্ষা করছিল। লোকটা অবশেষে হ্যাঁ বলেছে বলে আমি আনন্দে চিৎকার করতে থাকি। আমার কথায় অনেকেই ক্ষোভে শূন্যে ঘুষি ছুড়ল। কিছুক্ষণ পরই সেই কেরানির সামনে পাসপোর্টের পাহাড় জমে গেল।

লোকটি যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, যদি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে মানুষ খুন করা সম্ভব হতো, তাহলে আজ আমি এই বই লিখতে পারতাম না।

পাশা তো আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ– 'ম্যাডাম, আপনি কী জাদু জানেন, তা জানি না। মাঝেমধ্যে আপনি এত কঠোর হয়ে যান যে আমারও ভয় হতে থাকে। তবে আপনি সত্যিই অনেক অমায়িক।'

একজন জার্মান টেলিভিশন কর্মী ক্যামেরা হাতে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁকে গিয়ে ছবি তোলার অনুমতি মিলবে না বলে জানাই। তিনি

ক্যামেরা রেখে কোথাও যেতে পারবেন না বলে হেসে ফেলেন। পরে আমরা একই সঙ্গে রওনা দিই।

আমরা হাসাহাসি করতে করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

এক ঘণ্টা পর সব কাগজপত্র তিনবার করে পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়। আমাদের শহরের অপর প্রান্তে আরেকটা অফিসেও যেতে হয়। আমাদের ক্রুদের সবার প্রস্তুতি শেষে যখন আমরা রওনা দিতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটল। একজন পোলিশ ব্যক্তি ভারী একটা জাপানি মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে এলেন। আমাদের গাড়িতে তাঁর মোটরসাইকেলটা ওঠানো হলো।

আমি আফগান চিত্রগ্রাহক গাফফারের কাছে লোকটার ব্যাপারে জানতে চাইলাম। গাফফার বোতলের জিনের মতো হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, আবার চলে আসে। সে পাশাকে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে, লোকটা একজন পর্যটক এবং তিনি খাইবার পাস হয়ে আফগানিস্তান ভ্রমণের ভিসা পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি একজন পর্যটক হিসেবে এক সপ্তাহ কাবুলে থাকার অনুমতি চেয়ে আফগান দূতাবাসে আবেদন করব বলে মনস্থির করি।

যাত্রা শুরুর আগ মুহূর্তে সুঠাম দেহের অধিকারী খাইবার রাইফেল রেজিমেন্টের একজন সদস্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পাশা আমাকে ট্যাক্সির সামনের আসনে বসার প্রস্তাব দিলে কোনো অস্ত্রে সজ্জিত ব্যক্তি আমার পেছনে বসতে পারবে না বলে সামনে বসার প্রস্তাব নাকচ করে দিই। প্রয়োজনে ওই সৈন্য সামনের আসনে বসবেন।

সম্ভবত ওই সৈন্যকে আমাকে চোখে চোখে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা দুজনই পেছনের আসনে বসি এবং আমাদের যাত্রা শুরু হয়। খাইবারের আগে এক চেকপোস্টে সব কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছিল। তাই আমি বাইরে বের হয়ে পায়চারি করতে লাগলাম।

রাস্তার এক ধারে বড় বড় করে লেখা ছিল, এর সামনে কোনো বিদেশি যেতে পারবেন না। গাফফার একটা ছবি তুলতে চায় বলে চিৎকার করলে আমি নির্দেশকটার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দিই। একটা বাচ্চাছেলে হতবুদ্ধির মতো আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এই ছবিটা পারিবারিক অ্যালবামে রাখা যেতে পারে। একটু পরই ভাবলাম, সাত দিন পরে ছবিটা পৃথিবীকে চমকে দিতে পারে।

আবার খাইবারের দিকে যাত্রা শুরু হয়। একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম যিনি খবর সংগ্রহের জন্য হোয়াইট হলের সামনে ঘুরঘুর করেন। তিনি আমাকে পাহাড়ি খাদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি বলে তিনি জানান।

দীর্ঘ সময় ধরে ইতিহাসের পাতায় আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে ঐতিহাসিক এই খাইবার পাস। এই পর্বতসংকুল দুর্গম জায়গা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে পুনরায় আলোচনায় উঠে এসেছে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা আসন্ন যুদ্ধে এ জায়গার কৌশলগত গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন।

বিশাল বিশাল সামরিক বাহিনী ও শিকারি ডাকাতের দল এই পাসের গভীর গিরিখাদ ও পর্বতচূড়া পেরিয়ে গেছে। মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানিদের কাছেও নিরাপদ পথ হিসেবে এ জায়গা ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এমনকি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও কয়েক দিনের মধ্যে এখানকার ৫২ কিলোমিটার বন্ধুর পথ অতিক্রম করবে। প্রতিকূল ও দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বতমালাকে ঘিরে উত্তরাঞ্চলে সফেদ কোহ পর্বতমালার পাদদেশে কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র উপায় হচ্ছে খাইবার পাস। স্থানভেদে এখানকার পর্বতের উচ্চতা ১০ মিটার থেকে ৪৫০ মিটার পর্যন্ত।

সামরিক কৌশল হিসেবে এই পাসের গুরুত্ব সুয়েজ খাল অথবা জিব্রাল্টারের চেয়ে কম নয়। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ও কাবুলের মধ্যে একমাত্র সংযোগ। ভীত তালেবান গোষ্ঠী ও উসামা বিন লাদেন এখানকার প্রতিটা খাদ ও ফাটল সম্পর্কে অবগত। কিন্তু অনভিজ্ঞদের জন্য এটি একটি নতুন স্থান, যার প্রতিটা ইঞ্চি মাটিতে গোপনে বিপদ অপেক্ষা করছে। সেই সঙ্গে রয়েছে হিমশীতল আতঙ্ক। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চল আক্রমণে বিদেশি শক্তি বারবার এই পাসকে পথ হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং কখনো কখনো এখানে দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতেও দেখা গেছে।

খাইবার পাস মূলত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবেশী আফগানিস্তানে আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে এ অঞ্চলে সব বিদেশি ও গণমাধ্যমকর্মীদের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনিশ্চয়তায় ভরা তিন মিটারের উঁচু পাহাড়ি পথে পৌঁছে দেখি, ল্যান্ড ক্রুজারের জানালা দিয়ে জার্মান টেলিভিশন কর্মীর হাত ঝুলছে। বিশাল

ক্যামেরা তাক করে আমাদের ভ্রমণের প্রতিটা পদক্ষেপ সে ক্যামেরায় ধারণ করে চলছে। দুই পাশের পাহাড়চূড়ার দিকে তাকালে এগুলোকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয়। যদিও পাহাড়ের খাড়া পাদদেশ ধরে শত বছর ধরে তৈরি হওয়া হালকা পদচিহ্ন চোখে পড়ে।

আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তের তিন কিলোমিটারের ভেতরেই পাহাড়টির সর্বোচ্চ চূড়া অবস্থিত। এখানেই আমাদের গাড়ি থেমে যায় ও আমরা নেমে পড়ি। নিচের দিকে তাকিয়ে তোরখাম দেখা যায়। এই ভয়ংকর সৌন্দর্য দেখার পরে ছবি না তোলাটা অপরাধ বলে মনে হলো।

এক নিমেষে সবাই ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং এখানকার সৌন্দর্য ধারণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি গাফফারকে ডাকতেই খেয়াল করলাম স্বভাবসিদ্ধভাবেই ও কোথাও চলে গেছে। একটু রেগে গিয়ে পাশাকে জিজ্ঞেস করতেই ও গাফফারকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

খাইবার রাইফেলসের একজন সদস্য জানায়, আমাদের চোখের সামনের পাহাড়ের অভ্যন্তরের ফাঁকা জায়গা দিয়েই খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ শতকে মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন।

এ বিষয়ে পরে মারিয়ামের লেখা পড়ে আরও অনেক কিছুই জানতে পারি। যতটুকু মনে পড়ে, ও লিখেছিল– তাতার, পার্সি ও মঙ্গোলিয়ানরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এই খাইবার অতিক্রম করেছে। এক শতক পরে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দ্বারা অধিকৃত হলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এখানে পাহারা দিয়েছে।

আফগান যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে ভারতীয় ব্রিটিশ সৈন্য ও আফগানদের মধ্যে অসংখ্য বিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বিখ্যাত যুদ্ধটি হয় ১৮৪২ সালের জানুয়ারিতে। এটি ছিল পরপর তিনটি যুদ্ধের প্রথম যুদ্ধের শেষ মাস। এ লড়াইয়ে প্রায় ১৬ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ও ভারতীয় যোদ্ধা নিহত হয়।

১৮৭৯ সালে ব্রিটিশরা খাইবার পাসের ভেতর দিয়ে একটি সড়ক নির্মাণ করে। পরে ১৯২০ সালে এটিকে মহাসড়কে রূপান্তর করা হয়। একই সময় একটি রেলপথও নির্মাণ করা হয়। তবে রেললাইনের আফগানিস্তান অংশটুকু মেরামত ও সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই রেলে ভ্রমণ হতে পারত পৃথিবীর অন্যতম শ্বাসরুদ্ধকর ও

উত্তেজনাপূর্ণ ভ্রমণ। অনর্থক যুদ্ধ, অনর্থক সংঘর্ষ, অনর্থক দারিদ্র্য। বোমা বানানোর পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয় না করে উচিত ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া এবং এসব ঐতিহাসিক সড়ক ও রেলপথ পুনর্নির্মাণ করা।

অনেক পাথরে খোদাই করা অবস্থায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের প্রতীক জ্বলজ্বল করছিল। দৃশ্যটা অনেক আবেগ ও সম্মানের।

এমন সময় দৃশ্যপটে ঝড়ের বেগে গাফফার হাজির। আমি ওর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়ার আগমুহূর্তেই পাশা আমার পায়ে পাড়া দিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করে। গাফফার এতক্ষণ খাইবার রাইফেলসে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। ফিরতি যাত্রা শুরু হলে সবাই যখন ডানে চলে যাবে, আমাদের তখন বাঁয়ে মোড় নিয়ে তোরখাম পৌঁছে সীমান্ত অতিক্রম করার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সত্যিকার অর্থে গাফফার খুবই হতাশাজনক ব্যক্তি। তবে হঠাৎ হঠাৎ ওর করিৎকর্মা দেখে ওকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে। একজন সৈনিকের সেমি অটোমেটিক হাতে নিয়ে পোজ দিলে গাফফার আমার ছবি তুলে দেয়। আমার নাইকন ক্যামেরাটি ওর হাতে তুলে দিই। আফগান সীমান্তের দিকে তাকিয়ে সেমি অটোমেটিক হাতে নিয়ে গভীর চাহনিতে পোজ দিলে গাফফার বেশ কয়েকবার মুহূর্তগুলোকে ফিল্মবন্দী করে। এই ছবিটা আমি পরে আর কখনোই দেখতে পাইনি। তবে তখন এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই হয়নি।

আমি অস্ত্র ধরায় এতটাই আনাড়ি ছিলাম যে, স্কার্ফে লেগে নিরাপত্তা পিন প্রায় খুলে যেতে বসছিল। নায়কোচিত এক নির্ভীক খাইবার সৈন্য সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে চলে এল। এরা টাকা পেলে যে কারও জন্য জান দিয়ে দিতে পারে। সৈন্যটি শূন্যে অস্ত্রটি ঘুরিয়ে আমার স্কার্ফ ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল।

আমি কী ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, বুঝতে পেরে আমার হাত-পা ঠান্ডায় অবশ হয়ে গেল। এক সাহসী সৈন্য আমার কাছ থেকে ঝটকা মেরে নিরাপদে অস্ত্রটি সরিয়ে নিলে আমি সংবিৎ ফিরে পাই।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে দেখছিল আর হাসছিল। স্বীকার করি, এই রকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছিল। আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সময় কয়েকবার এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। খাইবার পাসে অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়ার এমন

হাস্যকর অভিজ্ঞতার মাত্র সাত দিন পরই যে আমার আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে কাজ করার প্রশিক্ষণ কী দারুণভাবে কাজে দেবে, এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

১৯৯০ সালে ডার্লিংটনে থাকার সময় নর্দার্ন ইকোতে কাজ করতাম। তখন একরকম বাজি ধরেই আমি আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিই। তবে প্রশিক্ষণ চলাকালীন আমার দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং অনেক অনেক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক রাতে আমি আর জিম ম্যাকিন্টোশ কয়েকজন বন্ধুকে রাতে খাইয়েছিলাম। তাদের একজন ছিল সান্দারল্যান্ডে অবস্থিত নর্থ্রাম্বিয়া পুলিশ বাহিনীর সদস্য। সেখানেই আমাকে বাজিটা ধরতে হয়। আমাদের আলোচনা ছিল প্রাণবন্ত ও গল্পগুলো শুনতে আকর্ষণীয় লাগছিল। ওই দিন বুঝতে পারি, বাস্তব জীবনের চেয়ে মজার আর কিছু হতে পারে না। একদল পুলিশ সদস্যের গল্প সব সময়ই আবেগপ্রবণ, দুঃখ ভারাক্রান্ত, হাস্যরসে ভরপুর ও আবেদনময়ী। খাওয়া শেষে আমরা লাউঞ্জে গিয়ে বসি। এক পাশে টিভি চলছিল। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ টিভি দেখলাম। হুইস্কি আর ব্র্যান্ডির বোতল হাতে আমরা ভাবতে শুরু করলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে না থাকলে আমরা কে কী করতাম। সব পুলিশ সদস্যই পুনরায় একই দায়িত্ব পালন করতে পারলে খুশি হতো বলে জানায়। মেয়েরা নাকি নার্সিং পেশা বেছে নিত। কারণ, তাদের কাছে ইতিমধ্যেই জীবন বাঁচানোর সব উপকরণ আছে এবং লাল রক্ত দেখে তারা কেউই এখন আর ভীত নয়। এমন সময়, এক নির্ভীক পুলিশ সদস্য, মার্গি রোল্যান্ড, আমি কী করতাম জানতে চেয়ে বসে। মার্গিকে পরে এক মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য পুলিশ বাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়।

আমি অনেক সময় নিয়ে ভাবতেই লাগলাম। আমার নীরবতা ছিল কানে অসহ্যকর। জিম খোঁচা মেরে বলে উঠল, সংবাদ লেখার খাতা আর কলম ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি রেগে যেতেই আর্মিতে যোগদানের একটা বিজ্ঞাপন আমার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিই, আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতাম। আমার কথায় সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

জিম ব্যঙ্গ করে বলল, আমি নাকি বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান পাইওনিয়ার গ্রুপেই চাকরি পাব না। এত অপমানে আমি তিতিবিরক্ত হলেও মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে আমি সিদ্ধহস্ত। তাই কেউ আমার মনের ভাব

বুঝতেই পারল না। আমি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ০৮০০ নাম্বারে ফোন দিয়ে আমার নাম ও ঠিকানা জমা দিই।

এক সপ্তাহ পরে একজন মধুকণ্ঠী আর্মি অফিসার আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে ফোন দেন। ওই সময় সত্যিই আমার খুব বিব্রতকর লাগছিল। তত দিনে আমার সেনাবাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছাও উবে গেছে। যা-ই হোক, উর্দিপরা ভদ্রলোকের কথা ছিল খুবই চিত্তহরণকারী। অবশেষে আমি ডারহাম সিটিতে অবস্থিত আর্মি নিয়োগ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা করার জন্য রাজি হই।

আমি ফিরোজা রঙের একটা স্যুট পরে হাজির হই। এটা আমার খুব প্রিয় ছিল। তবে একজন বলল আমাকে নাকি ব্যাংকের চাকরিজীবীর মতো লাগছে। যা-ই হোক, নিজেকে বোঝাই জিম যতই আমাকে অস্তিত্বহীন বলুক না কেন, আমার কোনো গুরুত্ব না থাকলে সেনাবাহিনীর লোকজন আমাকে ডাকত না। পরে শুনতে পারি, আমি সাংবাদিক বলেই নাকি আমাকে সেনাবাহিনীতে ডাকা হয়। জানতে পেরে খুবই অবাক হয়ে যাই।

খাকি রঙের উর্দি গায়ে চড়ানো কর্মকর্তা আমাকে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। এই পদে চাকরিরতরা অফিসার পদমর্যাদার অধিকারী হন।

তাই নাকি? আমার পাইওনিয়ার গ্রুপের বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী হওয়ারও যোগ্যতা নেই? সত্যিই তাই? ওহে ম্যাকিন্টোশ, প্রথম পাঠ– কখনো রিডলিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ো না। পরে আমি উইল্টশায়ারে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের স্থলবাহিনীর সদর দপ্তরে নির্বাচক বোর্ডের কাছে পরীক্ষা দিতে যাই। পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ছিল ভয়-ধরানো। আমাকে ন্যাটো বাহিনীতে ৫০টি জিনিসের নাম লিখতে বলা হয়। নারী সৈন্যদের উদ্দেশে একটি জ্বালাময়ী বক্তব্য দিতে হয়। এ ছাড়া কতগুলো তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদনও লিখতে হয়। প্রথম পরীক্ষার উত্তরগুলো নিউক্যাসল গণপাঠাগারে প্রতিরক্ষার ওপর লেখা বই পড়তে গিয়ে শিখেছিলাম। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ছিল গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো। আর তৃতীয় পরীক্ষা ছিল পানিভাত।

একদিন বাসার চিঠির বাক্সে বাদামি রঙের খামে রাজকীয় বাহিনীতে যোগদানের নিমন্ত্রণ পেলাম। প্রথমে বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হয়। রাজকীয়

বাহিনীর মিডলসক্রুতে আমাকে যুক্ত করা হয় এবং যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়।

আমি অফিসে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে জিমের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও এতে একটুও খুশি হয়নি। ওর মতে মানুষ কেবল প্রেম করতেই আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

আমি জোরে হেসে দিলাম। এই লোকটাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। যা-ই হোক, আমি বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে সব প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুছিয়ে আমার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শুরু করে দিলাম। স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমিতে নয় সপ্তাহে দ্রুত প্রশিক্ষণ সমাপ্তের একটা সুযোগ থাকলেও সেদিকে পা বাড়ালাম না।

কীভাবে অস্ত্র ধরতে হয়, অস্ত্রের বিভিন্ন অংশ খুলতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়, পুনরায় সাজাতে হয় এবং সর্বোপরি কীভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়, এসব ছিল প্রাথমিক প্রশিক্ষণের অংশ। ভুলভাবে অস্ত্র ধরা বা ব্যবহার করলে কী হতে পারে, তার ওপর আমাদের একটা ভিডিও দেখানো হয়। কতগুলো আঘাত দেখে আমি ভয়ে নীল হয়ে গেলাম।

প্রথম যখন আমার হাতে পিস্তল দেওয়া হয়, তখন ভয়ে আমার হাত কাঁপতে থাকে। একটা মাঠে নিয়ে আমাকে লক্ষ্যের দিকে গুলি করতে বলা হয়। কোনো সমস্যা হলে একজন প্রশিক্ষক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। আমি কাঁপতে কাঁপতে দুবার গুলি করার পরই পিস্তল জ্যাম হয়ে যায়। ফলে হাত উঁচু করে সবার দিকে ঘুরে তাকাই।

হঠাৎ সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং একজন প্রশিক্ষক অশ্রাব্য ভাষায় খুবই বাজে গালি ব্যবহার করে আমাকে পিস্তলটা মাটিতে নামাতে বলেন। পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দিই। প্রশিক্ষকের কাছ থেকে জীবনের তরে একটা শিক্ষা গ্রহণ করি।

কখনোই শত্রু ব্যতীত কারও দিকে অস্ত্র তাক করতে নেই। অস্ত্র থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে যে কাউকে খুন করে ফেলতে পারে। একদম আমার নাকের ডগায় এসে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করে গেলেন।

আমার মনে হচ্ছিল, মাটি ফেঁড়ে যাক আর আমি এর মধ্যে লুকিয়ে যাই। প্রশিক্ষককে মাথা নেড়ে এরূপ আর জীবনেও না করার সম্মতি জ্ঞাপন করি।

ইতিহাস খুব অদ্ভুতভাবে ফিরে আসে। আজ আমি খাইবার পাসে দাঁড়িয়ে আছি আর একজন সৈন্য আত্মরক্ষায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি খুব বিব্রত বোধ করলাম এবং ঘটনাস্থল থেকে সরে গিয়ে সড়কের ধারে চলে এলাম। মুখে একটা কঠিন ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলাম। আমি অল্পতেই গলে যাই না, এটা বোঝানোর চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখলাম না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকলাম কখন আমি, পাশা ও গাফফার তোরখাম সীমান্ত অতিক্রম করার সময় পাব।

কদিন আগেও এ পথে হাজার হাজার আফগান শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সীমান্ত সিলগালা করে দিয়ে শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিয়েছে। গাফফার একজন চালকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। এই চালকই আমাদের সীমান্ত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। চালকটি জানাল, সব শরণার্থী ফিরে গেছে। চারদিকে এখন পিনপতন নীরবতা। সবাই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার আশঙ্কায় সময় কাটাচ্ছে।

আমাদের গাড়িগুলো রাস্তায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আমি আর পাশা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। গাফফারকে দেখলাম এক সৈন্যের সঙ্গে তর্ক করছে। আমাদের কাছে এসে জানাল, সৈন্যরা আমাদের যেতে দেবে না। আরেকবার আমার আফগান সীমান্ত অতিক্রম করার পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ল। তবে ঐতিহাসিক খাইবার পাস দেখেছি, এ-ও বা কম কী। আনন্দ মনেই ফিরে এলাম।

আমি পার্ল কন্টিনেন্টালে ঢুঁ মেরে পাঁচতলার বারে চলে এলাম। সেখানে তখন ইভান ও তার চিত্রগ্রাহক বসে ছিল। আমাদের সময়সীমা অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় বসে কথা বলতে কোনো বাধা ছিল না। তাই ওদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। তারা নাকি পাকিস্তানিদের মতো পোশাক পরে ডেরা আদম খলিলের অস্ত্র কারখানা ঘুরে এসেছে।

আমিও সেখান থেকে ঘুরে এসেছি বলে জানালাম। তবে ইভানদের দুই দিন আগে। আমরা দুজনই আমাদের প্রতিবেদন পড়ে দেখলাম ও বিভিন্ন তথ্য তুলনা করলাম। সময়টা হাস্যরসে কাটলেও আমি দ্রুত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বাইরে এসেই জিমকে ফোন করলাম।

*মেইল অন সানডে*ও যে অস্ত্র কারখানা নিয়ে প্রতিবেদন ছাপছে, তা জিমকে জানালাম। ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও সম্ভবত আমাদের অফিসের কেউ ডেভ ডিলনকে (*মেইল অন সানডে*র তথ্য কর্মকর্তা) আমার সব তথ্য

আগেভাগেই জানিয়ে দিচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে কারও সঙ্গেই এ ব্যাপারে কথা বলিনি বলে উল্লেখ করি। তাই তথ্য পাচার লন্ডন থেকেই হচ্ছে বলে জিমকে জানাই। আমার মনে হয়, আমি চলে আসার পর জিমও একই কাজ করেছে।

পরদিন আমার সহকর্মী *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর ডেভিড স্মিথের ইসলামাবাদ আসার কথা। ওর জন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা ও বিমানবন্দরে গাড়ি প্রস্তুত রাখতে হবে। তাই সন্ধ্যায় আমি ও পাশা ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দিই। পাশাকে বলে রাখি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে।

আমার কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করলে ডেভিডকে কিছু টুথপেস্ট নিয়ে আসতে বলি। আসার সময় ব্যাগ থেকে টুথপেস্ট চুরি হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি টুথপেস্ট ব্যবহার করছি। এগুলো বেশ নোনতা ও বিস্বাদ।

ডেভিডের আসার কথায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম। ও টুথপেস্ট নিয়ে আসবে শুধু এ জন্য নয়, ও এলে আমি এক দিন ছুটি পাব, যেদিন শুধু শুয়ে-বসেই কাটিয়ে দেব। কোনো কাজ করা লাগবে না আমার। হোটেল রুমে ফিরে এলাম। এতই বিধ্বস্ত ছিলাম যে, দেখে মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে হ্যাঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে। অভ্যর্থনা বিভাগের কর্মীরা আমাকে দেখে মৃদু হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানায়। ক্লান্ত অবস্থায় অসময়ে বের হতে ও ফিরতে দেখতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পরদিন নাশতা করতে গিয়ে বুফে খাবার জায়গায় একবার চোখ বুলিয়ে আসি। মসলাদার খাবারে অভ্যস্ত না হলেও এক বাটি হালকা মসলার মাংসের তরকারি ও দুটো ডিম ভাজি আমার পেটে সয়ে যাবে। মাংসের ঝাঁজ কমাতেই ডিম ভাজি খেতে হচ্ছে। নিজেকে নিয়ে বেশ ফুর্তি লাগে। দুই সপ্তাহ ধরে পাকিস্তানে আছি অথচ এখনো কোনো বড়সড় অসুখ হয়নি।

১৯৯২ সালে দামেস্কে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমার শরীর মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছিল। তখন ডেইজি আমার পেটে সাত মাস ধরে। সাইপ্রাস পৌঁছার পরে তিন দিন বিছানায় শুয়ে ঘড়ি ধরে ওষুধ খেতে হচ্ছিল। আমাকে সিরিয়া যেতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু বহুদিন ধরেই আমি আহমেদ জিব্রিলের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে যখন জিব্রিলের মধ্যস্থতাকারী আমাকে সম্মতি জানায়,

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাকে তখন যাওয়া না যাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছিল। এটা ছিল একটা সুযোগ লুফে নেওয়ার মুহূর্ত।

আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় আহমেদ জিব্রিলের নাম ছিল। তাই সাক্ষাৎকারটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরে অন্য কাউকে লকারবি বোমা হামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। লকারবির দুর্ঘটনার দিন রাতে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম এবং আমি স্বচক্ষে সেদিনের ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী। এই ঘটনার কুপ্রভাব আমার ওপর পড়ে এবং দীর্ঘদিন ধরে এই ক্ষত আমাকে বয়ে বেড়াতে হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফ্লাইটটি নিউ ইয়র্কে যাচ্ছিল লন্ডন হয়ে। তখনই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। সব মিলিয়ে ২৭০ জন যাত্রী ও ক্রু নিহত হন।

সেদিন আমি *নিউক্যাসল জার্নাল*-এর প্রধান অফিসে দিনের বেলায় কাজ করছিলাম। সন্ধ্যা ছয়টায় আমার কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। আমি অফিস থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাতে কাজ করার জন্য ওয়েন হ্যান্টন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হয়। ও অস্থিরচিত্তে পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ও অ্যাম্বুলেন্স অফিসে ফোন করছিল। ও প্রায় চিৎকার করে বার্তা সম্পাদক টম প্যাটারসনকে জানায় যে সীমান্তে কোথাও বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো নিচদিয়ে উড়ে যাওয়া হালকা ধরনের কোনো বিমান হবে।

যা-ই হোক, আমি আরও কিছুক্ষণ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেল দুর্ঘটনাটি বড়ই মর্মান্তিক, ছোটখাটো কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেই ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যাই এবং আমি আর ওয়েন প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি নিয়ে লকারবির দিকে রওনা দিই। সেদিন ছিল ১৯৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট। আমি ফ্লোরবোর্ডে পা নাচাচ্ছিলাম। লকারবি ছিল উত্তর পশ্চিম দিকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে। কিন্তু সড়ক ধরে রওনা দেওয়ায় আমরা জ্যামে আটকা পড়ি। সাত মাইল ধরে ছিল থমকে যাওয়া যানবাহনের দীর্ঘ সারি। তাই আমরা এ৬৯ মহাসড়ক ছেড়ে গ্রেটনা গ্রিনের দিকে ঘুরে যাই। সংবাদ পৌঁছানোর সময়সীমা দ্রুত কমে আসছিল। একটুও বিচলিত না হয়ে তাই একরকম ঝড়ের বেগে গাড়ি নিয়ে প্রায় উড়ে চলি। রাস্তার সব কটা পুলিশ চেক পয়েন্ট এক নিমেষেই পাড়ি দিতে সক্ষম হই। একসময় শহরের মাঝখানে পৌঁছে যাই, যেখানে বোমা বিস্ফোরণে পড়ে বিমানটি আছড়ে পড়ে।

সবকিছু কেমন থমকে গিয়েছিল সেদিন। বাতাসে বিমানের জ্বালানি পোড়া গন্ধ ভাসছিল। পরিবেশটা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। আমার দৃষ্টি বারবার আটকে যাচ্ছিল।

রাস্তার ওপর টনকে টন লোহা, নাট-বল্টু ও ভাঙা ধাতব টুকরা পড়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ একটা বড়সড় ভাঙাড়ির দোকানের সব লোহালক্কড় রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। শহরের অধিবাসীদের মুখে কোনো কথা ছিল না। বিস্ফারিত নয়নে তারা এদিক-ওদিক দেখছিল। ঘড়ির কাঁটাটাই যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে গিয়ে ওয়েন ও আমি দুদিকে চলে যাই। কতিপয় স্কটিশ প্রতিবেদক বাদে আমরাই প্রথম সাংবাদিক দল হিসেবে সেখানে পৌঁছাই। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত তথ্য একত্র করার চেষ্টা করি। একটা লোকাল লাইন ব্যবহার করে অফিসে যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ লাইন তখন বিচ্ছিন্ন। সে সময় স্থানীয় সংবাদ পত্রিকার স্বল্প বাজেটে মুঠোফোন ব্যবহারের কথা চিন্তাই করা যেত না। ফোনগুলোও সে সময় ছিল একেকটা ইটের আকৃতির। দামও ছিল আকাশছোঁয়া। এখনকার পাতলা স্মার্টফোনের যুগ তখনো শুরু হয়নি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একজন লরিচালককে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ছাদভর্তি অ্যানটেনা। জানতে চাই যোগাযোগের কোনো মাধ্যম আছে কি না। দ্রুতই নিজের পরিচয় দিয়ে অফিসে সংবাদের প্রথম অংশ পাঠাতে হবে বলে ব্যাখ্যা করলে তিনি আমাকে লরির ভেতরে যেতে বলেন। চমৎকার, আমার পত্রিকা মুফতে এখন একটি ভ্রাম্যমাণ অফিস পেয়ে গেল ফোন সংযোগসহ। আমি দ্রুতই আমার প্রতিবেদন অফিসে পাঠিয়ে দিই।

আমি যখন ফোনের অপর প্রান্তে থাকা নকল লেখকের কাছে প্রতিবেদনটি শ্রুতিলেখন করাচ্ছিলাম, সে সময় স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে শোনা এক রহস্যময় লরিচালকের কথা উল্লেখ করি। সেই রহস্যময় চালক নায়কের মতো সড়কের মাঝে তার লরি দাঁড় করিয়ে দুর্ঘটনাস্থলগামী সব গাড়ি থামিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে চালকের আসন থেকে একটু আগেই যে চালক আমাকে তার লরির সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে, সে লাফিয়ে ওঠে, আরে আমিই সেই ব্যক্তি, মানুষ আমাকে সত্যি সত্যি নায়ক বলতে শুরু করেছে? যেকোনো চালকই এই দুরবস্থার সময় এই রকমই করত। চিৎকার শুনে আমি নকল লেখককে বললাম,

রহস্যময় চালকের কথা কেটে দাও। আমি এক্ষুনি চালকের নাম, ঠিকানা ও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাঠাচ্ছি।

হ্যাঁ, ওই দিন আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম। মাঝেমধ্যে এ রকম নাটকীয়তার প্রয়োজন পড়ে।

আমি দ্রুত ওয়েনকে নিয়ে লরির ভ্রাম্যমাণ অফিসে চলে আসি। ওয়েনও তার প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেয়। আমাদের আগে আর কোনো সাংবাদিক দুর্ঘটনার খবর তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। টম প্যাটারসন খুব খুশি হয় এবং রাত তিনটার প্রথম সংস্করণের আগ পর্যন্ত আমরা কাজ করে যাই। পড়তে পড়তে এই খাটাখাটনিকে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু একজন সাংবাদিককে সব সময়ই সব দিক থেকে খবর ও তথ্য সংগ্রহের জন্য চৌকান্না থাকতে হয়। কারণ, পাঠকেরা পরদিন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য এমনভাবে মুখিয়ে থাকে, যেন তারা নিজেরাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। কখনোই ভেঙে পড়া যাবে না এবং আবেগকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। চোখের পানির বাঁধ পড়েও নিভৃতে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ পরে নিউক্যাসল ভিত্তিক সাংবাদিকদের দলকে ভিড় করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে বিখ্যাত *ডেইলি মিরর*-এর ক্লিভ ক্রিকমায়ার ও *সান*-এর ডগ ওয়াটসনও সদলবলে হাজির হয়েছিলেন। ওয়াটসন তখন আর্নডেলে ক্রিসমাসের শপিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়েই তিনি সুদূর ম্যানচেস্টার থেকে দৌড়ে চলে আসেন। *ডেইলি মেইল*-এর রজার স্কট ও *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর অ্যালান বেক্সটার, যাঁরা সান্ডারল্যান্ডে একটা খুনের ঘটনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও সব ফেলে ছুটে আসেন। হিথরো থেকে গ্লাসগোগামী ফ্লাইটে আনন্দ করতে করতে উড়ে আসে ক্রিস বুফে। ক্রিস *ডেইলি স্টার*-এর বড়দিনের পার্টিতে নাচতে গিয়েছিল। মদ্যপানের পরেও মাতাল না হওয়ার জন্য ক্রিস বিখ্যাত। এ রকম পার্টির পরে একমাত্র ক্রিসের পক্ষেই বিমানভ্রমণ করা সম্ভব ছিল। আমি আর ওয়েন একরকম নিজেদের লুকিয়ে রাখি। কারণ, মহারথী সাংবাদিক দলের সবার বড় বড় মোবাইল ফোনগুলোর চার্জ ফুরিয়ে আসছিল। আমরা তখনো আমাদের লরির ভেতর গোপন জেলা অফিস পাহারা দিচ্ছিলাম।

তখনকার দিনে ঘটনার পরের কয়েক দিনে ঘটনার ভয়াবহতা ও শোক অনুভব হতে শুরু করত। সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের কখনো কখনো মানসিক পরামর্শের প্রয়োজন পড়ত। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি আমার অনুভূতি হেসে উড়িয়ে দেন। পুলিশ বাহিনী নাকি এর থেকেও ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। আমি জানি না, কিসের ভিত্তিতে তিনি এমন দাবি করেছেন। তবে এর পর থেকে আমি ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা করিনি।

সত্য বলতে এর পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি কোনো বড়দিনেই বেশি আনন্দ করতে পারিনি। লকারবির দৃশ্যগুলো এখনো চোখে ভেসে ওঠে। খোদাই জানেন, স্বয়ং লকারবির বাসিন্দারা কীভাবে এই দুঃসহ স্মৃতি ভুলে আছেন? মাঝেমধ্যে এসব তথাকথিত উৎসবের মাসে আমার মন চলে যায় সেই সীমান্তঘেঁষা শহরে, যে শহর এখনো বুকে দগদগে ঘা বয়ে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ে, আমি দুজন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, যাঁরা তখন টেলিভিশনে *এটাই আমার জীবন* শীর্ষক সিনেমা দেখছিলেন। তাঁদের দুটি সন্তান তখন বাইরে বিশাল ক্রিসমাস ট্রিয়ের নিচে খেলছিল, যখন এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে তাঁদের বাড়ি কেঁপে ওঠে। নড়েচড়ে ওঠার আগেই কয়েক সারি বিমানের আসন তাঁদের জানালা ভেঙে ঘরে আছড়ে পড়ে। পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া যাত্রীদের মৃতদেহ তখনো আসনগুলোতে বসা ছিল।

এই অকল্পনীয় দৃশ্যের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। তাঁরা কীভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজেদের? কীভাবে সন্তানদের বুঝিয়েছেন? পুরো অভিজ্ঞতা এখনো আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। নিশ্চিতভাবেই আমি দুর্ঘটনা-পরবর্তী মানসিক অবসাদজনিত সমস্যায় ভুগছিলাম। তবে শক্তসমর্থ সংবাদকর্মীরা কখনোই এসব আবেগতাড়িত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না। তাঁরা শুধু চালিয়েই যান।

এসব কারণেই জিব্রিলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি তাঁকে দোষারোপ করতে চেয়েছিলাম। ঘটনার দিনটাকে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরাটা জরুরি ছিল। তাই আমি দামেস্কে গিয়েছিলাম। তবে জিব্রিলের কাছ থেকে অনুতাপ বা অপরাধের স্বীকারোক্তি পাব, এমন আশা আমি কখনোই করিনি।

তাঁকে কিছুটা অর্ধসভ্য মানুষ বলে মনে হলো। আমি তাঁকে পাশের বাড়ির বয়স্ক চাচার মতোই বিবরণ দেব। তাঁর চেহারায় মায়া লুকানো ছিল।

গভীর বাদামি চোখ দুটো যেন অনেক দুঃখ-বেদনা সয়ে বেঁচে আছে। দোভাষীদের মাধ্যমে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্ব চলে এবং তিনি সরাসরি জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। আমি তিনবার ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রসঙ্গটা তুললেও প্রতিবার তিনি একই উত্তর দেন। তবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত একজনকে তো আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সরাসরি প্রশ্ন করা সম্ভব নয়।

আমি একটা ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিই। লকারবিতে সেদিন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করি। যা যা দেখেছি, পাথরের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ, ছাদের ওপর পড়ে থাকা একটি শিশুর মৃতদেহ, একজন শহরের অধিবাসী যার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই ছিল না, তিনি কীভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন–এসব ঘটনার বিবরণ দিই। আমিও যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম, তা-ও উল্লেখ করি।

হঠাৎ করে বাদামি চোখ দুটো কুঁচকে যায় ও তার চেহারা শক্ত হয়ে যায়। তিনি ক্ষোভে বলে ওঠেন, আমাদের প্রতিদিনই ধ্বংসস্তূপ থেকে ইসরায়েলি বোমার আঘাতে মৃত শিশুদের নিথর দেহ কুড়াতে হয়। এখন তোমরাও কিছুটা আঁচ করতে পারবে আমাদের কেমন লাগে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কী বীভৎস ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি।

খুব শক্ত ও দৃঢ় কথা। বক্তব্যের খুব গভীরে ঘৃণা ও বেদনা লুকানো ছিল। সেখানে তখন এতই বেদনা ও কষ্ট বিরাজ করছিল যে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। পরে তিনি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে লকারবি তদন্ত দলের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তাব রাখেন। তবে নিউক্যাসল থেকে প্রকাশিত *সানডে সান* ও আমাদেরই আরেকটা প্রকাশনা *স্কটল্যান্ড সান*-এ উল্লেখিত জিব্রিলের প্রস্তাবের প্রতি কেউই সাড়া দেয়নি।

আমি তার সঙ্গে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করলাম। সাক্ষাৎকারের শেষ দিকে আমার পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব হয় এবং তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে ব্যথাটা কমে আসে। আমি সত্যিই জানি না কীভাবে আমি সেখান থেকে হোটেল রুম পর্যন্ত ফেরত আসি। ব্যথায় আমার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে আসতে চাচ্ছিল।

আমি বুঝতে পারিনি কী কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, দামেস্কে আমি খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেছি। সালাদ-জাতীয় খাবার

এড়িয়ে চলেছি। বোতলজাত পানি দিয়ে দাঁত মেজেছি। পানীয়তে কোনো প্রকার বরফ মেশাইনি। এক দিন পুরোটা আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। কিছুটা ভালো অনুভূত হলে কোনোমতে বিমানবন্দর পৌঁছে সোজা সাইপ্রাস চলে আসি। আমার সন্তানের বাবা দাউদ জারোজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে নিকোশিয়ার একটি ক্লিনিকে নিয়ে আসেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসক আমার গত কয়েক দিনের খাদ্যতালিকা যাচাই করে দেখেন। আমার মনে পড়ে, স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি আইসক্রিম খেয়েছিলাম, যা দেখতে ছিল খুবই সুস্বাদু। নিজেকে তখন মনে হচ্ছিল আস্ত একটা গর্দভ। আইসক্রিমের পুরোটাই যে পানি দিয়ে তৈরি, তা কখন ভুলে গেছি।

আইসক্রিমের অর্ধেকের বেশি উপাদান যে পানি, তা আমার মনে পড়েনি। স্থানীয় বাজার থেকে বোকামি করে এক গ্লাস পানি খাইনি, এই তো বেশি।

দামেস্কের অভিজ্ঞতার পর থেকে দেশের বাইরে গেলে খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমি বেশ সতর্ক থাকি। ইসলামাবাদে এসেও অনেক বাছবিচার করে খাবার বেছে নিচ্ছি। সকালবেলা দুটো ডিমভাজি, ব্যস এর থেকে বেশি কিছুর দরকার পড়ে না। যদিও আমার হোটেলের সব ব্যবস্থা আধুনিক, তবে প্রান্তিক অঞ্চলে শৌচাগারের অবস্থা খুবই করুণ। কোথাও কোথাও হয়তো চার দেয়ালঘেরা শৌচাগারের কোনো অস্তিত্ব নেই। খোদা না করুক, যদি কখনো কোনো উন্মুক্ত জলাধারে খোলা জায়গায় বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হয়, কী শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হব, তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমার নাশতার পর্ব শেষ হতেই ডেভিড এসে হাজির। চেহারায় দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির ছাপ ছিল স্পষ্ট। দুই টিউব টুথপেস্ট নিয়ে এসেছে সে। গতকাল সে রাত চারটার পরে অবতরণ করে। পাশা তখনো ওকে গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। পাশাকে দেখে ডেভিডের মন ভালো হয়ে যায় বলে জানায়। দূর পরবাসে পরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ মনে কী যে আনন্দের সঞ্চার করে, তা বলে বোঝানো কঠিন।

গল্প করার জন্য বেশি সময় পাওয়া গেল না। ওকে এক্ষুনি পেশোয়ারের উদ্দেশে রওনা দিতে হবে।

আমি সংগ্রহে থাকা খাইবার পাসের ওপর একটি বই ডেভিডের হাতে তুলে দিলাম। ওকে বললাম, পাকিস্তান এলে একবার খাইবার পাসের অসাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত। ডেভিড বয়সে এখনো যথেষ্ট তরুণ। অত্যন্ত চমৎকার পুরুষ মানুষ। মাথায় হাজার কাজের চাপ থাকলেও খুব আয়েশি ভঙ্গিতে কাজ করতে সিদ্ধহস্ত। ওর এই ধীরস্থির ভাবের জন্য ওর পক্ষে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ডালভাতের ব্যাপার। সারা দিনই ও অফিসের ডেস্কে বসে থাকে। হয় ওর কোনো আপনজন নেই অথবা ও খুব কাজপাগল। সারা দিন ডেভিডের অফিসে কাটানোর বিষয়টা আমি ভালো করেই জানি। কারণ, আমি নিজেও একই কাজ করি।

পাশাকে এক দিনের ছুটি দিতে চাইলাম। তবে ও স্বেচ্ছায় ডেভিডকে নিয়ে আশপাশে ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে নিল। ডেভিড নিজের মানুষ খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝেমধ্যে পাশাকে পাঠিয়ে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে ওর প্রতি আমার অগাধ আস্থা। অন্তত এখন পর্যন্ত ফ্লিট সড়কের ছিদ্রান্বেষী সাংবাদিক দলের কুপ্রভাব ডেভিডের ওপর পড়েনি।

অনেক দিন পরে শুয়ে-বসে অলস সময় কাটালাম। আমার অল্প কয়েকটা পরিধেয় নতুন বস্ত্র ব্যাগে গোছানো ছিল। অধিকাংশ কাপড় হোটেলের লন্ড্রিতে। তাই গাফফারের দেওয়া উসামা বিন লাদেন লেখা একটা টি-শার্ট পরে দিনটা পার করে দিলাম।

প্রায় সারা দিন ধরে এক লোক আমার দরজায় নক করে বিরক্ত করল। কোনো কিছু লাগবে কি না, আমি হোটেল কর্তৃপক্ষের সেবায় সন্তুষ্ট কি না, এসব হাবিজাবি ব্যাপার। পুরুষ মানুষ যদি আরেকটু সোজাসাপটা কথা বলতে শিখত, ওদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে যেত। হোটেল বয়টা চাইলে আমার কোনো পানীয় লাগবে কি না জানতে চাইত এবং একটা চুরুট চাইতে পারত। সরাসরি বললেও আমি রাজি হতাম না, তবে বিরক্তির পরিমাণটা একটু হলেও কমত।

যা-ই হোক, কয়েক ঘণ্টা পরে দরজায় ঠোকাঠুকি একদম বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটা আরও একবার বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত করলে দরজা খুলে আমি একই বক্তব্য শুনতে পাই, আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না। একটু রাগী স্বরে বললাম, হ্যাঁ দরকার আছে। এক ব্যাগ স্যানিটারি

ন্যাপকিন এনে দাও। আমার মাসিক শুরু হয়েছে। ব্যস! ওই বয় ভুলেও আর আমার দরজামুখো হয়নি।

ইসলামাবাদ ছেড়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। মানুষটাকে নিয়ে কেন যেন উৎসাহী হয়ে ওঠি। সপ্তাহজুড়ে আমরা মুঠোফোনে খুদে বার্তা চালাচালি করি। আমার বিশ্রাম নেওয়ার দিনে একটা বার্তা পেলাম ওর কাছ থেকে। দিনকাল কেমন কাটছে? ব্যস, এতটুকুই।

জবাবে *সানডে টাইমস*-এ আমার প্রকাশিত নিবন্ধের ব্যাপারে ওর মতামত জানতে চাই। ভেতরে ভেতরে ওর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার আশা করলেও সত্যিই নিবন্ধটার ব্যাপারে ওর মতামত জানতে চাই। জবাব দেখে আমি ভিরমি খাই। সুন্দর করে লিখেছে, পত্রিকা কেনার প্রয়োজনবোধ করিনি। ব্যাটার ভাগ্য ভালো যে আমি ইসলামাবাদে ছিলাম এবং ফোন ধরে ঝগড়া বা তর্ক করার ইচ্ছা জাগেনি। শুধু 'বড় ভুল করেছ' লিখে দিলাম।

বাড়িতে ফেরত আসার পরও ও আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন দিয়েছে। কথা চালিয়ে যেতে আমি খুব আগ্রহ পাইনি। তার কিছু বোঝার ক্ষমতা ছিল না, ঠিক যেমন অধিকাংশ পুরুষের থাকে না। পত্রিকা একরকম জীবনের মতো। ডেইজি আসার আগ পর্যন্ত পত্রিকাই ছিল আমার সবচেয়ে কাছের, বিশ্বস্ত সঙ্গী। প্রেমিক ও স্বামীরা এসেছে এবং চলেও গেছে। কিন্তু তাদের কারোরই সাধ্য ছিল না আমার জীবনে পত্রিকার গুরুত্বের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার।

পত্রিকার কাজ আমার জন্য বেশ ভালো একটা উপার্জনের পথ। এখানে সহমর্মিতা আছে, উত্তেজনা, আতঙ্ক, শিহরণ, ভালো খাবারদাবার–সবকিছুই হাত ধরাধরি করে চলে। কাজের সুবাদে আমি বড়সড় একটা বন্ধুমহল ও পরিজন পেয়েছি। ডেইজিকে আমি নিঃশর্তভাবে ভালোবাসি। তাই সকালবেলা সুন্দর একটা নাশতা, একটু আদর ও সঙ্গীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর মুহূর্তগুলোর অভাব অনুভূত হচ্ছে প্রতিদিন।

পুরুষদের চিন্তাধারা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ওদের বোঝার চেষ্টা বন্ধ করেছি, সে-ও অনেক আগের কথা। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে রমণীমোহন পুরুষ হওয়াটা অনেক কঠিন একটা কাজ। মেয়েরা যেমন ভিতুদের পছন্দ করে না, তেমনি বখাটে ছেলেরাও তাদের দুই চোখের বিষ।

তিনবার সংসার করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি নিতান্তই একজন সাংবাদিক ও মমতাময়ী মা হয়ে বাঁচতে চাই। এদের মধ্যে সমন্বয় করে

চলতে হবে, যতটুক আমার পক্ষে সম্ভব। সম্প্রতি আমার খুব ভালো বন্ধু বেরি আটওয়ানের সঙ্গে একই সঙ্গে ডিনার সেরেছি। বেরি লন্ডনভিত্তিক আরবি দৈনিক *আল কুদস*-এ চাকরি করে। খেতে খেতে আমার সাবেক সঙ্গীদের প্রসঙ্গও উঠে আসে। আমার মনে হয়, মধ্যস্থতা করে বিয়ে করা যে খারাপ জিনিস নয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমি। বেরি কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে খুব সাধারণভাবে তাকিয়ে থেকে মুখটা সোজা রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ক'জন সাংবাদিকের, তাদের মধ্যে বেরি একজন। তাই এ বিষয়ে ওকে নিয়মিত মন্তব্য করে বেড়াতে হয়। ১১ তারিখের পর থেকে কোনো না কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের পর্দায় বেরিকে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। এই কুখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত সাক্ষাৎকার নেওয়ার কয়েক মাস পরই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য গণমাধ্যমকর্মীদের মতোই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে প্রতিবেদন করতে চেয়েছিলাম আমি। তবে ভেতরে ভেতরে বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটা ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছি। আসার আগে কয়েক দফা বেরির থেকে পরামর্শও নিয়েছি। বেরির ভাষ্যমতে বিন লাদেন একজন খুবই সাবধানী মানুষ। তাঁর কাছে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস এমনকি হাতঘড়ি পরে যাওয়াও বারণ। আফগানিস্তানে অনেক লোকই আমাকে বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারবে বলে বেরি জানায়। তবে এসব মধ্যস্থতাকারীর অধিকাংশই কেবল ফাঁকা বুলি আওড়াবে। তাই এই বিপজ্জনক কাজ করার আগে আমাকে খুব সতর্ক থাকতে উপদেশ দেয় বেরি।

বুঝলাম, সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। আহমেদ জিব্রিলই আমাকে এক বছর ধরনা দেওয়ার পরে সম্মুখ সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিন লাদেন আরও বেশি সময় নিতে পারেন। তবে যত কিছুই হোক, ধীরেসুস্থে এগোলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

ধৈর্য ধারণের এক বিরল প্রতিভা আমার রয়েছে। জানি না এটা কতটুকু ভালো অথবা মন্দ, তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকলে আমি কখনোই হতাশ হই না

অথবা সাহস হারাই না। অথচ যদি আগেই বুঝতে পারি যে কাজটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে সময় থাকতে থাকতে কেটে পড়ি আগেভাগেই।

ব্যর্থতা আমার পছন্দ নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে সহজেই আমি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করি না। নেতিবাচক কাজও আমার কর্ম নয়। হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটা দারুণ খেলায় মগ্ন হয়ে যাই। হায়েল মিলসের করা ১৯৬০ সালের বিখ্যাত ছবি পলিএনাতে প্রথম এ খেলাটার ব্যাপারে ধারণা পাই। যাঁরা এ বিষয়ে অবগত নন, তাঁদের বলছি, পলিএনা ছিল একটা এতিম বাচ্চা। কখনো মন খারাপ হলে ও আনন্দ আনন্দ খেলত। অর্থাৎ আনন্দের কিছু মনে করে দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করত। খারাপ কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেও ও মনে মনে আনন্দদায়ক কিছু চিন্তা করে বেড়াত–আমার মন খারাপের বিষয়গুলো ভুলিয়ে দাও। মাঝেমধ্যে ভাবি, তিনটা ব্যর্থ বিয়ে ও অসংখ্য স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কের ইতিহাস থাকলে পলিএনা এসব ভুলে যেতে কী নিয়ে ভাবত? যা-ই হোক, এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার ব্যাপারে ও সাংবাদিকতা চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কে জানে, হয়তো উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার গোপন ইচ্ছাটা পূরণও হয়ে যেতে পারে।

# ডেইজি, দাউদ ও দুর্গম বিপদ

সকাল সকাল আমাকে নিয়ে যেতে পাশা চলে এলো। ওকে জানালাম, আফগান দূতাবাসে একবার যোগাযোগ করা দরকার। কয়েক দিন পরই একদিন সকাল নয়টায় যে ভিসা সংগ্রহের কথা ছিল, সেটাকে এত দিনে স্কচ হুইস্কির মতোই দুর্লভ ও দামি মনে হচ্ছিল। তবে দামি এই বস্তুটার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই সামনে বসা লোকটার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল– আমার কাছে ৫০০ ভিসার আবেদনপত্র জমা আছে এবং কাবুল থেকেই ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। তবে এই মুহূর্তে ভিসা দেওয়া বন্ধ। একই পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করে আগামী সপ্তাহে আবার দেখা করতে বলল নিরস লোকটি।

একটুও দমে গেলাম না। সরে না গিয়ে আমি বলতে শুরু করি, আমার সত্যিই তোমার দেশে যাওয়া প্রয়োজন। ওখানে কী ঘটছে তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শুনেছি, কাবুল হাসপাতালে উপজাতি লোকজন দল বেঁধে রক্ত দিচ্ছে বিমান হামলার আশঙ্কায়। একবার যেতে পারলে আমিও এক ব্যাগ রক্ত দান করে আসব।

প্রস্তাব শুনে লোকটা অবিশ্বাস আর সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। হয়তো তিনি ভাবছিলেন, আমি বদ্ধ উন্মাদ অথবা অবিশ্বস্ত বিদেশিদের রক্তের দরকার নেই। আমার অনুরোধে লোকটার চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটল না। বুঝলাম, দ্রুতই আমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না।

খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে পাশা ফিক করে হেসে দিল। ও খোঁচা মেরে বলল, আমি নাকি অপরাজেয় মানুষ। এবং এই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করি দেখে আমার নাকি এত দিনে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী পেয়ে যাওয়া উচিত

ছিল। জবাবে কার্যসিদ্ধির জন্য একাধিক উপায় বিদ্যমান বলে আমাদের আরও অপেক্ষা করা উচিত বলে ওর মুখ বন্ধ করে দিই।

এরপর একটা সরকারি অফিসে যাই, যেখান থেকে কাশ্মিরের ভিসা ইস্যু করা হয়। কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে পর্যটক হিসেবে কাশ্মির যেতে চাই বলে অফিসে বসা কর্মকর্তাকে বলি।

তিনি আমার হাত থেকে দ্রুত আবেদনপত্রটা নিয়ে তিন সপ্তাহ পর দেখা করতে বলেন। এরপর তিনি উঠে চলে গেলেন এবং অফিসের কাউন্টারে আর ফিরে আসেননি। তাই একসময় আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আমি কাশ্মিরে যেতে চেয়েছিলাম আল-বদর গ্রুপের ক্যাম্প পরিদর্শন করতে। এরা কাশ্মিরভিত্তিক একটা সন্ত্রাসী দল। খুব সম্ভব আমেরিকান বাহিনী সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আল-বদর ক্যাম্পে বোমা নিক্ষেপ করবে।

পাশাকে পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাই। আমরা দুজন ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে বেশ কয়েকটি অফিস পরিদর্শন করি। এগুলো আল-বদর ও বিভিন্ন মুজাহিদিন গ্রুপের স্থানীয় অফিস। আমি ব্রিটিশ এবং ওদের ঘাঁটি পরিদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করছি, এসব জানার পর অফিসের লোকজন কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে। অবস্থা সামলাতে পাশা এগিয়ে আসে এবং উর্দুতে কথা বলতে শুরু করে। আমি কে ও কী কারণে ওদের সামরিক ঘাঁটি দেখতে চাই, এসব কথা বেশ সময় নিয়ে পাশা ওদের বোঝাতে থাকে।

এক বিন্দু উর্দু না বুঝলেও ওদের কথা শুনে এমনই মনে হচ্ছিল। এক অফিসে তো পাশা ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চালিয়ে যায়। বিন্দুবিসর্গ বুঝতে সক্ষম না হলেও অনুমান করি, পাশা বলছিল আমি একদমই নিরীহ গোছের শান্তশিষ্ট মানুষ এবং ইতিবাচক প্রতিবেদনই তৈরি করব। মুজাহিদিন অফিসে মুমতাজ নামের এক তরুণ পাকিস্তানি আমাদের জন্য একটা ভ্রমণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে বলে কথা দেয়।

এক ছাপাখানা থেকে নতুন করে কতগুলো বিজনেস কার্ড ছাপিয়ে নিই। লন্ডন থেকে নেওয়া কার্ডগুলোতে *এক্সপ্রেস*-এর লোগোতে ক্রুশ চিহ্ন ছাপানো ছিল। পাছে ক্রুশ চিহ্ন না আবার কোনো ভুল ধারণা তৈরি না করে, তাই বিখ্যাত ক্রুশ মুছে দিয়ে নতুন কার্ডগুলো বানিয়ে নিই।

কখন আবার এখানকার মুসলমানরা খেপে ওঠে, এ ভয়টা সব সময় কাজ করত। প্রেসিডেন্ট বুশ ইতিমধ্যেই এক বক্তব্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই কখন আবার আমি ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই ধারণা জনগণের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে বসে, সেই শঙ্কাও ছিল।

দিনটা সব মিলিয়ে ভালো-মন্দের মিশেলে পার হয়ে যায়। সন্ধ্যায় কফি খেতে খেতে আগামী এক সপ্তাহের কাজের ফিরিস্তি সাজাচ্ছিলাম। কাশ্মিরের সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি পরিদর্শনের সুযোগ না পেলে আমার সামনে আফগানিস্তান যাওয়ার পরিকল্পনাই বাকি থাকে। হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যারা তখনো রয়ে গেছে, তাদের অনুভূতি জানাটা খুব জরুরি। এ নিয়ে একটা ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। কয়েকজন আফগান নারীর সঙ্গেও আমাকে কথা বলতে হবে। জানতে হবে তাদের অন্ধকার জগতের উপাখ্যান।

পাশা কয়েক জায়গায় ফোন করে কথা বলে। একসময় আমার হাতে ফোনটা দিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করে। আলাপের সারমর্ম হচ্ছে, এক হাজার দুই শ ডলারের বিনিময়ে আফগানিস্তানের সীমান্তের কাছে দাউর বাবায় পৌঁছে যাব।

এক হাজার দুই শ ডলার খরচ করে সীমান্তের কাছ থেকে ঘুরে আসব? আমি প্রায় ধমকের সুরেই বললাম। এ-ও বললাম, জালালাবাদ নিয়ে যেতে পারলে আমি রাজি। আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়নি যে, এত টাকা খরচ করে সীমান্ত থেকে ঘুরে আসব। কড়া ভাষায় বললাম, আমি দেশটার একদম ভেতরে ঢুকতে চাই। অথবা কোনো চুক্তি হবে না বলেই ফোনটা পাশাকে দিয়ে দিলাম।

পাশা আরও কিছুক্ষণ লোকটার সঙ্গে কথা বলল। ওর গলাটা আস্তে আস্তে চড়ে যাচ্ছিল। এক বেয়াড়া আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। পেছনে বসে খবরের কাগজ পড়তে থাকা এক নিরীহ গোছের পাকিস্তানি লোকও আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি কাগজে কিছু একটা লিখতে শুরু করেন। একটু ভয় পেয়ে যাই।

তৎক্ষণাৎ একটা ছোট কাগজে লিখে পাশার হাতে তুলে দিই। আস্তে কথা বলো। সম্ভাব্য পাকিস্তানি আইএসআইয়ের এজেন্ট পেছনে। পাশা দ্রুত লাইনটা কেটে দেয়। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা পথে বের হয়ে পুনরায় ওর হলুদ ট্যাক্সির কাছে এসে একত্র হই। ট্যাক্সিটা দেখলে ভাঙাচোরা মনে হয়। ভেতরের এসিটা নিজের খেয়াল-খুশিমাফিক চালু হয়।

তবে গাড়ির ইঞ্জিনটা সিংহ হৃদয়ের এবং চমৎকার কাজ করে। না, ক্যাফেতে দেখা হওয়া লোকটা আশপাশে নেই। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

ইসলামাবাদের অভিজাত হোটেলগুলোর আশপাশে অনেক আইএসআই ঘুরঘুর করে। গণমাধ্যমের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তারা ব্যাপক সন্দিহান। আমি নিশ্চিত, হোটেলের রেস্তোরাঁর এক বেয়ারা তলে তলে আইএসআইয়ের গোয়েন্দা। চোখের চাহনিটা কেমন যেন সন্দেহজনক। কোনো একটা কাজ করতে বললেই কেমন অখুশি হয় আর হতভম্ব দেখায় ওকে।

যাওয়ার পথে আফগান দূতাবাস পড়ে। বাইরের রাস্তায় অনেক টিভি ভ্যান, সাংবাদিকদের ভিড়। একটা সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে নিশ্চয়ই। অন্দরে প্রবেশ করেই দেখি তালেবান মুখপাত্র বাইরের উঠানে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করছেন। সবাই নিচে বসে আছে। ক্যামেরাগুলো উঁচু-নিচু মাঠে সতর্কভাবে দাঁড় করানো।

সিএনএনের প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ক্রিস্টিয়ান আমনপুর খুব জোরে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন। অন্যরাও মাঝেমধ্যে মোল্লা আব্দুস সালাম জায়িফকে প্রশ্ন করছিলেন। তাঁদের কীর্তিকলাপ দেখে মনে হচ্ছিল, সবাইকে দ্রুত ডাক্তার দেখানো উচিত। আমি উঠানের ডান দিকে সুসুমু বারির পাশে এসে দাঁড়াই। জাপানি দৈনিক *ইয়োমিউরি শিমবুন*-এর স্থানীয় প্রতিনিধি সে। আমরা একই সঙ্গে আফগানিস্তানের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম।

ঠিক ওই মুহূর্তে এক থুত্থুড়ে বুড়ো লোক গাছের মগডাল থেকে ধড়াম করে একজনের মাথার ওপর পড়ে যায়। ব্যাটা এক মগডালে অসতর্কভাবে বসে ছিল। সবাই এক লহমায় ওদিকে ঘুরে তাকায়। হতভম্ব ওই সাংবাদিক উঠে বসে পায়ে হাত বোলাচ্ছিল। আমি চুপ থাকতে পারলাম না। যুদ্ধের প্রথম আহত ব্যক্তি, একটা চাপা হাসির রোল উঠল। লম্বা দাড়িবিশিষ্ট ও বিশাল পাগড়ি পরিহিত কয়েকজন কর্মকর্তা আমার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। আশ্চর্য এরা কোনটা কৌতুক, তা-ও বোঝে না।

সংবাদ সম্মেলনটা ছিল খুব অদ্ভুত ধরনের। কথার মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত উচ্চারিত হলো। ৪০টা দেশ থেকে সাংবাদিকেরা হাজির হয়েছিলেন এই সম্মেলনে।

উপস্থাপনা, বিষয় এবং বক্তব্য–সবকিছুই ছিল কেমন অর্থহীন। আমার এদের জন্য করুণা হলো। গণমাধ্যমের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, এ

বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। আমরা হতে পারতাম তাদের অবস্থান বিশ্ববাসীকে জানানোর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু তারা জানে না কীভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। ডেভিড তখন পেশোয়ারে খবরের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই আমিই *এক্সপ্রেস*-এর বিদেশ প্রতিনিধি গ্যাব্রিয়েল মিলান্ডের কাছে কিছু তথ্য পাঠিয়ে দিই।

দিনটা খুব একটা মন্দ যায়নি। হোটেলে ফেরত এসে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বললাম। তারা বেশ ভালোই আছে। ইসলামাবাদ মদমুক্ত এলাকা, এটা জানার পর থেকে মা অনেকটা নির্ভার হয়ে যান। আমার মদ্যপান তাঁর দুই চোখের বিষ। ছোট বোন ভিভ যখন মায়ের কাছে কূটনামি করে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শ্যাম্পেন খাই, তখন মা প্রচণ্ডভাবে রেগে যান। তাঁর কাছে মদ্যপান ভীষণ ক্ষতিকর এবং শুধুই অর্থের অপচয়। বাড়ি গেলে আমি সবাইকে বলে বেড়াই যে বেটি ফোর্ড ক্লিনিক থেকে ঘুরে এসেছি। মদ্যপান নয়, ধূমপান নয়। সবুজ শাকসবজি খাও। প্রচুর ফলমূল খাও, এতে প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেল আছে, এইসব হাবিজাবি।

মা পাশার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমাকে দেখেশুনে রাখছে বলে তাকে ধন্যবাদ জানাতে চান। পাশার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হবে কি না, মা জানতে চান। কী বিরক্তিকর মহিলা? কে জানে, জন সিম্পসন ও কেট অ্যাডিকেও মনে হয় উনি এমন যন্ত্রণা দিচ্ছেন।

মা আমার পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তেমন কিছুই ভাবিনি বলে জানাই। সম্ভবত একটা নিশ্চিন্ত সপ্তাহ কেটে যাবে। কিছু না কিছু করার মতো পেয়ে যাব বলে মাকে আশ্বস্ত করি। বাপরে, আফগানিস্তান যাওয়ার দুর্দান্ত সাহসে তিনবার ভিসার আবেদন করেছি, কস্মিনকালেও এটা মাকে জানানোর মতো সাহস আমার নেই। অন্য দুটো গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কেও জানাতে পারি না।

মায়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সুদূর ম্যানচেস্টারে মা টেনশনে ভুগছেন আঁচ করতে পারি। অনুযোগের সুরে বলতেই থাকেন, 'দেখ মা, আর যা-ই করিস, তুই কাশ্মিরের দিকে পা বাড়াসনে, ওখানে তোকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে আমরা কেউ আর তোর মুখ থেকে দেখতে পাব না। তোর একটা মেয়ে আছে। ওই হতভাগিনীরও একজন মায়ের দরকার আছে।' ঠিক মোক্ষম জায়গায় মা হাত দিয়েছেন। এই একটি বিষয়েই

আমার মা বা অন্য কারও কাছে মিথ্যা বলার সাহস নেই। তাই নীরবতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়।

আমি যে ইসলামাবাদে জীবন হাতে নিয়ে ঘুরছি, তা ডেইজিকে এখনো বলার সাহস করে উঠতে পারিনি। আমাকে বিপৎসংকুল নিউ ইয়র্কে যেতে হচ্ছে না, এটা জেনেই ও খুশি ছিল। প্রতিদিন রাতেই ফোনে ওকে বলতে হয় আমি বিছানায় শুয়ে টেলিভিশন দেখছি। ছোট মেয়ে দেখে হয়তো এখনো সন্দেহ করতে পারেনি।

আমার ভয় বেড়েই চলছিল, কারণ আজ হোক কাল হোক, ওকে আমার বলতেই হবে যে আমি ইসলামাবাদে আছি। কারণ, পরের শুক্রবারে স্কুল ছুটি হলেই ওর সঙ্গে একত্রে ছুটি কাটানোর কথা।

বাড়ি এলে বাগানে গাছের পরিচর্যা করা ওর সবচেয়ে আনন্দের কাজ। উঠানে দাদার হাত ধরে ছোটাছুটি কিংবা কুকুরটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ওর ছুটির দিনগুলো পেরিয়ে যায়। আমি ওই কুকুরসহ পৃথিবীর তাবৎ কুকুরকে ঘৃণা করি। যে প্রাণী যা নিজের শরীরের নিচের অংশ জিহ্বা দিয়ে চেটে আবার তার প্রভুর মুখ চাটতে পারে, ওটাকে আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়। একটা ছোট কুকুরের জন্য ডেইজি কয়েকবার আবদার করেছে বটে, তবে আমার আশা ডেইজি কুকুরের প্রতি আকর্ষণ কাটিয়ে উঠবে। বুধবার সকালে লন্ডন অফিসে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তাই বার্তা প্রতিবেদককে রাতেই একটা মেইল করতে হলো। এতে বিস্তারিতভাবে আমার পরবর্তী সপ্তাহের পরিকল্পনা উল্লেখ করতে হয়। আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাই।

হাই বস, আল-বদরের অফিসে গিয়েছিলাম। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সিএনএনের মতে, আফগানিস্তান ও কাশ্মিরে প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে। ওরা আমাকে লাহোরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও এটা খুব ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। গত দুই বছর যাবৎ ওখানে কোনো পশ্চিমা সাংবাদিক ঢুকতে পারে না। তবে আমার মনে হয়, ওদের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করা যাবে।

এরপর হিজবুল মুজাহিদিনের অফিসে যাই। এদেরও কাশ্মিরে অফিস আছে। নতুনভাবে এদের নাম সন্ত্রাসী তালিকায় উঠেছে। তবে এরা নিজেদের স্বাধীনতাযোদ্ধা বলে দাবি করে এবং কথা বলতে প্রচণ্ড আগ্রহী।

আমি ও পাশা ইতিমধ্যে একজন তরুণ মুজাহিদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছি। ও আমাদের নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে। এতে করে আমাদের সুবিধেই হবে। যদি সব ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের ইসলামাবাদে এক দিন থাকতে হবে, পরিবেশ অনুকূলে থাকলে দুই দিন।

পরে আমি ওকে আফগানিস্তান যাওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে যোগ করলাম, আদর্শ দুনিয়ায় সবকিছুই ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। তবে আমরা এখন পাকিস্তানে আছি, যেখানে তাড়াহুড়ো বা সময়সীমার চেয়েও জীবন অনেক অনিশ্চিত।

আমি দুটো বিষয়ই বেছে নিতে পারি। তবে আপনার নির্দেশই আগে মেনে চলব। ডেভিড স্মিথ এই মুহূর্তে পেশোয়ারে আছে। আজকে *এক্সপ্রেস*-এর জন্য আটটি অনুচ্ছেদে তালেবানদের সম্মেলনের ফিরিস্তি পাঠালাম। স্বেচ্ছায় সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিলাম। যতটা সম্ভব ইতিবাচক রাখার চেষ্টা করেছি। আফগান ভিসার কোনো খবর নেই। তাদের হাতে ৫০০ আবেদনপত্র জমা।

আমি শুনেছি, এক নারী *সান*ডের চিঠিপত্র বিভাগে আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করেছে। ওই নারীর যুক্তি যদি এতই সত্য হয়, তাহলে কেন এখনো মানুষ মিছিল করছে এবং গুলি খাচ্ছে।

শেষ অনুচ্ছেদে যেই নারীর কথা উল্লেখ করলাম, তিনি নাকি সম্প্রতি পাকিস্তান ভ্রমণ করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, কেউই নাকি তালেবানদের বিষয়ে মুখ খুলছে না এবং আন্দোলনকে কেউই সহজভাবে নিচ্ছে না। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে সাংবাদিকদের মনও সংবেদনশীল হয়ে থাকে। তাদেরও আবেগে আঘাত লাগে। অনেক পাঠকের ধারণা তাই কোনো সাংবাদিকের লেখনী পছন্দ না হলে তার বিরুদ্ধে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে হবে।

আমি মেইলে আরও লিখি, লন্ডনে আমার সূত্র জানিয়েছে, পোপ চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এবং ব্রিটিশ সচিব স্ট্র ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। শুক্রবারে হামলা শুরু হওয়ার আশঙ্কা ক্ষীণ। দিনটি মুসলমানদের কাছে পবিত্র দিন। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন বলেও দাবি উঠতে পারে। সবাইকে শুভাশিস জানিয়ো। ইভন।

মেইল পাঠানোর আগে টিভিতে সিএনএনের খবর দেখছিলাম। পোপ দ্বিতীয় জন পল কাজাখস্তান সফরে আছেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। ৮১ বছরের অশীতিপর এই ধর্মগুরু বলেছেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি প্রার্থনা করি, যেন পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাকে। যা ঘটেছে তার জন্য কিছুতেই যেন বিভেদ বৃদ্ধি না পায়, সে লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম কখনোই সংঘর্ষের অজুহাত হতে পারে না।

একজন জ্ঞানী মানুষের কাছ থেকে খুব হিতকর দামি কথা শুনেছে বিশ্ববাসী। কিন্তু হোয়াইট হাউস বা ডাউনিং স্ট্রিটের অধিবাসীরা এসব কথায় কান দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। যদিও আস্তানার কেন্দ্রীয় মাতৃসংঘ অথবা স্বদেশ চত্বরে বসে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, বাইরে তখনো ৫০ হাজার লোক মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনছেন।

পৃথিবীর অন্যতম একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাজাখস্তান থেকে ভাষণ দেওয়ার দৃশ্যটা ছিল এক পবিত্র মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কাজাখস্তানে এসে ইউরোপের সঙ্গে এশিয়া মিশে গেছে। আর খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে ইসলাম ধর্মের। দেশটা আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ। বিন লাদেনের দেশের পাশেই। পোপ যখন শান্তির জন্য প্রার্থনায় রত, তখন পশ্চিমা শক্তিরা যুদ্ধংদেহী মনোভাবে অস্ত্রভান্ডার মোতায়েন করছে।

পরে যখন জিমের সঙ্গে কথা হয়, ও আমাকে অফিসের বৈঠকের পরিস্থিতি জানায়। আমার পরিকল্পনা শোনার পর বৈঠকে উপস্থিত লোকজন কয়েকবার ঢোঁক গেলে ও অনেক্ষণ কেউ কোনো কথাই বলেনি। জবাবে আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে জানিয়ে দিই, হয় এই দুটি পরিকল্পনার কোনো একটি বাস্তবায়ন করব অথবা আয়েশি ভঙ্গিতে শুয়ে-বসে কাটাব, যত দিন না বোমা হামলা শুরু হচ্ছে। এরপর ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত কিছুই করার থাকবে না।

জিমকে জানাই, আমাকে বসিয়ে রাখতে ও সন্তুষ্ট থাকতে পারলেও আমার পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। এখানে বসে বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে পাগল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা শতভাগ। এভাবে সারা দিন বসে আরাম করা পুরোনো দিনের কাহিনি। তবে চাইলে জাতিসংঘ ক্লাবে বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলতে পারি।

জিমকে আরও সময় নিয়ে ভাবতে বললাম। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে এখনো দুই দিন সময় আছে। আগামী রাতেই রওনা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। ও সম্পাদক মার্টিন টাউনসেন্ডের সঙ্গে কথা বলতে আরও সময় চায়। আমি দোয়া করতে থাকি, ওরা যেন আমাকে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত না নেয়।

সেদিন রাতে জাতিসংঘের ক্লাবে গিয়ে দুই পেগ মদে গলা ভেজানোর ইচ্ছা করছিল বটে, তবে কারও সঙ্গে কথা বলতে মন টানছিল না। তার চেয়ে বরং যে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য এত লম্ফঝম্ফ করছি, সেটা নিয়ে একটু ভাবা যাক। এই অভিযানটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ। তবে প্রতিটি জিনিসই ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তা পার হতে গেলে ঝুঁকি থাকে, একটা অচেনা ট্যাক্সি ক্যাবেও সাবধানে উঠতে হয়। এমনকি ১১ তারিখের পর থেকে অনেক মানুষই বুঝে গেছে স্বাভাবিক জীবনেরও নিশ্চয়তা কতটুকু। মনে রাখতে হবে, যে প্রতিবেদন তৈরিতে কোনো ঝুঁকি নিতে হয় না, সে প্রতিবেদন কখনোই হৃদয়স্পর্শী বা জনপ্রিয় হয় না।

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। আরে আমার অনেক প্রিয় বন্ধু জুলিয়া হার্টলে ব্রেওয়ার। ও *গার্ডিয়ান*-এর রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ও আমার প্রতি অনেক যত্নবান, প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। এখন বোধ হয় বার্নারমাউথে হোটেল হাইক্লিফে বসে ঢকঢক করে শ্যাম্পেন গিলছে। ওখানে লিব ডেমের সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহে অনেক বিখ্যাত অখ্যাত মানুষের সঙ্গে আনন্দ করছে।

কথা বলার একপর্যায়ে আমাদের বন্ধুসুলভ দুষ্টুমি শুরু হয়ে যায়। বান্ধবী আমাকে খোঁচা মেরে কোন গোপন মিশনের ফন্দি আঁটছি, তা জানতে চায়। এই বিদেশে বসে ভালো কিছু পান করতে পারছি না বলে ওর দুঃখের শেষ নেই। তাই আমার হয়ে ও একাই আজ সব গিলে নেবে। আমাদের মধ্যে মেয়েলি গল্প জমে উঠতে সময় লাগে না। এখানকার পুরুষদের সম্পর্কে জানতে চাইলে একরাশ হতাশা প্রকাশ করলাম। হোটেল এলাকায় সুদর্শন পুরুষের কদাচিৎ দেখা মেলে বলে ওকে জানাই। বারবার দরজায় টোকা দেওয়া বেয়ারার কাছ থেকে কীভাবে পুরোনো কৌশল ব্যবহার করে রেহাই পেয়েছি, তা-ও জানাতে বাকি থাকে না। আবার কথা হবে বলে জুলিয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

ফোনটাকে বিশ্রামে দেওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই পরিচিত রিংটোনটা আবার বেজে উঠল। মুঠোফোনের পর্দায় টিম শিপম্যানের নাম ভেসে ওঠে। রাজনৈতিক প্রতিবেদক। নিশ্চয় কোনো পার্টিতে আছে। ওদের কাজই হলো বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে অসংলগ্ন মুহূর্তে গোপন খবরে ছোঁ মারা। ফোনটা ধরেই ওর বসের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে বলে জানাই। জুলিয়া যেকোনো পানশালায় শ্যাম্পেনের ঝরনার মধ্যে বসে আছে, তা-ও বলে দিই। অন্যদিকে আমি এমন দেশে আছি, যেখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ। কী বিচিত্র এই জীবন!

শিপম্যানকে ওর সহকর্মীরা শিপার বলে ডাকে। জুলিয়ার সঙ্গে এখন ও একই জায়গায় আনন্দ করছে। জুলিয়ার মুখে আমার পরিকল্পনার কথা শুনেছে ও। আমার মাথায় বড়সড় গন্ডগোল আছে বলে ওর ধারণা। দুঃসাহসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শুভকামনা জানায়।

এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু যেন থেমে গেল। আমি আর আমার পরিচিত সহকর্মীরা দুটি ভিন্ন জায়গায় কাজ করছি। এ বছর লেবার পার্টির সম্মেলনে আর যাওয়া হবে না। এসব সম্মেলনে কত রথী-মহারথীর সঙ্গে দেখা হয়। পরিচয় ঘটে নতুন কারও সঙ্গে। সুরার পেয়ালা হাতে প্রাণভরে আড্ডা দেওয়া সম্ভব।

ইচ্ছে করছে দুদণ্ড জাতিসংঘ ক্লাব থেকে ঘুরে আসি। না, এটা করা যাবে না। মনকে কঠোরভাবে বারণ করি। মাথায় বিশাল কাজের ঝক্কি বইতে হবে। ঠান্ডা মাথায় সব পরিকল্পনা শেষ করতে না পারলে সব ভেস্তে যেতে পারে। সম্ভাবনার পাল্লা তখনো আফগানিস্তানের দিকে দুলছিল। কী কী করতে হবে, তার একটা তালিকা বানাই। আমার এক পুরোনো বন্ধু ইশার অক্সফোর্ডের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিলাম। মেয়েটা একটা বই লিখতে ইসলামাবাদে এসে থাকছে। এক সরকারি কার্যালয়ে ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় আচমকা। পরে আমরা দুজন পুরোনো পাপী একসঙ্গে খাবার খাই।

মনের সংকল্পের বৈঠা নড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় ইশারের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকি। পায়চারি করতে করতে ফ্রিজ থেকে এক বোতল পানি বের করি। জীবনে এমন সময় আসবে, যেদিন পানশালায় গিয়ে ঠান্ডা পানির বোতল হাতে নিয়ে সময় কাটাতে হবে, তা কোনো দিন

কল্পনাও করিনি। সকালবেলার মাথাধরা আর শরীরের ধকল কাটাতে অবশ্য এক গ্লাস ঠান্ডা পানিই যথেষ্ট।

আমার মন আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকাতেই ঘুরঘুর করতে লাগল। হিসাব মেলাই– ওখানে যাওয়া আসলে কতটুকু বিপজ্জনক। সব দিক বিবেচনায় এনে আফগানিস্তানের সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। আচ্ছা, আমার অবস্থানে থাকলে অন্য যে কেউ কী করত? রণাঙ্গনের প্রতিবেদক ম্যারি কলভিনের কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। এরূপ অবস্থায় ও সত্যিই আমার মতোই চিন্তাভাবনা করত। যুদ্ধের মাঠ থেকে সরাসরি প্রতিবেদন পাঠানোর দুঃসাহসের জন্য ও সব সাংবাদিকের জন্য প্রেরণাদায়ী। মেয়েটার লেখার হাতও বুলেটের মতোই লক্ষ্যভেদী ও সুচালো। পরিচিত সহকর্মীরা ম্যারিকে একরকম সমীহ করে চলে।

*সানডে টাইমস*-এ কাজ করতে গিয়ে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বিখ্যাত দুর্গ ওয়াপিংয়ে বসে *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*, *সান* ও *দ্য টাইমস*-এর হয়ে অসাধারণ কিছু কাজ করায় সবাই ওকে চিনতে শুরু করে। সে সময় প্রায়ই আমরা একত্রে গল্প করতাম। বিখ্যাত মিডিয়া মোঘল রুপার্ট মারডকের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এগুলো। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যুদ্ধ নিয়ে ম্যারির প্রতিবেদন পড়তে পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ও সম্প্রতি বলেছিল, যুদ্ধ প্রতিবেদকের কখনো ক্লান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আজকে ওর কথাটাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে হলো।

২০০১ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কায় এক যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যারি আহত হয়। তখন ওর নাম প্রথম আলোচনায় আসে। সে সময় শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনী ও তামিল টাইগার্সের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। সরকারপক্ষ দাবি করে, বিদ্রোহীদের সীমান্ত ভানুভিনা অতিক্রমের সময় তামিল যোদ্ধারা ওকে গুলি করে বসে। অন্যদিকে তামিলরা এ জন্য সরকারি বাহিনীকে দায়ী করে। তবে তামিলরা সত্য বলছিল। ওর মাথা, বুকে ও হাতে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়। ওর আঘাত গুরুতর নয়, এটা জানার আগে আমরা বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তবে এই ঘটনায় ওর বাম চোখ চিরতরে অন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কান কর্তৃপক্ষ পরে দাবি করে, ম্যারির সংবাদ সংগ্রহের অনুমতি থাকলেও ও বিদ্রোহীদের অধিকৃত এলাকায় যাওয়ার আগে অনুমতি নেয়নি।

যা-ই হোক, তালেবান দূতাবাসে এসে আমি বুঝে যাই, প্রতিকূল সময়ে সংবাদ প্রতিনিধিরা সহসাই সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি পান না।

ম্যারি অবশ্য পরে তার ওই এলাকা পরিদর্শনের পেছনে যুক্তি তুলে ধরে। সে বলে, এসব এলাকায় মানুষের দুর্ভোগের শেষ ছিল না। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল, বিদ্যুৎ নেই, জ্বালানি নেই, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন, অথচ এই দুর্যোগ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কেউ অবগত ছিল না। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ছিল না বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির সরবরাহ।

অনেকের মতে, ম্যারির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা না হলে বিশ্ববাসীর কাছে তামিলদের দুরবস্থার কথা অজানাই রয়ে যেত। ওর সাহসী প্রতিবেদনের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে বাহবা পেলেও আড়ালে অনেকেই ম্যারিকে গণ্ডমূর্খ বলে ডেকেছে। সাংবাদিকদের মধ্যেও বদলোক ঘাপটি মেরে থাকে। এরা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, পেছন থেকে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারতেই এরা বেশি পটু।

দুঃসাহসী পেশাদার নারীরা আমাকে সব সময় প্রেরণা জোগায়। মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণে নারী পেশাজীবীদের সাহসিকতা আমাকেও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ডেইজি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। চলার পথের বহ্নিশিখা। অথচ ওর পেটে আসার খবর শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যর্থতার মাধ্যমে ডেইজির জন্ম। এমনকি আমি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছিলাম প্রায়।

ডেইজি গর্ভে আসার পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে ভয় পেয়ে যাই। গলা কেটে ফেললেও আমার পক্ষে বাচ্চার মা হওয়া সম্ভব নয়। এ কথায় আমার এই ৩৩ বছরের বার্ধক্যে পুনরায় গর্ভধারণ সম্ভব না-ও হতে পারে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাকে সতর্ক করে দেন।

চমৎকার, সব ঠিকঠাক চলছে। চিকিৎসকের সঙ্গে আবার সোমবার দেখা করব বলে বেরিয়ে এলাম। ওই সপ্তাহেই আমাকে থমসন আঞ্চলিক সংবাদ কেন্দ্রে নারী নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত এক প্রশিক্ষণে যেতে হয়। নারী নির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার সুলুকসন্ধান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ছিল এই প্রশিক্ষণের মূল উপপাদ্য।

তখন আমি *সানডে সান*-এর সহকারী সম্পাদক। তার আগে থমসনের প্রথম নারী সংবাদ প্রতিবেদক হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। আমি প্রধান প্রতিবেদক হলেও সেখানে প্রচুর নারী সহকর্মী ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। কঠোর পরিশ্রমী ও সৎ নারী কর্মীরা সর্বদাই আমাকে উৎসাহ জোগান এবং থমসনে তাঁদের অভাব ছিল না।

সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলি। গর্ভে একটি নতুন প্রাণ কক্ষনোই কর্মজীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এক সহকর্মী তাঁর মায়ের গল্পও আমাকে বলে বসেন। ভদ্রমহিলার মা দুরারোগ্য ভুলে যাওয়া রোগ আলঝেইমার্সে ভুগছিলেন। তিনি জানান, মাঝেমধ্যেই দিনের বেলায় অফিসে বসে তাঁকে ফোন ধরতে হয়। কারণ, তাঁর মা হয়তো রাতের পোশাক পরে ভুলোমনে তখন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

থমসনের আরেক সহকর্মী মরিনেরা ছিল দুই যমজ বোন। মেয়েটা তখন সদ্য তালাকপ্রাপ্তা। এই মেয়েটার সঙ্গেও কথা বলি। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেন বোধ হয় *এডিনবার্গ নিউজ*-এর সহকারী সম্পাদক হেলেন মার্টিন।

হেলেনের ফ্লিট স্ট্রিটের এক সাংবাদিক সহকর্মীর সঙ্গেই বিয়ে হয়। এক সন্তানের মালিক হওয়ার পরই হেলেন জানতে পারেন, তাঁর স্বামী এক বছর ধরে পরকীয়া করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আলাদা হয়ে ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে গ্লাসগোতে চলে যান। সেখানে তিনি মায়ের সঙ্গে থাকা শুরু করেন। চলে যাওয়ার সময় তার পকেটে ছিল মাত্র ৭০০ পাউন্ড। একদম নতুন থেকেই তাঁকে পুনরায় শুরু করতে হয়। বেঁচে থাকার সংগ্রাম হেলেন আবার প্রথম থেকে শুরু করেন। ভাত-কাপড়ের অর্থ, বাচ্চার জন্য একজন পরিচারিকার বেতন ও বাড়িভাড়া মেটাতে হেলেন নতুন চাকরি শুরু করেন। সব ব্যবস্থাপনা করতে কষ্ট হলেও তিনি সফল হয়ে ওঠেন। তাঁর সংগ্রামের কাহিনি বলার ধরন মনে তখন দুর্দান্ত সাহস জুগিয়েছিল।

দুই দিন এত সব বৈঠক শেষে রোববার দিন রাতে নিউক্যাসলে বাড়ি ফিরছিলাম। যাত্রাপথে বসেই যা-ই ঘটুক না কেন, সন্তানের মা হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জনের সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলি। পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মা হতে না পারলেও আমার কিছু যায় আসে না।

পরদিন রাতে আমি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই সাহসী সিদ্ধান্ত একসময় সঠিক বলে প্রতীয়মান হবে এবং আমাকে প্রেরণা জোগাবে। রোগীদের কাছ থেকে তিনি এ রকম কথাই বেশি শুনতে চান বলে জানান। হ্যাঁ, তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

আমার ফ্ল্যাটের সাথি ক্যারল আমাকে জড়িয়ে ধরে। কোনো রকম বিজ্ঞ উপদেশ বা চিন্তাভাবনা না করেই সে দারুণ উৎফুল্ল হয়। ও বলেছিল, এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি কখনোই হতাশ হব না।

আমি দাউদকে ফোন করে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালে ও গর্ভধারণের ভূত মাথায় চাপানোর পর ওর সঙ্গে একরকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বেচারা করুণ বিপদে পড়ে। এমনকি সাইপ্রাসে অবস্থিত ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘের অফিস থেকে ইরাক অথবা লিবিয়ার অফিসে বদলি হওয়ারও আবেদন করে বসে। বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থেকে ও দুঃখ ভুলে যেতে চেয়েছিল।

১৯৯১ সালের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে দাউদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সেদিন আমি ইভান মরিসনের সাক্ষাৎকার নিতে নিকোসিয়াতে ছিলাম। অন্য দুজন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংঘের সন্ত্রাসীর সঙ্গে তাকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আশির দশকে সাগরে ভাসমান এক জাহাজে তিনজন মোসাদ এজেন্টকে হত্যার দায়ে তাদের এই শাস্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে লারাঙ্কা হত্যা নামে পরিচিত।

ইভানের সঙ্গে আমি তিন বছর চিঠি চালাচালি করি। অবশেষে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়। দুই সপ্তাহের জন্য আমি নিকোশিয়া চলে যাই। তখন *সানডে সান* কর্তৃপক্ষের সব খরচ বহন করার সামর্থ্য ছিল না। তাই আমাকে অর্ধেক রাহা খরচ মেটাতে হয়।

তখন জিমের সঙ্গে ডিভোর্সের প্রক্রিয়া চলমান ছিল। কিন্তু আমার পাসপোর্টের নামের শেষে জিমের পদবি ম্যাকিন্টোশ উল্লেখ করা ছিল। ক্রেডিট কার্ডে আমার নাম ছিল রিডলি। সাইপ্রাসের দক্ষিণে পাহোস নামক জায়গায় নতুন আরেকটি নাম ব্যবহার করে আমি বাসা ভাড়া করি।

সাইপ্রাস নামার পর দেখি একটি মাত্র ভাড়া গাড়ি পার্ক করা। আমার সঙ্গে বসে আরও দুজন ব্রিটিশ লোক সাইপ্রাস আসেন। তাঁদের যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় একরকম বিরক্তি নিয়েই আমি তাঁদের আমার

গাড়িতে উঠতে আহ্বান জানাই। গন্তব্যে যেতে যেতে আমরা ভালো বন্ধুতে পরিণত হই। তাঁরা ছিলেন উত্তর-পূর্ব লিঙ্কনশায়ারের গ্রিম্বসির বাসিন্দা। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। সাইপ্রাসের উত্তর অঞ্চলে মাছ ব্যবসার সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছিলেন।

আমি রাতে তাঁদের আমার বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানাই। বাড়িটা ছিল বেশ বড়, তিন কক্ষবিশিষ্ট। পরিদন ওরা আমাকে তুরস্ক এলাকার দিকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে আমি তাদের সঙ্গে গ্রামে দেখা করব বলে জানাই। এরপরই আমাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে জেলখানায় ছুটতে হয়, যেখানে ইভান বন্দী ছিলেন।

পরে রাজধানীর বাইরে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘের কনস্যুলার অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিই। উল্লেখ করি, আমি ব্রিটিশ নাগরিক ও *সানডে সান*-এর একজন সাংবাদিক। ইভান ডেভিসনের ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য জানতে চাইলে তাঁরা পরদিন আবার দেখা করতে বলেন।

এরপর সীমান্ত অতিক্রম করতে তুরস্কের অঞ্চলে চলে যাই। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। সীমান্তের পুলিশফাঁড়িতে অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়াতে নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখি। পেশাগত কাজের ঘরে তাই নিজেকে চুল পরিচর্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করি।

কাইরেনিয়াতে সেদিন গ্রিম্বসির বাসিন্দা দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। বেশ আড্ডা দিই, ওয়াইন গেলি ও সুস্বাদু কাবাব খেতে খেতে সুন্দর বিকেলটা কেটে যায়। পরে কাছের এক পর্যটন অফিসে গিয়ে সেখানকার এক নারী কর্মীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পর মেয়েটার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। ও আমাকে পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতে চায়। বৃহস্পতিবার স্বয়ং মন্ত্রীই আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সীমান্তে গাড়ি পাঠাবেন। এটা ছিল এক চমৎকার সুযোগ। তাই আমিও এতে রাজি হয়ে যাই এবং পুনরায় সেখানে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিই।

পরদিন ইভানের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এর পরের দুই সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই ইভানের সঙ্গে দেখা করি ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করি। এর মাঝে এপিস্কোপি ও আক্রোতিরিতে ব্রিটিশ ঘাঁটিতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর কর্মরত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়।

ফিরে আসার কয়েক দিন আগে আবার ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘের অফিসে গিয়ে এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমাকে এক বেলা দুপুরে নিমন্ত্রণ জানালে আমরা সেখানকার বিখ্যাত ক্রদুস পর্বতমালায় আরোহণ করি। এখানে বিখ্যাত আঞ্চলিক খাবার মেজে পাওয়া যায়।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষে ফিরে আসার সময় এক সবুজ চত্বরে গাড়ি থামিয়ে খানিক সময় পায়চারি করি। স্বীকার করি, তখন আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। খোলা মাঠে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের খোসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আমরা ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলতে থাকলেও মনে মনে একটা বড় লাঠি খুঁজছিলাম। আমার কাছে আসার চেষ্টা করলেই যেন মাথায় বাড়ি দিতে পারি। ভয় পাচ্ছিলাম, এই লোক কি আমাকে বন্দী করবে?

যা-ই হোক, কিছুই ঘটল না। আমরা গাড়িতে করে ফিরে আসি। পরে আমি জানতে পারি, এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন গোয়েন্দা। গণমাধ্যমের মুখপাত্র বা এ ধরনের কিছু নয়। আমাকে মোসাদের গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ করে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘ। আমার দুপুরবেলার খাবারের সঙ্গী আমার বিরুদ্ধে একটি গোপন নথি পাঠান। নথিটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য ছিল। কারণ, যাওয়ার দিন থেকেই তারা আমাকে অনুসরণ করত। গোপন নথিতে উল্লেখ ছিল, ইভন রিডলি ছদ্মনাম ইভন এ্যানি ম্যাকিন্টোশ ব্যবহার করে এখানে এসেছেন। তাঁর ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে দুজন পুরুষসঙ্গী নিয়ে আরেকটি নাম ব্যবহার করে উঠেছেন। তিনি তুরস্কের অঞ্চলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং আসার পর বেশ সহজেই সেখানে চলাফেরা করেছেন। চার দিন পর গোমড়ামুখো এক চালক সরকারি এক লিমুজিনে করে তাঁকে কোথাও নিয়ে যায়। এ সময় তিনি দ্বিতীয়বারের মতো তুরস্কের অঞ্চলে যান। ব্রিটিশ সার্বভৌম ঘাঁটিতে ঢুকতে ও বেরোতে তিনি একটি অফিশিয়াল পরিচয়পত্র ব্যবহার করেছেন। লন্ডনের *সান* অফিসে ফোন করে জানা গেছে, তিনি সেখানে কাজ করেন না। ভদ্রমহিলা একটা বিশেষ উচ্চারণে কথা বললেও মাঝেমধ্যে তা গোপন করেন। অন্য নারীদের মতো তাঁর মধ্যে ভয়-ডরের পরিমাণ কম। নির্জন চত্বরে হাঁটার সময় তিনি মুখে বেশ একটা শান্ত ভাব ফুটিয়ে রেখেছিলেন।

অবশ্যই এই প্রতিবেদনের প্রতিটি বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা ছিল, তবে এটা জানার পর আমার হাসি পায়। আমার ভ্রমণের পেছনে বিশেষ কোনো

উদ্দেশ্যই ছিল না। মানুষ ভাবে, ইংল্যান্ডের মহামান্য রানির সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ব্যাপার।

তারা নিশ্চয় কখনোই আঞ্চলিক ইংরেজি উচ্চারণের কারও সঙ্গে কথা বলেনি এবং ভেবেছিল আমি ইসরায়েলের নাগরিক।

এই প্রতিবেদন গোয়েন্দা প্রধান দাউদ জারোরার কাছে পাঠালে তিনি খালিদকে আমার সঙ্গে একটা বৈঠকের আয়োজন করতে নির্দেশ দেন। একটা ভাগ্যনির্ধারণী সিদ্ধান্ত। প্রথম দিন দাউদকে চোখে দেখার পরই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। বৈঠকটা যেন বিদ্যুৎ গতিতে শেষ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে ফিলিস্তিনি গোয়েন্দা সংস্থার অর্ধেক লোক আমার পিছু নিয়েছে এবং আমার আসল পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করছে।

বাকি সময়টাতে আমি দিনের বেলা ইভানের সাক্ষাৎকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম এবং রাতে সময়টা দাউদের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিতাম। তিনি ছিলেন একজন নিপাট ভদ্রলোক। তিনি নিজেকে একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে দাবি করেন এবং অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমি কিংবদন্তি আবুল হাকিমের পাশে ঘুরছি। তিনি ছিলেন দক্ষিণ লেবাননে ফাতাহ ভূমির একজন ডাকসাইটে কমান্ডার। এখনো অনেক ফিলিস্তিনি তাঁকে নায়ক হিসেবে মানেন। লেবাননের দক্ষিণ-পূর্বে ১৯৭০ সাল থেকে আট বছর ফাতাহ ভূমির অস্তিত্ব ছিল এবং ইয়াসির আরাফাতের ফাতাহ পার্টি এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে।

নিউক্যাসলে ফিরে এসে আমি একটা অসাধারণ প্রতিবেদন তৈরি করি। সদ্য যোগ দেওয়া যুগ্ম সম্পাদক টনি ক্রস আমার কাজে মুগ্ধ হয়ে তা টেলিভিশনে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। সাংবাদিক হিসেবে এটা ছিল এক বিরাট সফলতা এবং সবাই আমাকে অভিনন্দন জানায়। অফিসের অদূরে একটা পানশালায় গিয়ে সহকর্মীদের নিয়ে হালকা কিছু পান করে সফলতা উদ্‌যাপন করি।

চলে আসার পরও দাউদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কয়েক মাস পরে ও নিউক্যাসলে আমার বাড়ি বেড়াতে আসে। আমি তাকে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্টিন শিপটনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। পরে

তাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। মার্টিন তখন নর্দার্ন ইকোর হয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে বেড়াত।

সে সময় দাউদ বোমাটা ফাটায়। নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য আমার কাছে খুলে বলে। তত দিনে আমি আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছি। দাউদের গোয়েন্দাগিরির জন্য এখানে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। তবে আমি দেখতে চেয়েছিলাম সম্পর্কটা কত দূর গড়ায়। তাই আমার সিনিয়রদের কিছু না জানানোর সিদ্ধান্ত নিই।

পরের বছর আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি এবং সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত সামরিক অনুশীলনে অংশ নিই। স্থানীয় বালকদের নিয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন করি। সে সময় ফকল্যান্ডের আবাসিক পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা দিতে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর একটা দল ছয় মাসের জন্য সেখানে যাচ্ছিল। প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। ফলে এই খবরটার গুরুত্ব বেড়ে যায়।

আমি নিজেও একটি দলের প্রধান ছিলাম। তাই কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেনাছাউনি থেকে বেরোনোর সুযোগ ছিল। নিকোশিয়ার বাইরে দাউদের আবাসস্থলে প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। এক রাতে আমি ব্রিটিশ সেনার পোশাক পরে দাউদের বাসায় বিশ্রাম করছিলাম। তখনই খালিদ ওর বসের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ফোন করে। আমাকে গেরিলা র‍্যাম্বোর সাজে দেখে খালিদ একরকম ভড়কে যায়। ওর মুখের ভঙ্গিটা ছিল দেখার মতো।

পরে খালিদ দাউদের প্রাক্তন লেবানিজ স্ত্রীকে আমার খবরটা জানিয়ে দেয়। ধারণা করি, ওই ভদ্রমহিলা ইয়াসির আরাফাতকে জানান, দাউদ মোসাদের একজন এজেন্ট ও ব্রিটিশ গোয়েন্দার খপ্পরে পড়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংঘে তখন আমাকে নিয়ে জল অনেক দূর ঘোলা হয়েছে। তাই আমার নির্দেশদাতা অফিসার কর্নেল ডেভিড ম্যাকিনকে আমার ব্যাপারে সব জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি ছিলেন একজন অসম্ভব ভালো মানুষ।

সাইপ্রাস থেকে ফিরে এসে আমি কর্নেল ডেভিডের সঙ্গে দেখা করে আমার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদটা জানাই। তিনি বিষয়টা বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তত দিনে সিঙ্গেল মায়েদের ব্যাপারে সহনশীল হয়ে গিয়েছে। তবে স্বভাবসুলভ কৌতূহলে তিনি ভ্রু

কুঁচকে আমার গর্ভের সন্তানের পিতার নাম জানতে চাইলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সেনাবাহিনীর কোনো কর্মকর্তা হবে হয়তো।

আমি না-বোধক উত্তর দিই। এ-ও বলি, কিছু সমস্যা হতে পারে। কারণ, তিনি একজন সেনা কর্মকর্তা, তবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত নন।

কর্নেল সাহেব টেবিলের দিকে উদ্বিগ্নভাবে ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথাকার সেনাবাহিনী?

একটা লম্বা দম নিই। তাঁকে বলি, আমার অনাগত সন্তানের পিতা একজন ফিলিস্তিনি সেনা ও তাদের গোয়েন্দা দলের প্রধান।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে আলোচনার দড়ি ধরে টান দিলেন। নিষেধ করে দেন, এ বিষয়ে যাতে অন্য কারও সঙ্গে কথা না বলি। বিষয়টা আমার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে কি না, এ ব্যাপারে খোঁজখবর করবেন বলে জানান।

বুঝতে পারি একটা কিছু ঝামেলা হবে। তবে সেনাবাহিনীর কোনো অধীন কর্মকর্তার সঙ্গে রোমান্স করে বেড়াচ্ছি না, এটা জেনে তাঁকে অনেক ভারমুক্ত মনে হলো।

আমার জন্য এটা বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমন সময়ে ফিলিস্তিন সংঘের প্রধান কার্যালয়ে দাউদের ডাক পড়ে। এটা তখন তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে দেওয়ার কারণ নেই বলে দাউদ যেতে অস্বীকৃতি জানায়।

তার বেতন কাটা পড়ে। তার অফিসের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আরাফাত ও দাউদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক অগ্নিগর্ভ যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতির। এই বয়স্ক লোক নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এদিকে তাঁর প্রিয় মানুষ দাউদ, যাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন, কোনো কথাই শুনছিল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে দাউদ বেড়াতে আসে।

তখনই জানতে পারলাম ও নিজ দলের ভেতরে কী পরিমাণ তোপের মুখে পড়েছে।

আমরা বিবাহিত ও সন্তানের মুখ দেখতে চলেছি। এই সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এখানেই বিষয়টা থামিয়ে দিয়েছে ডেভিড। পুরো ফিলিস্তিনে এই ঘটনাকে এক রোমান্টিক প্রেমকাহিনি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আমার মতো অখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ভাবতেই খুশি খুশি লাগল। অনেক দিনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক মাইকেল স্কট আমাদের বিয়ের কিছু ছবি তুলে দেয়। পরে এসব ছবি তিউনিসিয়া ও সাইপ্রাসজুড়ে প্রদর্শিত হয়।

আশ্চর্যজনক ঘটনা, এক বিখ্যাত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কীভাবে আমিসহ অনেক মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে গেল। সর্বদাই ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও ঝামেলাই আমার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকে। মনে পড়ে, একদা *সানডে টাইমস*-এর বিনোদন প্রতিবেদক নিকোলাস হেলেন বলেছিল, আমি হলাম বিখ্যাত সিনেমার চরিত্র ফরেস্ট গাম্পের সাংবাদিক প্রতিমূর্তি।

আজ ইসলামাবাদে আরেকটি দুঃসাহসী অভিযান শুরু করার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। জানি, পথটা বিপৎসংকুল তবু কেমন যেন শিহরণ লাগছে। একবার মনে হলো, বাবা-মা, নিকটাত্মীয়, ডেইজি ও কাছের বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখি। চিঠি লিখতে অনেক মানুষের নামই মনে এল, এর কোনো শেষ নেই। ভাবনাটা অবাস্তব ও নেতিবাচক। কোনো খেয়ালি আবেগপ্রবণ মনের অনুভূতি নয় সামনের দিনগুলো।

মনে হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত মার্টিন ও জিম আমার দুঃসাহসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গভীরভাবে চিন্তা করলাম, ফোনটা বন্ধ করে রাখব কি না, এতে করে আমার চাকরিও চলে যেতে পারে। তবে সামনের রহস্যঘেরা পর্বতের পেছনে কী বাস্তবতা অপেক্ষা করছে, তা দেখা থেকে কারও পক্ষেই আমাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

# বোরকার আড়ালে
# নিঃশব্দ পদযাত্রা

মধ্যরাত। আফগানিস্তানের উদ্দেশে অনিশ্চিত পথে যাত্রা শুরু করব। আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। শেষবারের মতো বাবা-মা, কয়েকজন বন্ধু ও প্রিয় ডেইজিকে ফোন করলাম। ডেইজিকে অনেক ভালোবাসি জানালে ও লাইনের অপর প্রান্ত থেকেই একটা দীর্ঘ স্নেহের চুম্বন এঁকে দেয়।

'সব সময় মনে রাখবে, আমাকে যখনই দরকার পড়বে তখনই চোখ বন্ধ করবে এবং আমি হাজির হয়ে যাব। মনে থাকবে তো মামণি? মা আমার, আজকের কথাগুলো খুব ভালো করে শোনো এবং সারা জীবন এসব কথা মনে রাখবে। শক্ত থাকার চেষ্টা করবে।'

আশ্চর্য, বালিকার কণ্ঠ ভেসে এল, 'যা-ই হোক, মাম্মি, আসছে বুধবার আমার জন্মদিন। তোমার মনে আছে তো, মা? বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, খেলতে যাই।'

এরপর নিঃশব্দে লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সারা রাত অস্থিরচিত্তে পায়চারি করলাম। এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে। যখন এমন কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কিছু ঘটে থাকে, তখনই শরীর আর ভার সইতে পারে না। চাইলেই আমি এখানে থেমে যেতে পারি। যদি একটুও মনের ভেতর খচখচানি থাকত, তাহলে আমি ফিরে আসতাম।

পরদিন সকালে নিচে গেলাম নাশতা সেরে নিতে। খাবার টেবিলে এক প্রাণবন্ত আমেরিকান চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে কথা হলো। মেয়েটা নিউ ইয়র্কের এক এজেন্সির হয়ে এশিয়ায় ছবি তোলে। মেয়েটা ছিল দুরন্ত ও মারমুখী এবং খুবই শক্ত মনের। ওকে আর ঘাঁটালাম না। কোথায় যাচ্ছি তা-ও জানালাম না। পাছে আবার আমার লেজ ধরে বসে। আগেও বলেছি, একা

কাজ করাটাই আমার বিশেষ পছন্দের। মেয়ের দুরন্ত সাহস। এখনো সে হাজার হাজার মানুষের মিছিলের ছবি তুলে বেড়াচ্ছে।

চিরাচরিত ডিমভাজা ও তরকারি দিয়ে নাশতা সেরে হোটেলের বিজনেস সেন্টারে গেলাম। কয়েক লাইনে লিখে দিলাম জিম মুরেকে।

বেশ, আমার সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন। দুঃসাহসী অভিযানের জন্য আমি পুরোপুরি তৈরি। ভালোয় ভালোয় শেষ হলে পিঠে চাপড় মেরে প্রশংসা করা হবে। নয়তো দুঃসাহস, অপরিপক্বতা ও বোকামির গালি জুটবে কপালে।

দুনিয়ার কোনো জায়গাই আর নিরাপদ নয়। নিউ ইয়র্কের হাজার হাজার অধিবাসী ১১ সেপ্টেম্বর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। যা-ই হোক, আফগানিস্তানের অন্ধকারে কোনো পশ্চিমা সাংবাদিকের আস্তানা নেই। ভেতরে কী হচ্ছে, তা আমাদের জানতে হবে। এমনকি যদি তা কেবল একটি মাত্র ছবিও হয়।

ব্যক্তিজীবনে আমি কিছুটা রক্ষণশীল ও চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক। অনেক মানুষের জীবন এখনো বিপদের সম্মুখীন। তাই এই লড়াইয়ে আমি একা নই। আমার গাইডের নাম মুসকিন। সে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাসিন্দা।

একটা প্রাচীন পরিচিত পথ ধরে চার চাকার পাহাড়ে চলার উপযোগী বিশেষ জিপে করে রওনা হব। এ পথে গেলে পাকিস্তান সীমান্ত বাহিনীর পাহারাচৌকি এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে। হিন্দুকুশ পর্বতমালা পেরিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সোজা জালালাবাদ। এখানে বিন লাদেনের একটা ঘাঁটি রয়েছে। প্রশস্ত উপত্যকায় তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এখানেই বিশ্রামের জন্য বিরতি দেওয়া হবে। এরপর কোনো এক অচেনা পাহাড়ি গ্রামে রাতযাপনের পরে ফিরতি পথে রওনা হব। শুক্রবার রাতেই আশা করি লিখতে পারব রুদ্ধশ্বাস অভিযানের উপাখ্যান।

চলার পথে যত দূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। পরিধানে থাকবে আফগান রমণীদের ব্যবহৃত পুরোনো কাপড়চোপড়। চুল ও গায়ের চামড়ায় লাগিয়েছি ছদ্মবেশী রং। মুসকিনের বৃদ্ধ মায়ের সঙ্গে ওর স্ত্রীসমেত দেশত্যাগ করছি, এই হবে আমার পরিচয়।

আমি (মুসকিনের স্ত্রী) বধির। সঙ্গে থাকবে সেমি অটোমেটিক রাইফেলের পাহারা। কোথাও কোথাও সশস্ত্র দল আমাদের এগিয়ে দেবে। সব পরিচয়পত্র সীমান্তেই পাশার কাছে রেখে যাব।

আমি পরিচিতজনদের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেও কলম এগোয়নি। তাই কাউকেই কিছু বলা হলো না। যত দ্রুত সম্ভব ফেরত এসে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কাউকে দুই হাজার ডলার চাহিবামাত্র পাঠানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই মূল্যেই নির্ধারিত হয়েছে আমার নিরাপত্তা। ওদের বলা হয়েছে, ইসলামাবাদে নিরাপদে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত এক পয়সাও পাবে না তারা।

পেশোয়ারের কিছু ধূর্ত লোক ১ হাজার ২০০ ডলারের বিনিময়ে বিদেশি সাংবাদিকদের আফগান সীমান্তে পা রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে, কিন্তু এর কোনো মূল্য নেই। চলার পথে কারও সঙ্গে সংঘাত হলে আশা করি একমাত্রই হেরেফোন্দের লোকজনই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, তালেবান যোদ্ধাদের মুখোমুখি হলে এর শেষ পরিণতি আমার জানা নেই।

একটা ভালো ভ্রমণকাহিনি ও প্রতিবেদন তৈরির আশা করছি। সবার প্রতি শুভাশীষ রইল।

পরে কোয়েটায় কর্মরত *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর কর্মী ডেভিডকে একটা ফোন দিই। ও আমার পরবর্তী গন্তব্য জানতে চাইলে আমি এসব প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দিই। অনর্থক কথায় দুই প্রান্তেই বিল বাড়তে থাকে। ডেভিড আমার পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরে এটা মুরের বুদ্ধি কি না জানতে চায়।

আমি হেসে দিলাম। ওকে জানাই, বরং জিম অন্য কিছু ভাবছে। এটা একান্তই ব্যক্তিগত আমার দুঃসাহস।

কোয়েটায় যাওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে। দক্ষিণাঞ্চলে শরণার্থী সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ও জানায়, বাতাসে বারুদের তীব্র গন্ধ। উত্তেজনার পারদ চড়ছে দ্রুত। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে, বিদেশি সাংবাদিকেরা যেসব হোটেলে অবস্থান করছেন, সেখানে বসেছে সশস্ত্র পাহারা। আমি ভাবলাম, এখনই যদি এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে বোমা নিক্ষেপের পর পরিস্থিতি কোথায় যাবে? ডেভিডকে সাবধানে থাকতে বলে আগামী সপ্তাহে আবার কথা হবে জানিয়ে বিদায় বলি।

ডেভিডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু টিম শিপম্যান ওকে চোখে চোখে রাখতে অনুরোধ করেছে আমাকে। এটাই ওর প্রথম বড়সড় কাজ। অথচ সে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেনি। ভেতরে ভেতরে একটু ভয় পেলেও বাইরে ও নিজেকে যথেষ্ট শক্ত ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে একজন চমৎকার গাইডও জুটিয়ে নিয়েছে।

হোটেলে খানিক পায়চারি করতে করতে হোয়াইট হলে অবস্থানরত মানুষটাকে খুদে বার্তা প্রেরণ করি। আমি উন্মাদ এবং সাবধানতা অবলম্বন করার জবাব আসে। রাগের চোটে আমার সাবধানতার চেয়ে উৎসাহ বেশি দরকার বলে ওকে মেইল করি। এবার ও যথেষ্ট সমর্থনসূচক বাক্য ব্যবহার করে। বন্ধু সামরিক উপদেষ্টা পল বিভারের সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল। ফোনে না পেয়ে দ্রুত আমার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটা বার্তা পাঠাই।

সন্ধ্যায় আমাকে পাশার নিয়ে যাওয়ার কথা। ওর গাড়িটা আজ মেরামত করাচ্ছে। সবকিছু ঠিক আছে কি না জানতে চেয়ে ওকে ফোন করলে আমাকে আশ্বস্ত করে।

বিজনেস সেন্টারে গিয়ে তালেবানদের ওপর একটা বই পড়তে শুরু করি। কিছু তথ্য-উপাত্ত ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা বিষয় পরিষ্কার হলাম। সবচেয়ে কট্টর ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তালেবানদের লক্ষ্য। এবং সামান্য ভুলের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছিল ওদের কাছে ডাল-ভাত।

ধর্মীয় ছদ্মাবরণের বাইরে যেকোনো বিনোদনের মাধ্যমের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখানে কোনো টেলিভিশন নেই, গান গায় না কেউ, বড় পর্দায় সিনেমার দৃশ্য ভেসে ওঠে না। হাততালি দেওয়া যায় না, নাচ-গানের মতো আনন্দের বিষয়গুলো একদম নিষিদ্ধ।

নিউক্যাসল ইউনাইটেড ফুটবল দলের একজন পাঁড় সমর্থক আমি। সেন্ট মার্টিনের মাঠে গান-বাজনা, হইহুল্লোড় ছাড়া এক মিনিট টিকে থাকাই কষ্টকর। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও এর জন্য আফগানিস্তানে গর্দান যাওয়ার সুযোগ থাকে। তবে আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) বলার সুযোগ আছে।

আমি নিষিদ্ধ তালিকাটায় চোখ বুলাতে থাকলাম। ধূমপান করা যাবে না, শূকরের মাংস নেই, ব্যবহৃত পুরোনো কোরআনের পাতা ফেলে রাখা যাবে না। এমনকি পুরোনো কোরআনের পাতা দিয়ে তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কায় কাগজের থলে ব্যবহারের অনুমতি নেই। ঘুড়ি ওড়ানোর সুযোগ নেই। ইসলাম ধর্ম বদলে ধর্মান্তরিত হওয়ার সুযোগ নেই এবং অবশ্যই ছবি তোলা নিষিদ্ধ।

ভালো, ছোট নাইকন ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কখনো সুযোগ হয় এই আশায়। এটাই আমার একমাত্র অস্ত্র।

ইন্টারনেটের দুনিয়া ঘেঁটে অবগত হলাম, কিছু আইন শুধু পুরুষদের জন্য। ইন্টারনেটের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। এমনকি দাড়ি রাখা নিয়েও আইন রয়েছে।

দাড়ি মুণ্ডানো অথবা খোঁচা খোঁচা দাড়ি প্রদর্শন আত্মহত্যার সমান। এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি বড় রাখা আবশ্যক।

যথেষ্ট পরিমাণ বড় দাড়ি না থাকলে লোকদের ধরে ধরে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, যত দিন না তাদের দাড়ি প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যে বড় না হচ্ছে। সব সময় মাথায় টুপি পরে থাকতে হয়। কোনো বাচ্চাছেলের মাথায় টুপি না থাকলে তাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না।

নারীদের জন্য প্রযোজ্য হাস্যকর আইনের তালিকাটা ১০ গুণ দীর্ঘ। বাড়ির বাইরে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কাজ করা নিষিদ্ধ। স্বল্প পরিসরে হাসপাতাল অথবা নারী বন্দিশালায় তাদের কাজের অনুমতি ছিল। সমগ্র শরীর আবৃত করে বোরকা না পরে ও পুরুষ আত্মীয় ছাড়া দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করা যাবে না। পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত দোকান থেকে কিছু ক্রয় অথবা ব্যবসা করা যাবে না।

নারীশিক্ষা নিষিদ্ধ। যদিও শুনেছি কিছু সাহসী নারী রয়েছেন, যাঁরা অতি গোপনে অনেক মেয়ের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রয়েছে কিছু আজব, উদ্ভট, ভয়ংকর আইনের অস্তিত্ব। নারীদের প্রকাশ্যে নারীদের পায়ের গোড়ালি প্রদর্শন করা যাবে না। পুরুষ চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগী দেখা নিষিদ্ধ করে কিছু ভয়ংকর আইন রয়েছে।

প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার স্বভাবতই নিষিদ্ধ। নারীরা উচ্চস্বরে হাসাহাসি করতে পারবে না। কথা বলতে হবে অত্যন্ত নিচু গলায়, যাতে অপরিচিত কেউ কণ্ঠস্বর শুনতে না পায়। উঁচু হিলের জুতা অথবা হাঁটতে গেলে ঠকঠক শব্দ হয়, এমন কোনো জুতা পরিধান নিষিদ্ধ। আমার কাছে সাদা মোজা নিষিদ্ধ করে করা আইনটাকেই একমাত্র যৌক্তিক মনে হলো। কিন্তু এটা পুরুষদের জন্যও হওয়া উচিত ছিল।

তবে সাদা মোজা নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি আরও হাস্যকর। সাদা মোজা যৌন আবেদন তৈরি করে। এ ছাড়া সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক। তালেবানদের পতাকায় সাদা রঙের আধিক্য রয়েছে।

চিন্তা করে দেখলাম, সীমান্তে আমাকে খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে। কারণ, সীমান্ত অতিক্রমের ১০ মিনিটের মধ্যে আমি সব আইন ভেঙে

ফেলতে পারি। বোঝাই যাচ্ছে, কেন পশ্চিমাদের মধ্যে তালেবানদের নিয়ে নেতিবাচক কথা প্রচলিত আছে। কারণ, তালেবানদের নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলো নারীদের ওপর নির্যাতন ও বৈষম্যের উপাদানে ভরপুর।

তালেবানদের উৎস ও সংগঠন সম্পর্কে জানতে আরেকটি তথ্য ঘেঁটে দেখি। এক গবেষণাপত্রে, যা অনেক লেখক সত্য বলে মন্তব্য করেছেন, লেখা আছে, ১৯৯৩ সালের দিকে প্রথম তালেবান গঠিত হয়। এর পরের বছরই তারা আধিপত্য বিস্তার করে। তালেবান গঠনের পেছনের মানুষটি হলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ, যিনি ছিলেন একজন ধর্মীর পণ্ডিত। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৩।

কান্দাহার শহরের কাছে এক গ্রামে তিনি ৩০ থেকে ৪০ জন ধর্মীয় ছাত্রকে নিয়ে একটি সংঘ গড়ে তোলেন। তালেবান শব্দের অর্থ ছাত্র।

*এশিয়াউইক*-এর এক প্রতিবেদন অনুসারে তালেবান সংগঠনের প্রথম দিকে পাকিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা ও শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দারাই এতে যোগ দেন। পশতুনের চতুর্দিকে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও বেলুচিস্তানজুড়ে এসব শিবির অবস্থিত।

তবে পশতুনের দক্ষিণের দুররানি উপজাতীয়রাই তালেবানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য।

মুজাহিদিনদের শাসনামলে দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়। *এশিয়াউইক*-এর প্রতিবেদন অনুসারে এই ক্ষোভ থেকেই মোল্লা সাহেব তালেবান গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সে সময় প্রতিদিন মহাসড়কে ডাকাতি হতো। ধর্ষণ, রাহাজানি ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে কান্দাহার মিলিশিয়া বাহিনীর এক নেতা তিনটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করেন। এই ঘটনায় শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অসন্তোষ।

ওমর ও তালেবানের বিচার ছিল খুব দ্রুত। তারা ধর্ষক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলায়। হতভাগা মেয়েগুলোর বাবা তালেবানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তালেবানদের দল ভারী হতে থাকে তখন থেকেই। ধীরে ধীরে একটা শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তারা।

বোঝাই যাচ্ছে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হলেও তালেবানদের শেষ দিকে গতিধারা বদলে যেতে শুরু করে। কোনো তালিবের সঙ্গে কথা বলা, সাক্ষাতের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না আমার। আফগান অসহায় মানুষের জীবনের গল্প তুলে আনতে চেয়েছিলাম। একটাই ভয় ছিল, যেন ধরা না

পড়ে যাই। জানতাম, একবার ধরা পড়লে চলে যেতে পারে আমার প্রাণটাই। তবে ধরা পড়ার বিরাট আশঙ্কা ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাতেই মোল্লা ওমর নতুন এক আইন জারি করেন। বিদেশিদের কোনো ধরনের সহায়তা বা তথ্য প্রদানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ব্যাটা নিশ্চয়ই প্রতিদিনই নতুন নতুন আইন প্রণয়নের চিন্তা করে।

পেটের পেশিগুলো ক্ষুধা জানান দিচ্ছিল। সোজা হোটেলের বুফেতে চলে যাই। এখানকার প্রতিটি খাবারই চেখে দেখার মতো। ওই রাতটা ভালোই কেটেছিল। পরের বেলা কোথায় খাব? হোটেল ব্যবস্থাপককে এ কথা বলতেই সে হেসে দেয়। ও আমাকে আরও একবার পেটভরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। জাতিসংঘের এক পাকিস্তানি চিকিৎসকের সঙ্গে অর্ধেক খাবার বিনিময় করি। ভদ্রলোক খুব হাসিখুশি প্রকৃতির। তিনি জানান, তাঁকে কাবুল থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ওখানের ফেলে আসা হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি ও অফিসের অনিশ্চিত পরিণতি নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। সাধারণ মানুষের পরিণতি নিয়ে তিনি ছিলেন বেশ উদ্বিগ্ন।

চিকিৎসক সাহেবকে বেশ আপন মনে হলো। উনাকে আমার গোপন পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিই। তিনি এতে বেশ উৎসাহী হয়ে আমাকে সমর্থন জানান। বোরকা পরার কারণে আমার ছদ্মবেশ ধারণ সহজ হবে। তাঁকে আমার চুল রং করার কথা জানাই। রং করা চুল ঢেকে রাখতেই ওই দিন রাতে বেসবল ক্যাপ পরে ছিলাম। ওনার সঙ্গে রোববার একত্রে ভোজনবিলাসের দিন ঠিক করি। শহর ছেড়ে দূরে কোথাও গাড়িতে করে যেতে যেতে একত্রে গল্প করা যাবে। উনি আমাকে পাকিস্তানের আনাচ-কানাচ দেখাবেন আর আমি শোনাব দুঃসাহসী অভিযানের রক্ত হিম করা গল্প।

রুমে এসে সিএনএনের সংবাদ শোনার জন্য টেলিভিশন চালু করি। নকল যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। বিশেষজ্ঞরা অনাগত যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে কথার ফুলঝুড়ি ছোটাচ্ছিলেন। আমার ঘুম পাচ্ছিল। যুদ্ধ সব সময় অনিশ্চিত বিষয়। এ নিয়ে একেকজন একেক কথা বললেও বড় আকারের মানবিক বিপর্যয় হতে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে তারা সবাই একমত। পশ্চিমারা এ নিয়ে সাহায্যকারী সংস্থাগুলোকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করছিল।

বিরক্তিকর আলোচনা বাদ দিয়ে অন্যান্য চ্যানেলে কী চলছে তা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হিন্দি, উর্দু অথবা আরবি ভাষা না জানলে খোদ ইসলামাবাদে বধির হয়ে থাকতে হবে।

চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে ডেইজির প্রিয় অনুষ্ঠান সাবরিনা, বাচ্চা ভূত সামনে চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে ডেইজির জন্য বুকটা কেঁদে ওঠে। তবে আমেরিকান অভিনেতাদের অভিনয়ের সঙ্গে উর্দু সংলাপ শুনে ব্যাপক মজা লাগছিল।

এক মিনিট পরই আবার চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে একটা আরবি অনুষ্ঠানে চোখ আটকে যায়। কে হতে চায় কোটিপতির আরবি সংস্করণ। একজন সৌদি উপস্থাপকের সঙ্গে এক আরবি মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। মেয়েটির সম্পূর্ণ শরীর কালো বোরকায় আবৃত। শুধু তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল। লক্ষ করলাম, মেয়েটা ভালোই করছে। মেয়েরা এগিয়ে যাও।

আমি অফিসে ফোন করে জানতে পারি, জিম ব্যবস্থাপনা সম্পাদক অ্যালেক্সের সঙ্গে ব্যস্ত। আমার ভ্রমণের খরচাপাতি ও বিমা-সংক্রান্ত কোনো বিষয়। অফিসের সহকর্মী কেইথ পেরি ফোনটা ধরে। আমরা এর আগে একসঙ্গে *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড*-এ কাজ করেছি। জগৎটা খুব ছোট। জিম ও সম্পাদকের সঙ্গে আগেই বিস্তারিত কাটাছেঁড়া করেছি। তাই জানিয়ে রাখলাম আমার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় হলো খুদে বার্তা।

বিমার কথায় মনে ভয় ঢুকে গেল। ফোনটা বন্ধ করে দিই। কী হবে, যদি অ্যালেক্স ফোন করে জানায় যে আমার ভ্রমণের বিমা হয়নি, অর্থাৎ আমার যাওয়া হচ্ছে না। নিজেকে প্রশ্ন করি, এই অভিযানের জন্য আমি মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত। এখন আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই।

ফোনটা পুনরায় চালু করে ভাতিজিদের খুদে বার্তা পাঠাই। জানিয়ে দিই ওদের দাদির সঙ্গে কাল সকালে কথা হবে। আজ ফোন করলে ওনার ফোন ব্যস্ত ছিল। মানুষকে ভুল বোঝানো আমার পছন্দ নয়। তবে মায়ের চোখে আমি কপট মিথ্যাবাদী হয়ে থাকতে চাই না। উনি খুব চতুর মানুষ এবং সব সময় আমার কণ্ঠস্বর শুনেই সব আঁচ করে ফেলেন। এই মহিলা আমাকে আমার থেকেও বেশি চেনেন এবং আমি দারুণ ভয় পাই।

পাশা সকাল আটটায় চলে আসে। গাড়িতে করে শহরের বাইরে এক বাসায় যাই। ওখানে ওর চমৎকার স্ত্রী, দুই সন্তান ও কিছু আত্মীয় আমার অপেক্ষায় ছিলেন। ভালো ইংরেজি বলতে না পারলেও আমার উর্দুর চেয়ে ওদের ইংরেজি কথোপকথন ভালো ছিল।

পাশা জানায় আমার বেশভূষা পাল্টে নিয়ে সম্পূর্ণ একজন সাধারণ পাকিস্তানি মহিলা হতে হবে। উপজাতীয় এলাকা দিয়েই আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। এসব এলাকায় একজন পশ্চিমা নারীর উপস্থিতি কাম্য নয়। যাত্রাপথে কোনো সমস্যা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া যাবে না।

পাশার স্ত্রী আমার প্রথম ছদ্মবেশের পোশাক দিলেন। একটা কমলা রঙের সালোয়ার, ফিরোজা রঙের জামা ও একটা বাদামি শাল, যেটা দিয়ে পুরো মাথা ঢেকে নিলাম। চুলে রং করা ছাড়াও জেল দিয়ে পেছন দিকে আঁচড়ে নিয়েছি। গাঢ় রং মেখেছি হাত ও পায়ে।

পাশার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানালেন। পাশা বলল, ওর বউ আমাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত এবং ওদের পরিবারের সবাই আমার নিরাপদ ভ্রমণের জন্য প্রার্থনা করছে। আমি ওদের ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম।

গাইড মুসকিনের সঙ্গে দেখা হলো। বাকি পথটুকু ও গাড়ি চালিয়ে গেল। ছেলেটা ভয়ংকরভাবে গাড়ি চালায়। মনে হলো, এ যাত্রা নিরাপদে গাড়ি থেকে বের হওয়ার সৌভাগ্য হলে আফগানিস্তান যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।

পেশোয়ারে পথে পুলিশ চেকপোস্টে বেশ কয়েকবার আমাদের গাড়ি থামানো হয়। পুলিশের দল গাড়ি তল্লাশির ভান করলেও ওদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। টাকা। এখানে এরা এত কম বেতন পায় যে রাস্তায় ওদের অনির্ধারিত চাঁদা প্রদান করতে হয়। পথিমধ্যে আমার ছদ্মবেশ সন্দেহের উদ্রেক করেনি।

এক পুলিশ সদস্যকে মুসকিন কিছু রুপি দিতে চাইলে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। লোকটা বোধ হয় আরও বেশি কিছু চাইছিল। কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলার একপর্যায়ে মুসকিন ঝটকা মেরে টাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে পাশ কাটিয়ে যায়। গাড়ির সবাই জোরে জোরে হাসতে থাকে। পাশা বলল, লোকটা লোভের কারণে সামান্য অর্থও হাতছাড়া করল। পাশা হাসিতে ফেটে পড়ে।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম। এটা তালেবানদের ভূমিতে নিষিদ্ধ। শেষবারের মতো কয়েক শলাকা পুড়িয়ে নেব। বোরকার নেকাব অনাবৃত অবস্থায় বাকি পথটুকু পাড়ি দিচ্ছিলাম।

ধূমপান আমার অত্যন্ত পছন্দনীয় একটা কাজ। পাকিস্তানে আমি এখনো বেঁচে আছি কারণ, এখানে গলগল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধোঁয়া ছাড়া যায়। কেউ কিছু বলবে না। লন্ডনে বেনসন অ্যান্ড হেজেসের শলাকায় আগুন ধরানোর চাইতে লুকিয়ে কোকেন বহন করা সহজ কাজ। অফিস ধূমপানমুক্ত। বাইরে গিয়ে অন্য ধূমপায়ীদের সঙ্গে একত্রে ধূমপান আমার ধাতে সয় না। আরাম করে বসে ধোঁয়া ছাড়তে হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ধোঁয়া টানব আর পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির লোক বাঁকা চোখে তাকাবে, তা হবে না। অধিকাংশ কালো ক্যাবে ধূমপান নিষিদ্ধের প্রতীক থাকে। আইনত অবৈধ না হলেও বিবেকবোধ থেকেই গাড়িতে ধূমপান করতে মন চায় না। মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে স্ট্যামফোর্ডের পানশালায় যেতে যেতেই ধূমপান করতে না পেরে দম আটকে আসে।

অবশ্য আমার মা-বাবাও বিষয়টা ঘৃণা করেন। মনে আছে, এক অনুষ্ঠানে মা-বাবার সামনে ধূমপান করেছিলাম। একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান। প্রয়াত চাচি ফ্লোরেন্স, যিনি নিজেও প্রচুর ধূমপান করতেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভাবলাম, এটাই সিগারেট বের করার উপযুক্ত সময়। এমনকি বাবাও আমার সঙ্গে এক চুমুক টান দিতে পারেন। তবে ঘটল উল্টোটা। সিগারেটটা দেখেই বাবা জোরে একটা ধমক দিলেন, তখনই সেটা বাইরে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ এল। আমি কখনোই ফ্লোরেন্স চাচিকে এত দ্রুত বেগে দৌড়ে গিয়ে হাতের জ্বলন্ত সিগারেট বাইরে ফেলতে দেখিনি। চাচা টম একবার আমার দিকে তাকান তো একবার তাঁর স্ত্রীর ভয়ার্ত চেহারার দিকে তাকান। বাবা আমাদের বকছেন বুঝতে পেরে বাকি সবাই জোরে হেসে ওঠে। এবার বাবাও হাসি দিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে আমি আরেকটা শলাকা বের করি।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দিকে যাত্রাপথে আরও দুজন লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারাও সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। পাশাকে বললাম, সবকিছু যতটা স্বাভাবিক রাখা যায়। পাশা জানাল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং ও ইংরেজিভাষী জান নামের এক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি তার নাম শুনতে আগ্রহ দেখালাম না। এখন সবকিছুই প্রয়োজনমাফিক করতে হবে। ওই ব্যাটার নাম জানার কোনো দরকার এই মুহূর্তে নেই।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে আমরা একটা গ্রামে প্রবেশ করি। গাড়িটা ঘুরে গিয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকে পড়ে। একটা কুকুর বিশ্রী স্বরে ডাকছিল।

পাকিস্তানের কুকুরগুলো হাড় জিরজিরে, নোংরা ও খ্যাপাটে স্বভাবের হয়। খানিক ভয় পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর একটা বাতি জ্বলতে দেখে ভয়টা কেটে গেল। ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ নারী এসে দরজা খুলে দিলেন।

তিনি একরকম নিঃশব্দে খুব সন্তর্পণে আমাদের ভেতরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন। আমাকে দেখেই অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখলেন। এদের মন খুব নরম ও দয়ালু প্রকৃতির। ভদ্রমহিলা সারাক্ষণই বিনয় দেখিয়ে কথা বলেন। ভালো ইংরেজি বলতে না পারলেও তাঁর ইশারা বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না।

ছেলেরা বাইরে গিয়ে তাঁবুর খাটের ওপর বসল। আকাশটা খুব পরিষ্কার এবং ভরা জোছনার আলো উপচে পড়ছে। গরম গরম চা আর ধূমপানের সঙ্গে তাদের গল্পের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমারও খুব ইচ্ছে হলো ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার। কিন্তু সম্ভব ছিল না সেটা। অগত্যা একটা রুমে গিয়ে আরও আটজন নারীর সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। সবাই তখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

মাথার ওপর শোঁ শোঁ শব্দে একটা ফ্যান ঘুরছিল। এই দম আটকানো গরম কমানোর ব্যর্থ চেষ্টা। প্রিয় একটা ছবির কথা মনে পড়ে গেল। একটা মিরকা পরিবারের জংলি জীবনের গল্প। মিরকারা আমার অসম্ভব প্রিয়। দলবদ্ধভাবে কাজে ওদের জুড়ি নেই। সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার ব্যাপারটা দারুণ। দিন শেষে সবাই আবার একসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে।

আমাকে আলাদা একটা খাট দেওয়া হলো। শক্ত পাথরের মতো বালিশের বিলাসিতা করারও সুযোগ পেলাম। কিছুক্ষণের জন্য এই পালক পরিবারের সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে ঘুম ভাঙার পর কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। কোথায় আছি, কেন এসেছি কিছুই মনে পড়ছে না। খানিক বাদে স্মরণ হলো, নির্জন সীমান্তের কাছে এক গ্রামে এক পরিবারের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি।

চারপাশের সবাই তখনো ঘুমে আচ্ছন্ন। মৃদু হেসে দিতেই আবার মিরকাদের কথা মনে পড়ে গেল। ডেইজি থাকলে ও খুব মজা পেত। এমনিতে ও খুব ন্যাওটা বাচ্চা। যেখানেই থাকি না কেন, রুমে অনেকগুলো বিছানা থাকলেও ও হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছেই চলে আসে সব সময়।

ভেনিসের প্রথম রাতে ডেইজি লাফ দিয়ে আমার খাটে চলে আসে। আর কত দিন এভাবে মায়ের বুকে লুকিয়ে ঘুমাবে? ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে ও জবাব

দেয়, সম্ভবত ৩০ বছর পর্যন্ত। আমি আর কিছু না বলে ওকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করি।

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ভোর পাঁচটার দিকে আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। বিখ্যাত পর্বতমালা হিন্দুকুশের সুউচ্চ পর্বতগুলোর ছায়ায় আমাদের যাত্রা শুরু হয় সীমান্তের উদ্দেশে। পাশার মাধ্যমে মুসকিন আমাকে জানায়, এসব রাস্তায় ডাকাতের দল ওত পেতে থাকে। তাই দিনের আলো পরিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে চলাচল মোটেও নিরাপদ নয়।

সীমান্তের কাছাকাছি এক খামারবাড়িতে এসে যাত্রাবিরতি দিলাম। তখনো পাকিস্তানের সীমারেখার মধ্যেই আছি। বাড়ির সামনে বিশাল এক উঠান। চল্লিশের কাছাকাছি এক নারী এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। উঠানের পরেই বিস্তৃত সবুজ খেত। বাড়ির পুরুষেরা কোথাও গিয়েছে। মেয়েরা আমাকে এক কক্ষে নিয়ে গেল। একটা পাথরের বিছানায় শুইয়ে দিলে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

আবারও নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ি। চরম আতঙ্ক ও ভয় নিয়ে হঠাৎ জেগে উঠি। কেউ একজন আমার আঙুলে ছুরি দিয়ে আঘাত করছে। একটা মুরগির বাচ্চা খামার থেকে পথ ভুলে ঘরে ঢুকে আমার আঙুলে ঠোকরাচ্ছিল। আমার আঙুলটাকে কি সুস্বাদু দানা মনে করেছিল? নাকি তা ছিল আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নাশতা খাওয়ার আহ্বান? বলতে পারি না।

ওই নারী আবার রুমে এসে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন। একটা চিরাচরিত আফগান পোশাক ও রেশমি নীল বোরকা এগিয়ে দিলে আমি পোশাক পাল্টে নিই।

নতুন পোশাকে সবার আচরণে যে পরিবর্তনটা দেখতে পেলাম, তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। এমনকি পাশাও অন্যভাবে কথা বলছিল।

কেউ যেন আমাকে গ্রাহ্যই করছিল না। হঠাৎ করেই আমি একটা অভিযানের কান্ডারি থেকে গুরুত্বহীন আফগান নারীতে রূপান্তরিত হলাম। আমি পাশাকে নিয়ে অভিযানের ব্যাপারে পুনরায় কথা বলতে চাইলাম। কারণ, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন অপরিচিত লোকও ছিল। কিন্তু পাশা আমাকে গাড়িতে উঠতে বলল।

আমরা আবার খাইবার পাসের সড়ক ধরে এগিয়ে গেলাম। আরও একবার চোখে পড়ল বড় করে লেখা বিদেশিদের প্রবেশাধিকার নিষেধ।

আগেরবার বৈধভাবে এলেও এবার আমার সঙ্গে কিছুই নেই। এমনকি পাসপোর্টটাও রেখে এসেছি।

এবার আমাদের সঙ্গে আরও একটা গাড়ি যোগ দিয়েছে। এক জায়গায় থেমে একজন নারী, দুই সন্তান ও স্বামীসমেত এক পরিবারও আমার সঙ্গে যোগ দেয়। এরা ইংরেজি জানে না তাই বুঝতে পারছিলাম না কী ঘটছে। একটা জায়গায় এসে ছেলেরা সবাই রাস্তার ধারে এক ক্যাফেতে চলে গেল। আমি আর ওই নারী গাড়ির পেছনের সিটে বসে রইলাম। এতক্ষণে আমি গুরুত্বহীন ও অদৃশ্য হয়ে গেছি।

জানালাগুলো বন্ধ। ভারী বোরকার ছোট একটা নেকাবের আড়াল থেকে আমি কিছুই দেখছিলাম না। জ্বলন্ত উনুনের গরম গায়ে এসে লাগছিল। মেজাজ চড়তে লাগল। মাথার ঘাম পিঠ বেয়ে পড়তে লাগল একসময়।

ইংল্যান্ডে যদি আমি একটা কুত্তাও হতাম, এতক্ষণে কেউ একজন জরুরি সংস্থায় ফোন করত অথবা ইট দিয়ে জানালা ভেঙে আমাকে উদ্ধার করত। নিশ্বাস নিতে নিতে অভিশাপ দিচ্ছিলাম এবং ইচ্ছামতো খিস্তি শোনাচ্ছিলাম। আধা ঘণ্টা ধরে আমাদের জঘন্য গাড়িটাতে আটকে রাখা হয়। ইচ্ছে করছিল ধড়াম করে বের হয়ে লোকগুলোর কলার চেপে ধরে কী ঘটছে তা জানতে চাই। কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ছদ্মবেশ একদম প্রকাশিত হয়ে যাবে। মনে পড়ল, তালেবানদের কঠোর আইন, গলার স্বর কিছুতেই উঁচু করা যাবে না।

এমন সময় লোকগুলো ফিরে এলে আমরা চলতে শুরু করি। আমি দাঁতে দাঁত চেপে পাশার কাছে জানতে চাই, আস্ত একটা ভন ট্র্যাপ পরিবার কেন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে? আর এসব কী হচ্ছে?

পাশা ঘাড় ঘুরিয়ে আবার শুনতে চাইল, কী বলছি। ভন ট্র্যাপ, সুইস পরিবার রবিনসন, ওয়ালটন যা ইচ্ছা ভাবো, কিন্তু সবকিছু সহজ-সরল, নির্ঝঞ্ঝাট রাখার প্রতিজ্ঞার কী হলো?

ও শুধু আমাকে চিন্তা করতে না করল। আমি এখন এক বিয়েবাড়ির সদস্য। আফগানিস্তান যাচ্ছি।

আর কিছু বলার আগেই গাড়িগুলো থেমে যায়। কী কারণে যেন চালকেরা আসন বদল করে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জায়গাটায় চলে এলাম, যেখানে আমি খাইবার রাইফেলসের ডজনখানেক সদস্যকে

অসাবধানতাবশত গুলি করতে যাচ্ছিলাম। ১০ মিনিট অতিক্রান্ত না হতেই আমরা একদম তোরখাম সীমান্তের কাছে চলে এলাম।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি। পাশার দিকে এগিয়ে বোরকাটা একটু উঁচু করে মুখটা বের করে বলতে থাকলাম, এসব পছন্দ হচ্ছে না। এভাবে যাওয়ার পরিকল্পনা তো ছিল না। পাশা তীক্ষ্ণ স্বরে ধমক দিয়ে আমাকে এগোতে নিষেধ করে চুপ করতে বলে। একজন তালিব এদিকেই আসছিল।

ভয়ে একদম জমে গেলাম। আমার সঙ্গের নারীটি একটা বাচ্চাকে এগিয়ে দিলে তাকে কোলে নিয়ে নিই। ওই নারী আমাকে ধরে ধরে সীমান্ত পার করাচ্ছিলেন। আমার হাত-পায়ের শক্তি কমে পাথর হয়ে যাচ্ছিল। দুজন লোক, একজন নারী, দুটি বাচ্চাসহ তালেবানদের ফাঁড়ি অতিক্রম করার সময় হঠাৎ এক লোক পশতু ভাষায় আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে।

এখনো আফগানিস্তানেই পৌঁছাইনি, আর এর মধ্যেই ওদের সন্দেহের জালে আটকা পড়ে গেলাম। আস্তে করে ঘুরে তাকাই। জাতিসংঘের একটা মেডিকেল চেক পয়েন্ট। আফগানিস্তানে প্রবেশের আগে বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয়। স্মল পক্স বা এ জাতীয় রোগের প্রতিষেধক।

সৌভাগ্যবশত আমার সঙ্গের নারী এগিয়ে এলেন। আমি তাঁর পিছু পিছু যাই। চিকিৎসক পশতু ভাষায় কিছু বললে আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়াই। বাচ্চাটার মুখে কয়েক ফোঁটা ড্রপ ঢেলে দিলেন। প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উতরে গেলাম। কিন্তু তখনো আমার ভয় কাটেনি।

গল্পের দৃশ্যটা বদলে গেছে তাহলে, মুসকিন আমার সঙ্গে নেই। আমি তখনো শামীম নামীয় এক বধির এবং এক বিয়েতে যাচ্ছি। আমার করার কী আছে? যদি আমি বোরকা খুলে বেরিয়ে আসি, সে ক্ষেত্রে সেমি অটোমেটিক অথবা কালাশনিকভধারী তালেবানরা আমাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করবে অথবা আরও ভয়ংকর কিছু।

আমি ইভন রিডলি, দুই দেশের মধ্যবর্তী অদৃশ্য সীমানা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রতিটা পদে অনিশ্চয়তা। উত্তেজনায় দেহের মধ্যে অ্যাড্রেনালিনের জোয়ার বইছে। আমি সত্যি চিৎকার করতে চাইছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, পাশার কাছাকাছি গিয়ে হাঁটি। কিন্তু একজন আফগান নারীকে তার কণ্ঠস্বর উঁচু করার জন্য জীবন দেওয়া লাগতে পারে। এক নীরব জগতের বন্দিনী আমি।

এলাকাটা ফলের দোকানে ভরপুর। মাঝেমধ্যে দু-একটা দোকানে গাড়ির তেল অথবা বিভিন্ন সরঞ্জাম সাজানো দেখা যায়। হলুদ ও কালো ট্যাক্সির সারি। দুই পাশে যাত্রীদের উদ্দেশে চালকেরা হাঁক ছাড়ছে। ধুলো মলিন ছেঁড়াবেড়া পোশাক পরিহিত ক্ষুধার্ত বাচ্চারা ঘুরছে চারপাশে। জুতা পলিশ থেকে শুরু করে গাড়ি মোছা পর্যন্ত সব রকম কাজের জন্য এরা তৈরি। ক্ষুধার জ্বালা।

অল্প কিছু শরণার্থী ছিল। তবে সেদিন পাকিস্তানগামী মানুষের চেয়ে অধিক মানুষ ফিরে আসছিল। শক্ত চোয়ালের একদল যুবক। তোরখাম সীমান্ত থেকে তালেবানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এরা দৃঢ়সংকল্প। এরা কোথা থেকে আসছিল? তালেবানরা পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদের জন্য বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো ইউরোপিয়ান মুসলমান কি জিহাদে যোগ দিয়েছে?

গাইড দুজনের পেছন পেছন নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি। কিন্তু বোরকা পরে হাঁটা কষ্টকর। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ভয় লাগছিল, কখন জানি উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলি। আফগান নারীর চরিত্র থেকে বেরিয়ে সন্দেহজনক কিছু করে না আবার ধরা পড়ে যাই।

ছোট মেয়েটা শক্ত ধরে আমার হাত চেপে ধরে। যাত্রাপথের সঙ্গী নারী বা তার দুটি সন্তানের ভারবহনের কোনো প্রয়োজন অথবা দায়িত্ব কোনোটাই আমার নয়। বিপদের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে গেছে। অথচ আমি কী উৎকট ঝামেলার মধ্যেই না পড়েছি। বুঝে আসছিল না মুসকিন কেন এভাবে রং বদলে নিল? প্রথম দিকে ওকে বেশ উৎসাহী ও আগ্রহী মনে হচ্ছিল।

আমার ছদ্মনাম ও ওর স্ত্রীর পরিচয় ধারণের বুদ্ধিটা তারই। এমনকি ওর ১১ বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চাইলেও আমি না করি। অথচ উল্টো এখন দুটি সন্তান ও তাদের মায়ের ভার বহন করতে হচ্ছে।

গাইডদ্বয় জালালাবাদ পর্যন্ত একটা গাড়ি ঠিক করলে আমরা সবাই তাতে চড়ে বসি। এখানে রাস্তার বিবরণটা দিয়ে নিলে ভালো হবে। পুরো রাস্তা অসংখ্য খানাখন্দে ভরা। কোথাও পিচঢালা দীর্ঘ পথ নেই। পেছনের সিটে বসে এদিক-সেদিক ছিটকে যাচ্ছিলাম। বারবার জানালার পাশের এক হাতলে বাড়ি লাগছিল এবং মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়।

চালক হঠাৎ খেপে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। পেছনের আয়নায় তাকিয়ে কিছু একটা বললে সঙ্গের লোক দুজন নেমে পড়ে। পেছনের চাকা ফেটে গেছে। সবাই মিলে চাকা বদলাতে লেগে গেল। ১০ মিনিটের মাথায় গাড়ি আবার চলা শুরু করে। এত দ্রুত ওদের চাকা বদল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। গাড়িটা সড়ক থেকে পাশের ধূলিময় প্রান্তরে ছিটকে গেল। জায়গাটা ভর্তি নুড়ি পাথর। আরেকটা চাকা ফেটে গেছে। দুর্ভাগ্য আজ ভালোমতোই পিছু নিয়েছে। পুনরায় চাকা বদলে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করে।

আমি ভাবছিলাম, কতগুলো অতিরিক্ত চাকাসমেত গাড়িটা যাত্রা শুরু করেছে? চালকের দক্ষতায় মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। কীভাবে বড় ধরনের ঝামেলা ছাড়াই দু-দুটি চাকা ফেটে যাওয়া পরিস্থিতি সামলে নিল। তারপরও পাঁচ মিনিটের মাথায় দুটি চাকা ফাটার ঘটনা স্বাভাবিক নয়। ভাগ্যদেবী আজ আমার যাত্রাপথে বারবার বাগড়া দিচ্ছে।

হিন্দুকুশ পর্বতের উঁচু ভূমি পেরিয়ে এলে সামনে বিশাল প্রান্তর। দুদিকে ভুট্টা আর আখের খেতে মাথা দোলাচ্ছে গাছের শিষ।

স্কাড মিসাইল যেগুলো পাকিস্তানের দিকে মুখ করে তাক করে রাখার কথা, তার কোনো চিহ্নই নেই। এমনকি চারপাশে কোনো সামরিক কর্মকাণ্ড চোখে পড়ল না। অদ্ভুত ব্যাপার। একটা দেশ অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমরাস্ত্রের আঘাতের মুখে পড়তে যাচ্ছে আর তাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেবল সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় একটা বহুমুখী রকেট লঞ্চার চোখে পড়েছিল।

গাড়িটা জালালাবাদগামী ৫০ কিলোমিটার সড়ক ধরে লাফাচ্ছিল, ঝাকাচ্ছিল এবং মাঝেমধ্যেই এদিক-সেদিক কাত হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা শান্ত হয়ে এল। চুপ করে বসে থাকার চেষ্টা করলাম। বড্ড ক্লান্তি এসে ভর করেছে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আর অ্যাড্রেনালিনের চাপে বোধ হয়। মাথায় তীব্রভাবে হাতলের বাড়ি লেগে জেগে উঠলাম। আমরা জালালাবাদের উপকণ্ঠ ধরে যাচ্ছি। ভয়ে আঁতকে উঠলাম, যদি চোখে আঘাত লাগত। পরক্ষণেই পরনের আপাদমস্তক আবৃত বোরকার কথা স্মরণে এল।

দেড় ঘণ্টা আগে সীমান্তের তালেবানদের চেক পয়েন্ট পাড়ি দেওয়ার সময় আমার হৃৎপিণ্ড ধুঁকধুঁক করে কাঁপছিল। জালালাবাদ পৌঁছে আবার

হৃৎপিণ্ডের লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষই সশস্ত্র এবং তাদের সবাইকেই তালিব মনে হচ্ছিল।

ব্যস্ত শহরটাতে জীবন অনেক অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক মনে হলো। গাড়ি থেকে নেমে ওই নারীকে অনুসরণ করে বাজারে এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নারীটি আস্তে করে নুইয়ে গিয়ে পায়ের ওপর ভর দিয়ে মার্জিত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। জান আমার কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে আস্তে করে বলল বসে পড়তে। অন্যত্র হলে আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতাম। আজ আর কোনো টুঁ শব্দ না করে চুপচাপ বসে পড়ি। কিন্তু আমি আলুর বস্তার মতো ধড়াম করে মাটিতে বসে যাই।

সৌভাগ্যবশত কেউই আমার এই অদ্ভুত বসার ভঙ্গি লক্ষ করেনি। আমি চিন্তা করতে থাকি, মানুষের নজর এড়ানোর জন্য কী কী করতে হবে? মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। মাটিতে বসে পড়ায় একদম অদৃশ্য হয়ে গেলাম। নিচু অবস্থান থেকে বাজারের চারদিকে দেখতে লাগলাম।

চারদিকে পাকা আপেল, ডালিমসহ আরও অনেক পাকা ফলের ম-ম গন্ধ। আমি মায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও ফল খেতে খুব একটা ভালোবাসি না। কিন্তু এখানে দৃশ্যটা দেখতে ভালোই লাগছে। বাজি ধরে বলতে পারি, এর সবই প্রাকৃতিক। সারবিহীন নিরাপদ। মোল্লা ওমর নিশ্চয়ই সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে চাষাবাদ নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ নির্দেশ অমান্য করলে তাকে পাথর মারা হবে। আমার হাসি পেলেও অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করি। সামান্য একটু শব্দও আমার জীবন কেড়ে নিতে পারে।

হাতের মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভব করছি। পাশের নারীর দিকে তাকিয়ে কেমন নিষ্প্রভ ও ভাবলেশহীন মনে হলো। উচিত ছিল এখানে আসার আগে বিশেষ ধরনের ব্যায়াম পিলাটি শিখে আসা। বন্ধু ড্যাফন রমনি নিয়মিত এসব করে। এর ফলে শরীরের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ওকে সবাই ড্যাফার নামে ডাকে। পেশায় লন্ডনের বিখ্যাত ব্যয়বহুল আইনজীবী। পিলাটি প্রশিক্ষক মাইকের কাছ থেকে হাতে-কলমে অনুশীলন করতেও প্রচুর খরচ করে।

ওর ব্যায়ামের ফিরিস্তি শুনতে গেলে ঘুম আসে। আমিও এক-দুবার গিয়েছিলাম। কিন্তু বারবার একই অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি আর ট্রেডমিলে স্থিতিশীল দৌড় প্রচণ্ড বিরক্তিকর। এই জালালাবাদের এবড়োখেবড়ো রাস্তায়

ড্যাফার দিনভর খুশিমনে স্কোয়াটিং করতে পারবে। গাইড দুজনকে ফিরতে দেখে মনে স্বস্তি পেলাম। কয়েক রকম খাবার ও চাল নিয়ে ফিরছে ওরা।

তারা দুজন সোজা পথ ধরে হেঁটে গেল, একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে। হায়রে বোরকার ভেতর জড়সড় হয়ে বসে থাকা আর মুখ বন্ধ করে রাখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার। একটা মাংসের দোকান অতিক্রম করলাম ওদের পিছু পিছু। চারপাশে অসংখ্য মাছি ভনভন করছিল। একটা কাঠের হাতলে মাত্র এক টুকরা বড় রান ঝোলানো। ভারী নেকাবের ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও বুঝলাম, একদিকে মাংস টুকরা করে কাটা হচ্ছে।

চারপাশে খুব বেশি নারীর উপস্থিতি নেই। যারাও সাহস করে ঘর থেকে বেরিয়েছে, তাদের গায়ে লম্বা বোরকা চাপানো। বিভিন্ন কফির দোকানে বসে ছেলেরা কফি পান করছে। এখানকার চিনিতে প্রচুর পরিমাণ সবুজ চিনি দেওয়া হয়। কয়েকজনের হাতে কোকের বোতলও দেখতে পেলাম।

অধিকাংশ মানুষের মুখে সবুজ তামাকজাতীয় কিছু জিনিস। কিছুক্ষণ চিবুনোর পর সেটা এখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। চিবুনোর সময় গলা দিয়ে অসহ্যকর একটা শব্দ বের হয়।

মনে হলো, এটা খাটগাছের পাতা। এর মধ্যে নেশাকর উপাদান রয়েছে। এ গাছটা আমি চিনি। *ওয়েলস অন সানডে*তে থাকাকালে কার্ডিফের ইয়েমেনি অধিবাসীদের ওপর একটা প্রতিবেদন করেছিলাম। সেখানকার এক মুদি দোকানে প্রতি বুধবার খাটের পাতা বিক্রি হতো। নির্ধারিত দিনে সকাল থেকেই দেখা যেত বিশাল লম্বা লাইন। তখন পর্যন্ত এর পাতা চিবুনোতে কোনো আইনি বেড়াজাল ছিল না। রাস্তার পাশের এক খুপরি থেকে একটা সাধারণ বাজার চোখে পড়ল। সঙ্গের গাইড দুজন একরকম আমাকে পরিত্যক্ত করে রেখেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাপসা গরমের মাত্রা বেড়ে চলেছে। বন্ধ বোরকার ভেতর বসে একটু খোলা বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছিলাম। আমাকে নিয়ে যে গাইডরা এসেছে, ওদের আচরণে মনেই হচ্ছে না তারা আমাদের চেনে। তারা দিব্যি বাজারে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আড্ডা দিচ্ছে পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে। বিভিন্ন দোকানে লেনদেন করছে।

অবশেষে তাদের আসার সময় হলো। আমি মুখে রাগের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রাখলেও কেউই খেয়াল করল না। বোরকার আড়াল থেকে আর আমার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শহরের ভেতর দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। তবে এবার আমাদের বাহন হলো রংচঙে তিন চাকার মোটরচালিত রিকশা।

কোন এক অদ্ভুত কারণে শহরভর্তি শুধু ওষুধ আর গাড়ির যন্ত্রাংশের দোকান। একটাও কাপড়ের দোকান চোখে পড়েনি। পরে জানতে পারি, আসন্ন জিহাদের কারণে মোল্লা ওমর নারীদের নতুন কাপড় কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ড্যাফারের নতুন কাপড় কেনার ভয়াবহ বাতিক আছে। এমন জায়াগায় এলে ও টিকতে পারত না। নির্ঘাত নিজের মাথায় নিজেই পাথর দিয়ে আঘাত করত।

কিছুক্ষণ পর আমাদের হলুদ সাদা রঙের বাহন জালালাবাদ শহরের তিন মাইল পূর্ব দিয়ে চলা শুরু করল। মাঝ রাস্তায় রিকশা থেমে গেলে আমরা নেমে পড়ি। বধিরের অভিনয় করা সত্ত্বেও জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছিল। কেউ কি আমাকে কিছু বলবে, কী ঘটছে? সঙ্গের নারীটি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অথচ কেউই এখন পর্যন্ত আমার দিকে নজর দিল না।

খানিক বাদে বুঝতে পারি, কামা নামের একটা ছোট গ্রাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। এটা একটা ছোট অবহেলিত স্থান।

তখনো ধারণা ছিল না, জায়গাটা আমার জীবনে কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সঞ্চার করবে।

মাঠভর্তি আখ আর ভুট্টাগাছ। গাছগুলো কেমন তরতাজা আর মোটাসোটা। তোরখাম সীমান্তের কাছের খেতগুলোর চাইতে এখানে ফসলের উৎপাদন অনেক বেশি মনে হলো। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা ধরে আমরা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চললাম। আমি হাঁটছিলাম সবার শেষে। ভারী বোরকার ঢাকনার ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। সামনের রাস্তা দেখার জন্য আমাকে বারবার ঝুঁকতে হচ্ছিল।

আমি জানি, এখানেই আশপাশে কোথাও বিন লাদেনের একটা ঘাঁটি আছে। কিন্তু রাস্তা খুঁজে নিতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, আশপাশে তাকানোর সুযোগ পেলাম না। এ ধরনের আচরণ সন্দেহের উদ্রেক করে বৈকি।

যত দূর মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিটা আশপাশেই কোথাও আছেন। তিনি আমার থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকলেও আমার পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না।

পথিমধ্যে নালার ওপর দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা সরু সাঁকো পার হলাম। কিছু দূর যেতেই কামা গ্রামটা ভেসে উঠল। মাটি দিয়ে লেপানো অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। একদম সাদামাটা আফগান গ্রাম।

এক নারী প্রায় দৌড়ে এসে আমাদের সবাইকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানান। এমনকি তিনি আমাকেও অভিবাদন জানান। যদিও আমরা ঠিক ওই মুহূর্তে এসে পৌঁছাব, এটা তিনি কী করে জানতেন, তা আমার বোধগম্য হয়নি। তিনি আমাকে কী ভেবেছিলেন, জানি না। মনে হচ্ছিল, আমি যেন কত দিনের পরিচিত স্বজন। বাচ্চা দুটো পাশের বিশাল খোলা মাঠে খেলায় মত্ত অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে যোগ দিতে দৌড় দিল।

উঠানের এক পাশে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে খড়ের গাদার মতো একটা ছাউনি। এর নিচে রান্নাবান্না করা হয়। একদিকে কিছু হাঁড়িপাতিল ও থালাবাসন রোদে শুকাতে দেওয়া। একটা হস্তচালিত পানির পাম্পও চোখে পড়ল।

আমার সঙ্গী নারী হাত ধরে টেনে একটা বড় হলঘরে প্রবেশ করলেন। মেঝেতে আফগানের প্রচলিত পশমের চাদর বিছানো। চারদিকের দেয়ালে অসংখ্য কুশন ও বালিশ। ওই নারী এক পাশের বিছানায় লুটিয়ে পড়েন। আমি এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে বোরকাটা কোনো রকমে উঁচু করে বিছানায় ঢলে পড়ি ঘুমানোর জন্য। ক্লান্তি তাড়ানোর চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল না। ঘুমাতে ভালোবাসে না, এমন কারও জন্য আদর্শ জায়গা এটা নয়। স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে আসছিল। দীর্ঘ পথ হাঁটা, ভ্যাপসা গরম অথবা টানা দুই নির্ঘুম রাতের জন্য এমন লাগছিল বোধ করি।

বাইরে তখন পারিবারিক পুনর্মিলনী চলছে। সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে। কথা আর চিৎকার থামার কোনো লক্ষণ নেই। এর মধ্যেই আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আমার ঘুম ভাঙল। দেখলাম, এক লোক হাঁটু গেড়ে বসে ঘুম থেকে ওঠার জন্য ডাকছে। ভয়ে নীল হয়ে গেলাম, কারণ লোকটা ইংরেজিতে কথা বলছে।

আমি বোরকাটা মুখের ওপর দিয়ে বসে পড়ি। লোকটা আমাকে শান্ত থাকতে বলে। সে বলতে থাকে, জান আমার কথা বলেছে। আমি একজন মহতী ভালো মানুষ। পরে সে আমাকে বোরকা খুলে আরাম করে বসতে বলে।

এরপরও আমি চুপ করে বসে থাকি। আমি কে বা কোথা থেকে এসেছি, এসব সে কী করে জানল, তা ভাবতে ভাবতে জান রুমে প্রবেশ করে। জান আমার কথা ওদের বলেছে বলে জানায়। তার মতে, এখানে কথা বললে অসুবিধার কিছু নেই।

বধির প্রতিবন্ধীর ছদ্মবেশ হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ লাগল। অগত্যা আমি বোরকাটা খুলে ফেলে মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে জানের ওপর চোখ রাঙাই।

অস্থির হবেন না। জায়গাটা নিরাপদ এবং আপনার কথা গোপন থাকবে। জান অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করে। বয়স ২৫, লম্বা হ্যাংলা গড়নের জানের ভালোমানুষি চেহারাটা মুখভর্তি উষ্কখুষ্কর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

এর মাঝেই আরেকজন গাইড, জানের চাচা, জোরে পা ফেলে রুমে প্রবেশ করলেন। আমার লোকটাকে পছন্দ হচ্ছিল না। কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকলেও একটা কারণ অবশ্যই যে তাঁর ভাষা বোঝার সাধ্য নেই। লোকটা লম্বা গড়নের, পাতলা মুখ, মুখভর্তি অবিন্যস্ত দাঁড়ি। বয়সে জানের চেয়ে ১০ বছরের বড় হবেন।

আপনি কেন এসেছেন? লোকটার প্রথম কথা ছিল এটা। আপনি জানেন, এটা বড় বিপজ্জনক জায়গা।

আট ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথমবারের মতো আমি একটু নির্ভয়ে কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমি একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক। তোমাদের মতো আফগান অধিবাসীদের ওপর একটা প্রতিবেদন করতে চাই। বাক্যগুলো আওড়াতে আমার বেশ ভালো লাগল। তোমাদের আশা, ভয়, জীবনের লক্ষ্য জানার ইচ্ছে পোষণ করি। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের ঘটনা নিয়ে কী ভাবছ তোমরা? আমেরিকার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প জানার পর এখানকার অধিবাসীরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে?

এমন সময় ৩০ থেকে ৪০ জন লোককে পাশের একটা কক্ষে জড়ো হতে দেখি। লোকটা আমার কথা তাদের নিজস্ব ভাষায় এই জমায়েতকে

জানায়। ছোট একটা মেয়ে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে খড়ের তৈরি একটা পাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে থাকে।

আমি একটা ছবি ওঠাতে চেয়ে ক্যামেরাটা বের করি। তালেবানরা ছবি তোলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, লোকটা বেশ দৃঢ়ভাবে এই কথাটা বললে আমি ক্যামেরাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলি। আমি জানতে চাই, তালেবানরা আর কী কী অপছন্দ করে? ২৫ বছরের একটা মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানায়, তাদের শিক্ষা গ্রহণের কোনো অনুমতি নেই।

মেয়েটার কথা অনুবাদ করে ইংরেজিভাষী লোকটা জানায়, মেয়েটা চিকিৎসক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ করেই শিক্ষার সব সুযোগ বাতিল করে দেওয়া হয়।

বিষাদ আর কষ্টের নিচে মেয়েটার দৃঢ়তা যেন ঢাকা পড়ে আছে। আফগানে মেয়েদের কোনো অস্তিত্বই যেন নেই। শিক্ষার আলো কঠোর আইনে নিভে গেছে। মেয়েটার প্রতি সহমর্মিতা দেখালে তাকে একটু খুশি মনে হলো। দুজন নারী, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি। আমার সঙ্গে মেয়েটার সাদৃশ্য আর পার্থক্যগুলো সামনে ভেসে উঠল।

অবাক লাগল, এমন পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে বেঁচে থাকতাম? এরা বেঁচে থাকে না, শুধু টিকে থাকে। কামা গ্রামের অধিবাসীরা খুব দয়ালু প্রকৃতির এবং মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। লক্ষ করলাম, শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা করলেও আসন্ন হামলার ব্যাপারে এরা খুব একটা ভীত নয়। তবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুত এরা।

বোরকা পরা আফগান রমণীরা আধুনিক দাসত্বের প্রতীক। কিন্তু কামার নারীরা খুব শক্ত ধরনের, ইতিবাচক ও প্রাণোচ্ছল। একটা মেয়ের ছিল বাদামি গাঢ় বর্ণের চোখ, প্রশস্ত গাল। আমার একটা মাত্র বাচ্চা শুনে মেয়েটা মুখ টিপে হেসে আমাকে খোঁচা দেয়।

বাচ্চা বহনের একটা সুন্দর ঝুড়িতে হাত রেখে মেয়েটা অবাক হয়, মাত্র একটা বাচ্চা। তোমরা আমেরিকান আর ব্রিটিশ নারীদের মাত্র একটা বা দুটা বাচ্চা হয়। আর আমরা ১৫টা পর্যন্ত সন্তানের মুখ দেখি। তোমাদের সৈন্যসামন্ত কমে গেলেও আমাদের তখনো যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট ছেলে মজুত থাকবে। আমাদের ছেলেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে জন্মায়। এরা যুদ্ধ করতে করতে বড় হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে আমিও যেমন অস্ত্র হাতে তুলে নেব, তেমনি ইনিও অস্ত্র ধরবেন। এই বলে মেয়েটা এক বৃদ্ধ নারীর দিকে

ইঙ্গিত, যাঁর ভাঁজ পড়া চেহারা ও ফোকলা হাসির মাঝে লুকিয়ে আছে গভীর প্রজ্ঞার ছায়া।

আমাকে বলা হলো, বৃদ্ধার জন্ম এক শতাব্দী আগে। তিনি অনেক যুদ্ধ দেখেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতেই সবাই হেসে দিল। তিনি বলছিলেন আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। আফগানদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এসব দেখে আমার একটা কথাই মনে পড়ে গেল, আফগানদের ভাড়া করা যায় কিন্তু তাদের ক্রয় করা সম্ভব নয়।

এর মধ্যেই গাঢ় বাদামি চোখের মেয়েটা জমায়েতের কেন্দ্রে চলে এল। তরুণ দোভাষীর সহায়তায় সে বলতে লাগল, নিউ ইয়র্কে হামলার ঘটনায় আমরা দুঃখিত। এতে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি মারা গেছে। এখানে বোমা নিক্ষেপের আগে আমেরিকা যেন দ্বিতীয়বারের মতো চিন্তা করে। যা-ই ঘটুক না কেন, আমরা কেউই ভীত নই।

মেয়েটার আবেগ-অনুভূতি এখানকার অন্য সবার মতোই। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত দৃশ্য যা টেলিভিশনে সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে, তা দেখার সুযোগ থাকলে এরা কেউই সহজভাবে মেনে নিত না। আফগানিস্তানে টেলিভিশন নিষিদ্ধ। সংবাদ প্রচারের মাধ্যম হলো মুখে মুখে অথবা রেডিওতে। ফলে যেসব ছবি আমাদের জীবনকে শঙ্কার মুখে ঠেলে দিয়েছে, হৃদয়কে ব্যথিত করেছে, তার ছিটেফোঁটাও এরা চাক্ষুষ করেনি।

অধিকাংশ আফগান জনগণ মাথার ওপর একটা ছাদের অস্তিত্বেই খুশি থাকে। এখানকার সব বাড়িই একতলা। তাই এদের পক্ষে ১০০ তলা দীর্ঘ একটা দালানের কথা কল্পনা করা সহজ নয়।

বয়স্ক লোকেরা আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করে। কিন্তু দোভাষী ছেলেটা বলতেই থাকে। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাদের জীবনের লক্ষ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তাদের জানা নেই। এখানের অধিবাসীদের কোনো স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই। তার শেষ বাক্যটা আমাকে আঘাত করল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকতে হয়। দিতে হয় এগিয়ে চলার প্রেরণা। তালেবানরা কেন এদের জীবনকে সহজ করে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না? অবশ্যই আন্দোলনের শুরুটা ছিল মহৎ উদ্যোগ। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নারীদের চরিত্রের দৃঢ়তা সত্যিই দেখার মতো। এত দিন পর্যন্ত আফগান নারীদের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। বোরকার নিচে কি আগুন চাপা পড়ে আছে। আমার মতো ওরাও আমাকে ওদের মধ্যে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। বোরকাটা খুলে ফেলার সময় খেয়াল করি, চেহারায় চুলের রং লেপ্টে আছে। ভালো পরিস্থিতিতে নিশ্চয় এমন হতো না। তীব্র গরম, দম বন্ধ করা বোরকা আর মাথার ঘাম সব মিলে চুলের রং নষ্ট হয়ে গেছে। তবে মাথার স্কার্ফটায় সব আবার ঢেকে দিই।

বাচ্চা উৎপাদনের মেশিন মেয়েটা আমাকে হ্যাঁচকা টানে বাইরে নিয়ে এল কিছু খাওয়ানোর জন্য। এদের আতিথেয়তার কোনো তুলনা নেই। এদের খুব বেশি সম্পদ নেই। যৎসামান্য যা-ই রয়েছে, তা-ই আমার জন্য ব্যয় করতে উদ্গ্রীব।

ভাত, ঝোল আর রুটি খেতে কষ্ট হচ্ছিল। এসবের জন্য প্রয়োজন দক্ষ আঙুল চালনা। মেয়েটা আমার হাতে সুস্বাদু একটা ভুট্টা তুলে দেয়। এত গরম ছিল যে আমি চিৎকার দিয়ে তা ফেলে দিই। সবাই জোরে জোরে হাসতে থাকে। মেয়েটা আরেকবার আমাকে টিপ্পনী কাটে এবং উপস্থিত সবাইকে বলতে থাকে পশ্চিমা মেয়েরা খুব নরম প্রকৃতির হয়। তার বলার ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পারি।

আমার হাতে দেওয়ার আগে মেয়েটা ময়লা মেঝে থেকে ভুট্টাটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে লেগে যায়। দ্বিতীয়বার কোনো কিছু ফিরিয়ে দিলে মেজবানকে অপমান করা হয়। তাই আমি খুশিমনেই এবার হাতে নিয়ে ভুট্টা চিবুতে থাকি। ঘি মাখানো ভুট্টা সত্যিই মজার ছিল। এরপর আমাকে একটা আখ চিবুতে দেওয়া হয়। আখ চিবুতে চিবুতে ক্লান্তি কেটে গেল। আমি দেখলাম, সবাই আখ চিবুচ্ছে এবং শুকনো অংশটা ফেলে দিচ্ছে, যা আমি গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলাম। তাদের দয়া ও আতিথেয়তায় নিজেকে অনেক সম্মানিত মনে হচ্ছিল।

১২ বছরের একটা মেয়ে ময়লা বাসনকোসন ধোয়ার জন্য উঠানের এক প্রান্তে একটা নলকূপ চাপতে চলে গেল। একজন প্রতিবেশী দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলেন এখানে কী হচ্ছে? এখানে অনেক জোরে কথা, হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব হচ্ছিল; যার কোনোটাই তালেবানদের পছন্দ নয়। প্রতিবেশী নারীকে দেখেই ভয়ে কেঁপে উঠলাম। আমাকে দেখতে

পেয়ে তিনি আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন না। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

এমন সময় এক তরুণ উঠানে এসে আমার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে শুরু করে। সমস্বরে একটা না ধ্বনি শোনা যায়। জান জানতে চায়, আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই কি না। আমাদের দ্রুত চলে যাওয়া উচিত বলে তাড়া দিই।

আমার থাকতে ভালোই লাগছিল। অন্ততপক্ষে বিরক্তিকর দমবন্ধ করা পোশাকটা পরতে হচ্ছে না। কিন্তু মন বলছিল এক মুহূর্ত এখানে থাকা উচিত হবে না। এখন পর্যন্ত একবারও আমার গাইডদের সঙ্গে ঝগড়া করার সুযোগ পাই না। ওদের অবহেলার জন্য উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

ছয়জনের একটা দল নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে ধুলোময় রাস্তায় চলে এলাম। একটা তিন ফুট উঁচু দরজা দিয়ে বের হতে হলো। সম্ভবত প্রতিবেশীদের চোখ এড়িয়ে অথবা বাড়িতে কেউ এলে চুপিসারে বেরিয়ে যেতে এটা ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হলো ৪০ মিনিট। আমি জানি না, চালক কীভাবে জানত আমরা এখানে থাকব। নাকি সে এমনিতেই যাত্রীর আশায় চালিয়ে যাচ্ছিল। জান ও তার চাচা রাস্তা পেরিয়ে পরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমার কাঁধে আঘাত করে বসতে বলল।

মাটিতে বসে পড়া সহজ কাজ নয়। এবং আরেকবার আমি এখানকার মেয়েদের অভ্যাসবহির্ভূতভাবে ধড়াম করে বসে পড়ি। একটা বাদামি রঙের প্রাণী রাস্তার অপর পাশের ভুট্টাখেত দেখে বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে আর প্রবেশ করছে। ভোঁদড় হবে হয়তো। একটা বিড়ালের সমান প্রাণীটা। লেজটা মোটা, লম্বা ও ঝোলানো।

গাড়িতে ওঠার পর মনে শান্তি ফিরে এল। দ্রুত ফিরে যেতে চাই পাকিস্তানে। সফর সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। গ্রামের ঘটনার জন্য মনে ভয় ঢুকে গেছে। যদিও ধারণার চাইতে বেশি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছি। পরিকল্পনাটা ছিল এ রকম, মুসকিন আমার চোখ, কান হয়ে থাকবে জালালাবাদে। দুই দিন পর পাকিস্তান ফিরে গিয়ে ও পাশাকে সব জানাবে। আমি পাশার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাতে রং মাখিয়ে একটা সুন্দর প্রতিবেদন তৈরি করব।

নাশতা খেতে খেতে সকালের পত্রিকায় পাঠকেরা যেসব সংবাদ পড়ে থাকেন, এর পেছনে থাকে অক্লান্ত পরিশ্রম আর হাড়ভাঙা খাটুনি। সংবাদ

পাঠকদের কাছে এর গুরুত্ব কতখানি? অধিকাংশ ক্ষেত্রের খবরের পেছনের খবরটাই বেশি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

এই রাস্তা ভ্রমণ শুরু হলো কষ্টের মধ্য দিয়ে। গাড়ির ভেতর আমরা শুধু এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ছিলাম। একটা বাচ্চামেয়ে কাঁদতে শুরু করে। আরেকটা বাচ্চা কী করে এত ঝাঁকুনির মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ল, তা আমার বোঝে আসেনি।

আমি একবার বাথরুমে যেতে চাইলাম। পরক্ষণে মনে হলো, এর জন্য পুনরায় সে গ্রামে ফিরে যেতে হবে।

দুঃসাহসী অভিযানের প্রতিটা দৃশ্য সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। তোরখাম সীমান্তের দিকে গাড়ি ছুটে চলেছে। আমাকে বলা হয়েছিল, একবার গেলে আর ফেরত আসা সম্ভব হবে না আফগানিস্তান থেকে। এখানকার মানুষেরা সত্যিই অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এরা ভীষণ অমায়িক। কিন্তু দেশটা আমার জন্য কিছুই করেনি।

তোরখামে যখন পৌঁছাই, তখন সন্ধ্যা। কয়টা বাজে আন্দাজ করতে পারছিলাম না। কারণ, ঘড়িটা হোটেলকক্ষে ফেলে এসেছি। মূল্যবান কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসিনি। কানের দুল, হাতঘড়ি, টাকাপয়সা এমনকি আমার পাসপোর্টটাও রেখে এসেছি। উপজাতীয় ডাকাতদলের হাতে ধরা পড়ার ভয় পদে পদে। আমার পাসপোর্ট পেয়ে ওরা আমাকে বন্দী হিসেবে মুক্তিপণ চাইবে, তা আমি হতে দিতে পারি না।

তালেবানদের হাতে ধরা পড়লে গর্দান নিশ্চিত। কিন্তু আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলে আমি বলতে পারব, ইসলামাবাদের দূতাবাসে জমা দেওয়া ভিসার আবেদন ফরমের সঙ্গে পাসপোর্টের একটা কপি জমা দেওয়া আছে। এখন এসব চিন্তাভাবনা অবান্তর। কারণ, আমরা একদম সীমান্তের খুব কাছে পৌঁছে গেছি।

হঠাৎ জান আমার কাঁধে টোকা দিয়ে রাস্তার এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মৃদু স্বরে বসে পড়তে বলে। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলাম, এই বদমাশটাকে আমি দেখে ছাড়ব একবার সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার পরে। এমনকি আমি ক্ষোভে বোরকা পোড়াও আন্দোলন গড়ে তোলার চিন্তাও করে ফেলি। যেমন ষাটের দশকে নারীরা অন্তর্বাস পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

আমি নারী সঙ্গীর সঙ্গে নুইয়ে বসে পড়ি। আমরা ঝুঁকে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে যাই। চারজন হতভাগী একসঙ্গে। আধা ঘণ্টা

পরে আমাদের গাইডদ্বয় ফিরে এল। চেহারায় ভয়ার্ত ছাপ, একদম নিশ্চুপ। আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেই সঙ্গের নারী উঠে একদিকে হাঁটতে শুরু করে। আমাদের এক পানশালা ধরনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে মদ সরবরাহ করা হয় না। অনেক মানুষ একত্রে পায়চারি করছিল এবং স্লোগান দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে সেখানে। ভারী বোরকার কালো পর্দার আড়াল থেকে আমি মনোযোগ দিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আমাদের ছয়জনকে একটা বদ্ধ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ছিল না কোনো জানালা, কোনো ফ্যান। মেঝেতে একটা কার্পেট বিছানো।

ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। আমি বোরকার নিকাব এক ঝটকায় খুলে ফেলে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে জানকে ধমকাতে শুরু করি। কী ঘটছে আমাকে খুলে বলো? এটা আমার অভিযান। তোমরা দুজন আমাকে অনুসরণ করবে। আমি যদি লাফ দিতে নির্দেশ দিই, তাহলে তোমরা জানতে চাইবে কতটা উঁচু থেকে? তোমরা যদি একটা পয়সাও আশা করো, তাহলে এখন থেকেই আমাকে কিছু সম্মান দেখাতে শুরু করো। এখন তোমার সঙ্গীকে বুঝিয়ে দাও। এই বলে জানের চাচার দিকে নির্দেশ করলাম।

ধমকে কাজ হলো। জান যে আমার কথা ভালোভাবেই ভাষান্তর করেছে; তা ব্যাটার চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম। মুখটা কেমন পাথরের মতো শুকিয়ে গেছে। আমার দিকে শুকনা মুখে তাকাচ্ছিল।

জান আমার দিকে ঘুরে আস্তে কথা বলতে ইশারা করল। লোকজন সন্দেহ করতে পারে। পাকিস্তান থেকে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণের কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও এখন সীমান্ত পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে না। কালকে সকালে চোরাকারবারিদের ব্যবহৃত একটা পথ দিয়ে পাকিস্তানে ঢোকার চেষ্টা করা হবে। বিকেল নাগাদ আমরা ইসলামাবাদে পৌঁছে যাব। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে জান।

ভয় আর আতঙ্ক মনে চেপে বসল। শুধু আমি নয়, অন্য লোকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেও দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। এতক্ষণে কেন আমাকে জানানো হচ্ছে? আগে কেন সতর্ক করেনি ওরা? আমি পরিকল্পনা বদলে ফেলতে বললাম। আমরা আলাদা হয়ে যাব। তালেবানরা এখনো আমার হদিস না পেলেও সকাল নাগাদ আমাকে খুঁজতে অভিযানে নামবে। গ্রামের কেউ না কেউ অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

জানকে এবার আমার ব্যাপারে যত্নশীল মনে হচ্ছে। আমাকে উদ্বিগ্ন দেখে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছিল। চিন্তার কোনো কারণ নেই। গ্রামের কেউই নিমকহারামি করবে না। তা ছাড়া এই অঞ্চলে রাতে কেন, দিনের বেলাতেও কোনো নারী একাকী পথ চলে না।

আমি দ্রুত ওদের থামিয়ে দিই। এখন পরিস্থিতি অনেক সঙিন। তালেবানদের সঙ্গে সখ্য বাড়াতে যে কেউই আমাদের কথা ফাঁস করে দিতে পারে। আমাদের খোঁজে বের হলে তারা দুজন নারী, দুটি বাচ্চা আর দুজন পুরুষ মানুষের সন্ধান করবে। পরিবারটাকে বিদায় দিয়ে আমাদের উচিত হবে আলাদা হয়ে যাওয়া। মুসকিন আর আমি আলাদা যাত্রা করব। এভাবে আমাদের নিরাপদ থাকার সম্ভাবনাও বাড়বে।

এরপর সে অপর গাইডের দিকে তাকিয়ে কিছু বলল। কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলতে থাকল। উভয়েই আমাদের একা রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি কল্পনাও করতে পারিনি ওরা এভাবে আমাদের একা রেখে বাইরে চলে যাবে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় হোটেলকক্ষে দম আটকে পড়েছিলাম। কিছুই করার ছিল না। অভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে নেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে দিলেও তারা আমার কোনো কথা কানেই তোলেনি, এমনকি আগের মতোই অবহেলা করতে থাকল। হাঁটু ভেঙে এক কোনায় বসে রইলাম। বোরকাটা মাথার ওপর দিয়ে উঠিয়ে রাখি।

আমি ওই নারী ও বাচ্চাদের দিকে একনজর তাকাই। তার বয়স সাকল্যে ৩০ হবে। কিন্তু আফগান নারীদের কঠিন জীবন চেহারার জৌলুশ কেড়ে নিয়েছে। তারপরও চেহারার কমনীয়তা ঠিকই নজর কাড়ে। মুখে সর্বদা একটা মিষ্টি হাসি লেগেই আছে, যে হাসি প্রশান্তি আর উষ্ণতা ছড়ায়। খোদাই জানেন, এই গোবেচারা লোকটার সঙ্গে কীভাবে থাকছে, ভালোবাসা গভীরভাবে অন্ধ হয়। আমার জীবনেও আমি কত এ-ঘাট ও-ঘাট করলাম।

অবশেষে নায়কের দল কিছু খাবার হাতে ফিরে এল। আমি খেতে অস্বীকৃতি জানালাম। মনে পড়ল সারা দিনে একবারও টয়লেটে যাইনি। জানকে বলতেই ও বাইরে অন্ধকারের দিকে কোথায় জানি দেখাল। একটু পর দেখি, টয়লেটে যেতে আমাকে এই গভীর রাতে একটা দড়ির মই বেয়ে নিচে নামতে হবে।

এত নিয়ন্ত্রণ কোথা থেকে সেদিন এসেছিল জানি না কিন্তু আমি টয়লেটে যেতে অস্বীকৃতি জানাই। আফগানিস্তানে ভয়ংকর সাপ আর স্কর্পিয়নের অভাব নেই। এত রাতে অকালে ওদের কামড় খাওয়ার কোনো শখ আমার নেই।

আমি ফিরে যেতে চাইলে জান আমাকে আস্তে আস্তে ওকে অনুসরণ করতে বলে। আমি ঠায় এক কোনায় গাদাগাদি করে বসে রইলাম। ভুলে যাচ্ছিলাম, আমি একজন আফগান নারী। হাতের একটা অংশ উন্মুক্ত হয়ে ছিল। সেখানে মশার দল একের পর এক কামড় দিয়েই যাচ্ছিল। রাতটা যেন কাটছিল না আর। আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলেও একটা অজানা আতঙ্ক দুই চোখের পাতা এক হতে দিল না। মনে হাজারো ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অফিসের সবাই কেমন আছে? আফগানিস্তানে আমার এই সাময়িক মুসাফিরনামা নিয়ে কেউ কি আদৌ চিন্তিত? আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছে? সর্বশেষ কথা হয়েছিল কেইথ পেরির সঙ্গে।

জিমের প্রার্থনা, তুমি যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসো। ভালোবাসা, কেথ।

আমার ফোনটা পাশার কাছে রেখে এসেছি। মা কি এরই মধ্যে একবারও ফোন দিয়েছে? বুঝতে পেরেছে কি দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়েছি? সময়টা কীভাবে প্রতিকূল হয়ে আসছে? আমার অবশ্যই ভদ্রমহিলাকে সব বলতে হবে। জানাতে হবে কীভাবে গিয়েছি। প্রতি রোববারের পত্রিকা উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। আমার প্রতিবেদন পড়লে সহজেই বুঝে ফেলবেন কী ঘটেছিল। তিনি শুধু হতাশায় একবার চোখ উল্টাবেন। অশেষ শুকরিয়া যে আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি টের পাননি। তখন পুরোনো প্যাঁচাল শুরু হয়ে যেত। তোমার একটা ছোট মেয়ে আছে। ওর কী হবে তোমার কিছু হয়ে গেলে? আমি আর তোমার বাবা আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পক্ষে ডেইজির দেখাশোনা করা সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে একবারও ভাবিনি, তা নয়। গত বছর আমি ডেইজির নামে বিমা করিয়েছি, যাতে আঠারো পর্যন্ত ওর পড়াশোনা নির্বিঘ্নে চলে। আমি খিটখিটে নারী নই, যথেষ্ট বাস্তববাদী।

পরের সপ্তাহের কর্মপরিকল্পনার কথা মাথায় চলে এল। একবার কান্দাহারে যাওয়া যায়। তবে অবশ্যই এই দুজনের কাউকেই নেব না। এরা অতিশয় রুক্ষ, আদবকেতার ক খ জানে না। গুছিয়ে কাজ করার

ক্ষমতা কম। মনে হয় কোনো দিন শোনেনি যে গাছের ডালে বসে ডাল কাটতে হয় না।

হয়তো মুসকিন এবার নিজেই যেতে চাইবে অথবা পাশা অন্য কাউকে খুঁজে দেবে। যদি এই পরিকল্পনা সম্ভব না হয়, তাহলে মূল পরিকল্পনা অনুসারে আমি কাশ্মিরের সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলোর একটা পরিদর্শনে যাব।

অবশ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে লিখে শেষ করা যাবে না। বদ্ধ কক্ষে মাথায় হাজার হাজার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং আমি এপাশ ওপাশ করছিলাম। কিসের ভিত্তিতে এটা হোটেল, মাথায় এল না। কোনো রুম সার্ভিস নেই, গোসলখানা নেই এমনকি টয়লেট পর্যন্ত নেই।

আনুমানিক পাঁচটার দিকে সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। একটা গাড়িতে উঠে বসি। গন্তব্য সোজা হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশ ধরে। কোনো সড়ক নেই, কেবল গাড়ি চলার জন্য পাথরের মাঝ দিয়ে জায়গা করে দেওয়া। চালক যত দূর যাওয়া যায় সেই চেষ্টায় মত্ত। একটা পাহাড়ের কিনারায় পাথরের রাস্তার ঢালে এসে গাড়ি থামল।

গাইড দুজন প্রার্থনা করতে বসে গেল। আমি সঙ্গে নারীর কাছে গিয়ে টয়লেটে যাওয়ার কথা বললাম। পুরো একটা দিন একবারও যাওয়া হয়নি। মূত্রথলি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। মহিলা কিছু পাথরের দিকে দেখিয়ে দিল। বোরকা পরা অবস্থাতেই আমি পরনের পোশাক খুলতে শুরু করলাম।

চাপ কমাতেই দ্রুত শরীরের অবসাদ কেটে গেল। গায়ে এসে লাগল পাহাড়ি বাতাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা ছুটন্ত তারা চোখে পড়ল। একটাই প্রার্থনা করলাম, নিরাপদে যেন এখান থেকে বের হতে পারি। তারাটার চলে যাওয়া দেখতে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এটা অদৃশ্য হলো না। বোরকার নেকাব তুলে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম।

একটা উপগ্রহ নিচের ছবি তুলছে। হায় হায়, প্রস্রাব করা অবস্থায় আমার একটা ছবি উঠে গেছে। কিছু কিছু উপগ্রহ নিচের এক মিটার থেকেও ছবি তুলতে সক্ষম। কিন্তু আমি বোরকা পরিহিত। তাই আলাদা করে চেনা সম্ভব নয় আমি কে, সামরিক অথবা বাণিজ্যিক যা-ই হোক না কেন, এটা কোনো তারা নয়। একটা উপগ্রহ মাত্র।

চেহারার ওপর দিয়ে বোরকা টেনে দিয়ে সরতে গিয়েই দেখি কী কাণ্ড। উপগ্রহ দেখতে গিয়ে পাজামার ফিতা আটকাতে ভুলে গেছি। ঠিকঠাক করে নিয়ে সড়কের অপর পাশে চলে এলাম। আমার সঙ্গের নারীটি তার মুখের

নেকাব সরিয়ে ফেলেছে। জোরে জোরে হাসছে। নিঃশব্দে হলেও তার মুখে হাসি ফুটেছে। এত পথ একসঙ্গে চলার পর অবশেষে মহিলার গোমড়া মুখের বিপরীত একটা চেহারা দেখতে পেলাম।

কয়েক মিনিট পর ব্যথায় চোখে পানি চলে এল। একটা খাড়া সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ দিয়ে উঠতে গিয়ে শক্ত প্লাস্টিকের জুতাটা যেন রাগান্বিত হয়ে পায়ের চামড়ায় আঘাত করছে। পায়ের তালুতে একটা ফোসকা পড়েছিল, যেটা ততক্ষণে ফেটে গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, সবারই একই দশা। কিন্তু সবাই কেমন চুপ এবং কোনো অভিযোগ করছে না।

পাকিস্তানের ১ হাজার ৪০০ মাইল বিস্তৃত কাটাছেঁড়া সীমান্তে কম করে হলেও ৪০০ অবৈধ পথ রয়েছে। সূর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে এলে দেখতে পেলাম হিন্দুকুশ পর্বতের বিশাল ঢালু পথগুলো কীভাবে পাহাড়ি উপজাতিদের আপন করে নিয়েছে। এসব ক্ষিপ্রগতির চটপটে সাহসী লোকেরা কী নির্বিঘ্নেই না সীমান্ত পাড়ি দেয়। গজলা হরিণের কল্যাণে তারা খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে সমতলের অধিবাসীদের আলস্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাউর বাবা পৌঁছে গেলাম। অল্প কয়েকজন নারী ও পুরুষ হাঁটাচলা করছিল। সারিবদ্ধভাবে উট ও গাধার সারির পিঠে চোরাই মাল, জিনিসপত্র ও মানুষ সীমান্ত পার হওয়ার অপেক্ষায়। শরণার্থীদের দেখা মিলল না। কয়েক দিন আগেও তোরখামে যে হাজার হাজার শরণার্থী ভিড় করেছিল, তাদের কী দশা হলো? কয়েকটি দল হয়তো দক্ষিণে কোয়েটার দিকে ঘুরে গেছে।

জান আরও একবার আমার কাঁধে টোকা দিলে আমি আবারও বসে পড়ি। জান আমার দিকে তাকিয়ে একটা মায়াভরা হাসি দিল। এ হাসির জন্য ওর বিগত সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া যায়।

কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে বলতে থাকে, ইভন, এখন তুমি অনেকটাই নিরাপদ। চাইলে বোরকা খুলে ফেলো। তবে মাথায় একটা ঘোমটা জড়িয়ে নিলে ভালো। কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। গরমে তোমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এখন দুর্ভোগের সময় শেষ। চাইলে এখন ছবিও তুলতে পারো, ২০ মিনিট পরই পাকিস্তানের সীমান্ত। যাত্রা হবে গাধার পিঠে চড়ে।

কথাগুলো শুনে আমি বেশ সময় নিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। গতকালকের শক্ত জুতোটা আরেকবার পায়ে গলানো সম্ভব নয়। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। বোরকাটা একটু তুলে নেওয়ায় মুখে একটা ফুরফুরে হালকা ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে।

সঙ্গের নারীটি তার বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। একটা ছবি তুলতে চাইলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত ধরে রাখার চেষ্টা করলাম। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকেও কয়েকবার ক্যামেরা তাক করি। ব্যস্ত আর হইচইয়ের বাজারে চোরাকারবারি। ব্যবসায়ী, শরণার্থী আর উপজাতিদের ভিড়। রঙিন ফিল্মে এই ব্যস্ততাও আটকে রাখার চেষ্টা করলাম।

জান আমাকে গাধার কাছে নিয়ে গেল। একটা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গাধাটার পিঠে চড়ে বসি। চড়তে গিয়ে পরনের ট্রাউজারটার একটা পায়ের অংশ ওপরে উঠে গোড়ালি অনাবৃত হয়ে পড়ে। ভাগ্য ভালো, বাবার মোজাটা পরে নিয়েছিলাম। আমি কাপড় আর বোরকাটা ঠিকঠাক করতে করতে গাধাটা হঠাৎ জোরে দৌড় দিল।

ফ্লেমিং নোরা, উত্তরাঞ্চলের ইংরেজি গালি আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল। বিগত দুই দিনে জনসম্মুখে এটাই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত প্রথম শব্দ। আশপাশের সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। যদিও আমি যে ইংরেজিতে খিস্তি আওড়েছি, তা ধরতে পারেনি। তবে বোরকা পরিহিত একজন নারী উচ্চস্বরে কথা বলছে, এটাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আফগান মেয়েদের প্রকাশ্যে কণ্ঠস্বর নেই। তাদের দাসের মতো অন্ধ অনুসরণ করতে হয়।

অধিকাংশ মানুষ যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমিও ঠিকমতো গাধার পিঠে বসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। সামনের দিকে ঝুঁকে লাগাম ধরতে গেলে ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা গলায় ঝোলানো আমার ক্যামেরাটা বাইরে বেরিয়ে এসে। ব্যস, এক তালেবান সৈন্যের চোখ পড়ে ক্যামেরার দিকে। চিৎকার করে আমার দিকে আসতে আসতে আমাকে গাধার পিঠ থেকে নেমে আসতে নির্দেশ দেয়।

সৈন্যটির চেহারা আমি কোনো দিন ভুলব না। আমাকে গ্রেপ্তার অথবা হত্যার উদ্দেশ্য ছিল, এ জন্য নয়। তার চোখটা ছিল সবুজাভ পান্নার মতো। এমন চোখের মণি আমি কোনো দিন দেখিনি। অদ্ভুত মনে হতে পারে। সৈন্যটির ব্যক্তিত্বে আমি কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিলাম।

আমাকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে এনে ক্যামেরাটা ফেরত দেওয়ার কঠিন নির্দেশ দেয়। আমি দ্রুত ক্যামেরাটা দিয়ে দিই। সৈন্যটা গাধার মালিকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কিছু বললে মালিক জানের চাচার দিকে নির্দেশ করে। জানের চাচাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়। এরপর সৈন্যটা তার মুখে জোরে এক ঘুষি মারে যে নাক দিয়ে রক্ত এসে যায়।

জান তার চাচাকে বাঁচানোর চেষ্টায় এগিয়ে যায়। সৈন্যটা তখনো চেঁচাচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল। কিছু একটা বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছিল জান। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে চারপাশে প্রায় ২০০ কৌতূহলী জনতা ভিড় করে। সবার চেহারায় তখন প্রকৃত ঘটনা অনুধাবনের আকাঙ্ক্ষা। আমি এক পা দুই পা করে পেছাতে থাকি। ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এক সেকেন্ডের জন্য চিন্তা করলাম, সোজা সীমান্তের দিকে হাঁটা দিই। তালিবরা গাইডের দিকে বেশি নজর দিচ্ছিল। বোরকা গায়ে জড়ানো থাকায় আমি সহজেই ভিড়ের মধ্যে মিশে যাব। আমাকে তখন আলাদা করা সহজ হবে না।

সিদ্ধান্তটা বেশ কঠিন। আমি গাইডদ্বয়কে ছেড়ে যেতে পারি না। সঙ্গের নারীকে দেখলাম আস্তে করে সরে গিয়ে ভিড়ে মিশে যেতে। হট্টগোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে সৈন্যটাকে আমার ক্যামেরাটা ফেরত দিতে বললাম।

সবুজ চোখের সৈন্যটার চোখে কেমন সন্দেহ আর অবিশ্বাস। লোকটা নিশ্চিত আমার কথা ভুলে গিয়েছিল আর এখন আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে অপরিচিত এক বাচনভঙ্গিতে কথা বলছি। এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন তালেবান ঘটনাস্থলে চলে এল। একজন পশ্চিমা নারীকে দেখে তাদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়, জনতা ইতিমধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছে। সোনালি চুলের এক তালিব আমাকে ধরে একটা গাড়িতে উঠিয়ে দেয়। ক্যামেরা ততক্ষণে তাদের হস্তগত।

# তালেবানের বন্দিনী

গাড়িটা পাকিস্তান সীমান্ত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ভয়ে শরীর অসাড় হয়ে এল। হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত শরীরের একটা প্রতিরোধক ব্যবস্থা। কিন্তু আমি বাইরে একদম শান্ত ভাব দেখাই। ভেতরে তখন অ্যাড্রেনালিন পাম্প ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। হৃৎপিণ্ডের ধুঁকধুঁক শব্দ আমি নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছিলাম। সবচেয়ে ভালো কী করা যায়, তা-ই ভাবছিলাম।

সেমি অটোমেটিকের গুলির শব্দে আমার চিন্তার বহর থেমে যায়। বাতাসে বারুদের গন্ধ। একটা গাড়ির বহরে আমাদের গাড়িটাও ঢুকে পড়ে। চারপাশে তখন তরুণ সৈন্যরা বিজয়ের ভঙ্গিতে স্লোগান দিচ্ছিল। আমেরিকান গোয়েন্দা কী ভয়ংকর! ওরা ভাবছে আমি একজন বদমাশ আমেরিকান। মাথায় একটা গুলি প্রবেশ করতে আর কোনো বাধা রইল না বুঝি।

এমন সময় কনুইয়ের গুঁতা খেলাম। আফগান গাইড। ও দ্রুত হাত নেড়ে মুখ চাপা দিয়ে ইশারা করল। আমি বুঝে গেলাম সব। এখন মুখ খুললেই বিপদ। তালিবরা যদি বুঝতে পারে, আমি ওদের প্রথম থেকেই চিনি, তাহলে সর্বনাশ। এ কারণেই আসার আগেই আমি পাশাকে বলেছিলাম কারও নাম জানতে চাই না আমি। একে অপরকে যতই কম চিনব, ধরা পড়লে ততই মঙ্গল।

আবার গুলির শব্দ। একসঙ্গে অনেকগুলো। উচ্ছৃঙ্খল জনতা মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে লাগল। স্লোগানটা আমার পরিচিত। পেশোয়ারের মিছিলেও একই স্লোগান শুনেছি। উসামা জিন্দাবাদ উসামা জিন্দাবাদ, অর্থাৎ উসামা দীর্ঘজীবী হোক। আর আমার জীবনের আয়ুর কী হবে? দীর্ঘায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

গাড়িটা এক জায়গায় থেমে গেলে জানকে ওরা সরিয়ে নেয়। তখন ভাবিনি যে ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। একজন লোক উঠে আমার পাশেই বসে পড়ে। লোকটাকে তালেবান সৈন্য মনে হচ্ছিল না। তার মাথায় বিশাল ভারী পাগড়িও ছিল না। এমন পাগড়ির নকশার পোশাক ২০০২ সালে ইউরোপ ফ্যাশন সপ্তাহে মডেলরা পরিধান করেছিল।

ফ্যাশনের চিন্তা বাদ। এক পাশে আফগান গাইড, অন্য পাশে এই অদ্ভুত তৈলাক্ত প্রাণী। আফগান লোকটা আমাকে চিমটি মেরেই যাচ্ছিল। আমার চামড়া ছিঁড়েই ফেলবে মনে হচ্ছে। ওর ইশারা আমি এতক্ষণে বুঝে গেছি। ব্যাটা এমন করতে থাকলে নির্ঘাত ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব, যদি এটাই আমার জীবনের শেষ কাজ হয় তবুও।

গাড়িটা আবার থেমে গেলে জান আবার আমাদের গাড়িতে এসে বসে। ওকে কেমন শান্ত দেখাচ্ছিল। আমি খুব অবাক হলাম ওর পুনরায় ফিরে আসায়।

জানের ফিরে আসার মানে হলো অপরিচিত লোকটা এবার আমার গাঁ ঘেষে বসবে। প্রথম প্রথম কিছু মনে না হলেও পরে বুঝতে পারি লোকটা আমার গায়ে হাত দিতে চাইছে। আশায় ছিলাম, বদমাশ লোকটা নিবৃত্ত হবে। তবে এই মুহূর্তে এটা বড়সড় কোনো সমস্যা নয়।

আফগান লোকটা আবার জোরে চিমটি কাটল। প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম। আর চুপ থাকতে পারলাম না। এখানে কেউ কি ইংরেজি ভাষা বোঝেন? আমি ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করি। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি আবার প্রশ্ন করি, কী ঘটছে আমি জানতে চাই? আমি জানি না এই দুজন কারা। কিন্তু আমি একজন ব্রিটিশ। যদি আমার ক্যামেরা ফেরত না পাই, তাহলে বড়সড় সমস্যা হবে।

আমি আশা করছিলাম জান অন্তত আফগান লোকটাকে কিছু বলবে, যাতে ও আমাকে চিমটি কাটা বন্ধ করে। আমার ডান দিকের বিরক্তিকর লোকটা আমার বোরকার ঢাকনা খুলে ফেলে। কালো-স্বর্ণালি রং মিশ্রিত বাদামি চুলগুলো খুলে যায়। একদম কোনো সাজপোশাক ছাড়াই বসে আছি। আমার গায়ের রং একটু হলদে সাদা আর চোখটা নীল রঙের।

লোকটা আমাকে একটা চিরুনি দেয়। আমি দুই দিন ধরে বোরকার নিচে আটকে থাকা অগোছালো চুলগুলো আঁচড়ে নেওয়ার বৃথা চেষ্টা করি।

অবশেষে চুলগুলো ছেড়ে দিতে পারলাম। বিরাট শান্তি। এমনকি পলিএ্যানাও এমন মুহূর্তে এ রকম ছোট ছোট ইতিবাচক চিন্তা করত।

আমার পরনে হালকা কমলা রঙের পাজামা আর একটা ফুলেল ছাপের কমলা জামা। সামনে তিনটা বড় ফুলের ছাপ। জামাটা কোমরের দিকে একটু চাপা। এরপর নিচের দিকে তা স্কার্টের মতো ছড়ানো। দেখতে কিম্ভূতকিমাকার লাগছিল আমায়। *হোয়াট হ্যাপেন্ড টু বেবি জেন* সিনেমার বেট ডেভিসের মতো। সামনের সিটে বসা সোনালি চুলের লোকটা বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। অশ্লীল চাহনি ওঠানামা করছে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত। হায় যিশু, সম্ভবত আমি ধর্ষণ অথবা গণধর্ষণের শিকার হতে যাচ্ছি।

হঠাৎ চালককে গাড়ি থামাতে বলা হয়। তালিব লোকটা আমাকে বের করে নিয়ে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড় করায়। পরক্ষণেই লোকটা চলে যায়। খানিক বাদেই একদঙ্গল লোকসহ ফিরে আসে। সবাই কেমন আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। সবাই উত্তেজিত ভঙ্গিতে তারস্বরে চিৎকার করছে। কেউ কেউ ক্রুদ্ধ স্বরে গলা ফাটিয়ে চিল্লাচ্ছে। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে একটা হাস্যকর বিনোদনের পাত্র মনে হলো, যাকে এসব মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য ধরে আনা হয়েছে। ভয়ে আমার শরীর নীল হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কার্পেটের মতো শক্ত হয়ে আছে।

নিচের দিকে তাকিয়ে পায়ের নখে রক্তলাল নেল পলিশ চোখে পড়ল। পায়ে জুতা বা মোজা কোনোটাই নেই। কখন এসব খুলে গেছে, মনে পড়ছিল না। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, রঙিন পায়ের দিকে কারও যেন নজর না পড়ে। এই তল্লাটে গায়ে রং বা প্রসাধনী মাখাও নিষিদ্ধ।

এখানেই তাহলে সব শেষ। উত্তেজিত জনতার পাথরের আঘাতে আমাকে হত্যা করা হবে। হায় খোদা, যেন প্রথম আঘাতেই আমি অচেতন হয়ে পড়ি। কিছু যেন টের পেতে না হয়। অনুনয় করে জীবন ভিক্ষা চাইতে না হয়।

ভাবতে থাকি, কতখানি ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা আছে আমার? অবিরত প্রার্থনা করছি, যেন আমি দ্রুত মারা যাই। চিন্তা করলাম, মেরে ফেলার পর আমার মৃতদেহটার কপালে কী পরিণতি জুটবে? দেশে পাঠানো হবে? মা-বাবা কি আমাকে দেখে চিনতে পারবে? ডেইজি কি কোনো দিন জানতে

পারবে আমাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে? আদৌ কেউ কোনো দিন জানবে?

আরও কাছে চলে এল জনতার ঢল। ভাবলাম, চোখ বন্ধ করে ফেলি। আবার মনে হলো, এদের দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি কারও দয়া হয়, কেউ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করুক। মাটির দিকে চোখ পড়লে দেখি থরে থরে অস্ত্র সাজানো। এত বিপুল গোলাবারুদ, আরেকটা ইন্তিফাদা এক দশক জিইয়ে রাখা যাবে। ইন্তিফাদা হচ্ছে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মুক্তিসংগ্রাম।

রাস্তার দিকে চোখ পড়লে তাকিয়ে দেখি, তালেবান সৈন্যটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা চলন্ত গাড়িকে থামতে ইশারা দিচ্ছে। বোরকা পরিহিত একজন নারী গাড়ি থেকে নেমে এলে ওনাকে আমার অবস্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়। দুজনই হেঁটে আমার দিকে আসতে থাকে। ততক্ষণে জনতা সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করেছে। অথচ আমি জানতাম সমবেত সংগীত নিষিদ্ধ।

নারীটি আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে শরীর হাতড়াচ্ছিল। কী মজা, তারা হয়তো ভেবেছে আমি অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছি। পরমুহূর্তেই মেজাজ বিগড়ে গেল।

আমি ত্বরিত গতিতে উন্মত্ত জনতার দিকে ঘুরে গায়ের কাপড় ওঠাতে উদ্যত হলাম। ভালো করে দেখে নে, ডায়নামাইটের একটা কাঠিও নেই। ভঙ্গিমাটা সেখানে ক্রোধ, ক্ষোভ আর হতাশার উদ্রেক করল। বিরাশি শিক্কার যে থাপ্পড় খেলাম, তা অনেকটা প্রত্যাশিত ছিল।

এই সাহসী অশ্লীল পদক্ষেপে উপস্থিত জনতার দম আটকে গেল। এক মুহূর্ত পর সবাই উল্টো দিকে ঘুরে একরকম পালিয়ে গেল। দৃশ্যটা ছিল অদ্ভুত। ঠিক যেন সিনেমার একটা চিত্রনাট্যের মতো, যেখানে মেয়ে সৈনিকেরা স্থানীয়দের ভয় পাইয়ে দিতে স্কার্ট খুলে ফেলে। এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ফলাফল, মহিলা হাত তুলে আমাকে জোরে আঘাত করলেন। কে বেশি ব্যথাতুর–আমি, এই মহিলা নাকি সঙ্গের সোনালি বাদামি চুলের লোকটা। বোধগম্য হলো না।

আমাদের নরকযাত্রা জালালাবাদের দিকে এগিয়ে চলল। অসভ্য লোকটা বারবার গায়ে হাত দিচ্ছিল। একসময় আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে আমি চিৎকার করি, থাম ব্যাটা শয়তান। লোকটার পাঁজরের হাড্ডিতে কনুই দিয়ে

জোরে চাপ দিলে সে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। সামনের আসনের লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘটনার অর্ধেক অংশ চাক্ষুষ করল ও নির্দেশ দিল গাড়ি থামাতে।

দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। একপর্যায়ে বদমাশটাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হয়। পরের যাত্রাটা গুলি ছোড়ার শব্দ আর সমবেত সংগীত শুনতে শুনতে পার হয়। ততক্ষণে আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি।

জালালাবাদ পৌঁছে আমাকে শহরের প্রতিটা মোড়ে প্রদর্শন করা হয়, যেন আমি কোনো বিজয়ের স্মারক। আমি গাড়ির জানালা সরিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি, কেউ ইংরেজি জানে কি না। উত্তরটা ছিল সব সময় না-বোধক। একটা ছোট ছেলে ভাবলেশহীনভাবে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

ছেলেটার মুখটা জলপাই রঙের। চুলগুলো অপরিষ্কার আর কোঁকড়ানো। রাজ্যের বিষাদ তার চোখে-মুখে। বাচ্চাটার চেহারা খুব মায়া মায়া। তাকিয়ে একটা সুন্দর হাসি দিই। সে-ও প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়ায়। একটা ছোট আঙুল তুলে ঘাড়ের চারদিকে ঘুরিয়ে ইশারা করে। কী দারুণ, ছোট ছেলেদের আমার কখনোই ভালো লাগে না। কিন্তু এই ছেলেটা কী পাকনা!

পরের চেক পয়েন্টে পৌঁছানোর আগেই গাড়ির চালক জোরে একটা কাশি দিল। মুখের চিবুনো খাট পাতা লালাসহ বাইরে নিক্ষেপ করে। থুতুটা আমার মুখে এসে লাগে।

বোরকা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রায় বমি করে দিয়েছিলাম। এক চৌরাস্তার মোড়ে এক লোক আমাকে কয়েকটা কাগজ আর কলম দিলে আমি দ্রুত জিমের নাম্বারটা লিখে ওকে একটা ফোন করতে অনুরোধ করি। লোকটা এক শব্দ ইংরেজি জানে না। সম্ভবত আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল। মনে হলো, সম্ভবত শেষবারের মতো আমি কাগজে-কলমে কিছু লিখলাম।

বিস্ময়ের ঘোর আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। ভাগ্য অমানিশার ঘোর আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে। ভয় জেঁকে বসছে মনে। লোকটা গাড়ির দরজায় হাত বাড়িয়ে জোরে কিন্তু সহজভাবে আমার কবজিটা চেপে ধরে শুধু ওকে শব্দটা উচ্চারণ করে। লক্ষ করলাম, চোখ ভিজে আসছে। মনে হচ্ছিল, লোকটা আমাকে অভয় দিচ্ছে। কথা বলতে না পারলেও আমরা হাসি বিনিময় করলাম।

পেছনে তাকিয়ে মনে হলো, আজ জালালাবাদের পুরুষ গোষ্ঠীর জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। লোকগুলো শুধু মা, স্ত্রী ও বোনদের চেহারা দেখে অভ্যস্ত। গাড়ির পেছনের আসনে সোনালি চুল, নীল নয়না এক পশ্চিমা নারী বোরকা ছাড়া বসে আছে। যদি বোরকাটা না খুলতাম, তাহলে হয়তো কেউই আমাকে ঘাঁটাত না।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু হয় আরেকবার। তালেবান গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করছি বোধ করি। আমাদের তিনজন ও ছোট মেয়েটাকে একটা পরিষ্কার ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নিয়ে বসানো হয়। এখানে টয়লেটের সুবিধাও রয়েছে। আমাদের একা বসিয়ে রেখে দরজাটা বাইরে দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। আমি জানের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো কথা বলতে নিষেধ করি। রুমে গোপন শব্দধারণ যন্ত্র থাকতে পারে। আফগান লোকটা অবশেষে কথাটা বুঝতে পারে। ওদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমি কিছুই বলব না।

আধা ঘণ্টা পরে আমাদের পাহারা দিয়ে আরেকটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকটা হাসপাতালের মতো। এখানে ছোট একটা বিছানাও আছে। আমি পাহারার দায়িত্বে থাকা লোকটাকে বলি দুজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে একই কক্ষে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। এটা তালেবানদের রাজত্বে পুরোপুরি নিষিদ্ধ একটা ব্যাপার। অবস্থাকে আমার অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকি। কৌশলটা কাজে দেয়। আমাকে আগের ঘরটাতে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমার পাহারাদার, যে এক শব্দ ইংরেজি বুঝতে অক্ষম, আমাকে ইশারায় বুঝিয়ে দেয় দরজায় তালা দেওয়া থাকবে। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমি যেন দরজায় আঘাত করি। অধিকাংশ তালেবান সৈন্যের মতো এই লোকটার চেহারার দিকে তাকালেও ভয় করে। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল বাদামি ভারী পাগড়ি দিয়ে আড়াল করা। পাগড়িটা একটা বিশাল উপজাতীয় টুপির চারদিকে প্যাঁচানো। টুপিটা দেখে বুঝতে পারি, লোকটার বাড়ি উত্তর-পূর্বের কুন্দুজ অঞ্চলে। এতে সম্ভবত দুই হাজারের বেশি রং রয়েছে।

বিছানো লাল কার্পেটে বসে পড়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি। আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতখানি? তবে আমি নিজেই বেঁচে থাকা নিয়ে

আশাবাদী হতে পারছিলাম না। এখন কয়টা বাজে? জিম বোধ হয় টেবিলের পাশে বসে আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে।

খুব অসুস্থবোধ করছিলাম। অনেক ভয় লাগছে। পৃথিবী কি কোনো দিন জানতে পারবে আমি তালেবানদের হাতে আটক? আমার ক্যামেরার ভাগ্যেই বা কী জুটেছে? নিকনের মালিকদের নিজস্ব ক্লাবে যে ছাড় পেতাম, সে সুযোগ বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে গেল।

মাঝেমধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতেও দু-একটা চুটকি মনে পড়ে যায়। হাস্যকর। ক্যামেরার ফিল্মে কাদের ছবি তোলা আছে, কামা গ্রামের কোনো অধিবাসীর চেহারা কি চিহ্নিত করা যাবে? আশঙ্কার মেঘ বারবার উঁকি দিল। কত সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো, বোরকায় হাত পেঁচিয়ে আছে।

তখনই কানে একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পেলাম। তালা মোচড়ানো আর চাবি ঘোরানোর শব্দ। গোয়েন্দা প্রধান, ঠান্ডা নির্মোহ চেহারার একজন মানুষ, যার চেহারায় আবেগের কোনো ছাপ নেই। লোকটার চোখে একটা শীতল চাহনি। আমার কল্পনা ভয়ের অতলে নামছে। লোকটা নিজেই কি অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাবে নাকি উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রথম পাথরটা লোকটার পাষণ্ড হাত দিয়ে নিক্ষেপিত হবে?

লোকটার চরিত্রে একটা রহস্যময় দিক আছে। আমাকে ব্যক্তিগত কিছু তথ্য লিখতে বললে জবাব দিই আমি একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক। চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় কমতি ছিল না। কিন্তু এতে গোয়েন্দা প্রধানের চেহারায় কোনো ভাবান্তর দেখা দিল না। যদি বলতাম আমি ইংল্যান্ডের মহামান্য রানির বিশেষ দূত, তাহলেও সম্ভবত লোকটার পাথুরে মুখে কোনো পরিবর্তন আসত না।

লোকটা চলে যাওয়ার পর মনে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি ফিরে এল। কায়দা করে একটা কলম লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। এখন কয়েক পাতা কাগজ পেলেই পুরোদস্তুর সাংবাদিক হয়ে যাব।

দিনটা ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। আমার পক্ষে এই দিনের স্মৃতি কখনো ভোলা সম্ভব নয়। আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা সহকর্মীদের অনেকের কাছেই দিনটা বিশেষ অর্থবহ। আমি ভাবছিলাম জিম কখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। মা অথবা বাবার কাছে জিম এই সংবাদটা পৌঁছে দিক, তা মোটেও চাইছিলাম না। মায়ের মতে জিম একজন পাষণ্ড পুরুষ যে তার

আদরের মেয়েকে ইসলামাবাদে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অথচ আমার মনে হচ্ছে, যৌক্তিক জায়গাতেই রয়েছি। অন্তত হাসি-ঠাট্টা করার শক্তি এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

রুমের চারদিকে পর্যবেক্ষণ করলাম। দেয়ালে একটা এসি লাগানো। এক প্রান্তে টেবিলের ওপর একটা ছোট বই রাখা। মনে হয়, কাউকে দেওয়া হয়েছিল উপহার হিসেবে। ভেতরের পাতায় অসংখ্য স্বাক্ষর আর শুভেচ্ছাবাণী। কেন জানি মনে হলো, এই বইয়ের মালিক বা যাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আদতে একজন ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান। আফগানিস্তানে তিনি জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছেন।

বইটার নাম *তাতারিদের কাফেলা*। লেখকদ্বয় ফ্রান্সের অধিবাসী রোলান্ড ও সাব্রিয়া মিখাদ।

বইটা প্রথম ১৯৭৮ সালে লেখা হয় এবং মিখাদ পরিবারের উপজীব্যের বর্ণনা আছে এতে। এই দম্পতি আফগানিস্তান ঘুরে গেছেন এবং এখানের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কিছু অসাধারণ ছবি তুলেছেন। ভাবতে থাকি–বইয়ের মালিক কে? কেনই-বা এটা ফেলে রাখা হলো। কারণ যা-ই হোক, বইটা পেয়ে মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলিয়ে রাখতে পেরেছি।

বইয়ে মন না দিলে তালেবানদের নির্মম পাথর নিক্ষেপ অথবা শিরশ্ছেদের শাস্তির কথা বারবার চোখে ভেসে উঠত। সায়রা শাহের প্রামাণ্যচিত্র 'বোরকার আড়ালে' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন এই অঞ্চলের নিষ্ঠুরতা কী নির্মম হতে পারে।

মেয়েটা বোরকার নিচে একটা ক্যামেরা লুকিয়ে চুপিসারে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল মেয়েদের ওপর তালেবানদের বর্বরতা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে।

গোপনে কয়েকটি ফুটবল মাঠে শিরশ্ছেদের ভিডিও ধারণ করেছিল। ইশ্, যদি আমার শিরশ্ছেদও তার ক্যামেরায় ধরা পড়ত।

বসে বসে বুড়ো আঙুল নাচাচ্ছিলাম। নাকে এসে একটা তীব্র দুর্গন্ধ লাগল। পরখ করে দেখলাম, গন্ধটা আমার শরীর থেকে আসছে। গত দুই দিনে একবারও গোসল করিনি। পরনের ট্রাউজার আর জামাটা নাইলন আর কৃত্রিম তন্তুতে বোনা। ঘর্মাক্ত শরীর থেকে ভুরভুর করে গন্ধ বের হচ্ছিল। চুলগুলো আঠার মতো মাথায় লেপ্টে ছিল।

পাহারাদার আব্দুল্লাহ মৌনির কিছু খাবার নিয়ে প্রবেশ করলে আমি খেতে অস্বীকৃতি জানাই। গত দুই দিনে পেটে একটা দানাপানিও পড়েনি। কিন্তু রাগ, ভয়, উত্তেজনা আর শিহরণে পাহাড় চাপা দিয়ে মুখে কিছু দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না। আব্দুল্লাহ ইংরেজি জানে না। ইশারায় বোঝালাম, মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত আমি কিছুই খাব না।

গোয়েন্দা প্রধান অল্প কিছু ইংরেজি জানেন। তিনি জানতে চাইলেন আমি কেন খাচ্ছি না। এবার তার সঙ্গে আরও তিনজন তালেবান। হামিদ নামের একজন দোভাষীর কাজ করছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কণ্ঠস্বর দৃঢ় রেখে জবাব দিলাম, মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত আমি কিছুই খাব না। আর বন্দিনী অবস্থায় আমার কিছু খাওয়ার ইচ্ছা নেই। শুধু মেহমান হিসেবেই আমি আহার করতে পারি।

তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে নিজের কাছেই নিজের মনে হচ্ছিল, এ রকম আত্মম্ভরী বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা বলার সাহস কোথায় পেলে? তারাও একই রকম ভেবেছে হয়তো। দরজা বন্ধ করে খাবার নিয়ে ও ফোনের ব্যবস্থা না করে চলে যায় তারা। আমি তারজালি দিয়ে ঢাকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

আর কেউ আমাকে দেখতে এল না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম অথবা চেষ্টা করছিলাম। ভোরের দিকে কারও পায়ের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘাড়ের পেছন দিকে চুলকানি অনুভূত হলেও আমি নড়াচড়া করিনি। কুঁজো হয়ে জড়সড় ভঙ্গিতে বাচ্চাদের মতো শুয়ে ছিলাম এবং উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম কেউ একজন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সবকিছু আগের মতো অন্ধকার হয়ে যায়। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বুঝতে পারি লোকটা ঘরের ভেতরেই অবস্থান করছে। বলতে পারব না, আমার কি চিৎকার করা উচিত ছিল কি না। তবে চেষ্টা করলেও গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোত না। বালুর মতো শুকিয়ে ছিল কণ্ঠনালি।

লোকটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কি না। আমি চোখ বন্ধ করলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না লোকটা ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। এরপর লোকটা মাটিতে আমার পাশে বসে পড়ে আলতোভাবে আমাকে নাড়া দেয়। আমি ধড়াম করে উঠে বসি। চোখ দিয়ে দড়দড় করে পানি ঝরছিল।

আমার চোখ এই নিকষ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু একজন তালিবের অস্পষ্ট অবয়ব চোখে পড়ে। কিন্তু সে ঠিকই বিপরীত দিক থেকে আসা চাঁদের আলোয় আমাকে দেখতে পাচ্ছিল। লোকটা তার হাত ওপরে ওঠালে আমি ভয়ে পিছিয়ে যাই। হাতের পেছন দিক দিয়ে আমার চোখের পানি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে। খুবই নরম স্বরে পশতু ও উর্দুতে কিছু একটা বলে।

পরদিন সকালে নাশতার সময়ের আগেই সরকারি অনুবাদক হামিদ চলে এল। সে বলতে থাকে, রাতের বেলা তোমার ঘুমের সমস্যা হয়েছিল দেখে একজন খুব চিন্তিত। আমার ঘুমের কোনো সমস্যা হয়নি এবং কী বলছে তা-ও বোধগম্য নয়। এ কথা হামিদকে জানিয়ে দিলে ও আবারও বলে বসে, একজন তোমাকে নিয়ে সত্যিই অনেক উদ্বিগ্ন। তোমার ঘুম হয়নি এবং তোমাকে হতাশ লাগছিল।

আমি বুঝতে শুরু করি, রাতে যে-ই এসে থাকুক না কেন, সে ভীষণ বিপদে ছিল এবং জানতে চেয়েছিল আমি কোনো অভিযোগ করব কি না। আমার কোনো অভিযোগ নেই বলে পাল্টা জানিয়ে দিই। রাতে হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখে থাকলেও এখন সব ভুলে গেছি।

লোকটা আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রাতে যে এসেছিল, তার কাছে সংবাদটা জানাতে চলে যায়। আমার বুঝে এল না আমি কেন অভিযোগ করতে যাব। উদ্ভট আইনের তালেবান রাজত্বে হয়তো প্রথম অপরাধটা আমি করেছি বলে অভিযুক্ত হব।

লোকটা দেখতেই পারছে আমি কী দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি এবং কোনো কিছু অস্বীকার করার কতটুকু ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে। অনেক চিৎকার-চেঁচামেচির পরে না উত্তর মেনে নেবে এমন খুব কম পশ্চিমা লোকের কথাই আমি মনে করতে পারি।

একটু পরে আব্দুল্লাহ ফিরে এসে ইশারায় দরজার ভেতর দিকে লাগানো একটা তালা দেখিয়ে দেয়। সে বলতে চাইছে, রাতের বেলায় অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অতিথিকে এড়ানোর জন্য আমার দরজা তালাবদ্ধ করে রাখা উচিত।

আরও একবার হামিদ যে ইংরেজি শিখেছে পাকিস্তানে বসবাসের সময়, তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে জানাল, আমার কোনো কিছু না খাওয়ার সিদ্ধান্তে সবাই আতঙ্কে আছে। গোয়েন্দা প্রধান এসে উপস্থিত হলেন। যদিও আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর দোভাষীর দরকার নেই,

তবুও তিনি হামিদের মাধ্যমেই কথোপকথন চালিয়ে নিতে উৎসাহী। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, এখান থেকে ফোন করা সম্ভব নয়, কারণ যোগাযোগব্যবস্থা এতই করুণ যে স্যাটেলাইট ফোন ছাড়া যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।

আমাকে একটা টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ দিলে আমি একটা প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কামা গ্রামের আন্তরিক মানুষেরা যারা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে তাদের কথা, জালালাবাদ বাজারের আশপাশে গতিময় জীবনের গল্প তুলে ধরা সম্ভব হতো। আজ শনিবার এবং এই দিনটা আমার জন্য মহা ব্যস্ততায় ঠাসা। এখনো কি ওরা জানতে পেরেছে যে আমি তালেবানদের হাতে বন্দী?

দুজন তালেবান গোয়েন্দা আমার সাক্ষাৎকার নিতে চলে এলেন। আরও একবার আমার গ্রেপ্তার তাঁদের জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সে কারণে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। আমার কথায় তাঁরা প্রভাবিত হলেন। তবে তাঁদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না, সবাই যখন আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কেন একজন সাংবাদিক এই জ্বলন্ত উনুনে পড়তে এসেছে।

হামিদের সহায়তায় আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার উদ্দেশ্য। এ-ও জানালাম পাকিস্তানে বসে রেডিও, টিভি ও সংবাদমাধ্যমের তিন হাজার সীমান্ত অতিক্রমের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা আমার কথা বোঝেননি অথবা গণমাধ্যমের উপস্থিতি তাঁদের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। আরও একবার আমি টেলিফোন ব্যবহার করতে চাইলাম। আবারও তাঁরা অস্বীকৃতি জানালে আমি রাগে ফুঁসতে শুরু করি।

আমাকে একটা ফোন ব্যবহার করতে না দিলে আমার মা ভেঙে পড়বেন। আমি তাঁকে বলতে চাই এখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের নিচে আধুনিক টয়লেট আর গোসলখানার সুবিধাযুক্ত একটা কক্ষে অবস্থান করছি। জানাতে চাই তোমরা আমাকে কীভাবে আতিথেয়তা দিচ্ছ।

তিনি মনে হয় এখনো বুঝতে পারেননি আমি এখানে। তাঁকে বলতে হবে, আমি একটা ছোটখাটো সমস্যায় পড়েছি এবং সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছি। অন্যথায় বড় বড় সংবাদমাধ্যমে তোমাদের নিয়ে বৃহৎ শিরোনামে খবর ছাপা হবে। তোমাদের কোনো ধারণা আছে বাইরে পশ্চিমারা তোমাদের নিয়ে কী ধারণা পোষণ করে?

হামিদের ভাষান্তরিত কথাগুলো তাঁরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমি বলতে থাকলাম, মা ভাববেন, আমি এই ছাদ থেকে পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা রশি দিয়ে ঝুলে আছি। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আর তোমরা আমাকে চাবুকপেটা করছ। হামিদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অনেক কষ্টে আমার শেষ বাক্যটা অনুবাদ করল। তাঁরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালেন এবং উঠে চলে গেলেন।

হ্যাঁ, আমি বোকার মতো ভেবেছিলাম, এবার আমাকে একটা ফোন দেওয়া হবে। কী বোকা আমি আমার অনশন চলতে থাকলেও আমার জন্য বারবার খাবার আনা হচ্ছিল। আমি একের পর এক তাঁদের দেওয়া সিগারেট ফুঁকছিলাম। সবুজ চা-ও পান করি। এটা বেশ সতেজকর অনুভূতি বয়ে আনে।

হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে একটা বিকট শব্দের বিস্ফোরণ শোনা গেল। যদিও আমি হাঁটু মুড়ে বসে ছিলাম, তারপরও বিস্ফোরণের তীব্রতায় তিন ফুট দূরে ছিটকে পড়ি। হামিদের মুখে চাপা হাসি। আব্দুল্লাহ অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করে। তখন বিকেল পাঁচটা। আব্দুল্লাহ নিজের বন্দুকটা হাতে তুলে নেয়। আম্রিকা-আম্রিকা বলে মুখ ভেংচায়। পরমুহূর্তেই ও চলে গেল। আমি নিজেকে দৃঢ়তার সঙ্গে সংবরণ করার চেষ্টা করি। কারণ, আমেরিকা প্রতিশোধপর্ব শুরু হয়েছে বোধ হয়।

১৫ মিনিট পরে আব্দুল্লাহ ফিরে এল। ওকে দেখে হতাশ মনে হচ্ছে। আব্দুল্লাহ জানায়, কেউ একজন ভূমি মাইনের ওপর পা ফেলায় বিস্ফোরণ ঘটে। আমি জানতে চাইলাম, হতভাগ্য লোকটার ভাগ্যে কী ঘটেছে? জবাবে আব্দুল্লাহ রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল। ঘাড় নাচিয়ে চলে গেল।

দুই ঘণ্টা পরে দ্রুত ছুটে যাওয়া মেশিনগানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু সব গুলি একই দিকে ছুটছিল। কোনো একটা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের নিকট আছি বোধ হয়।

সেই রাতে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করি। রাতে কোনো পুরুষ মানুষ এসে বিরক্ত করল না। আব্দুল্লাহর দেওয়া উপদেশ মেনে দরজাটা ভেতর দিয়ে লক করে রাখি। আমি তখনো বুঝতে পারিনি, ঠিক কোথায় আমার অবস্থান, তবে ধারেকাছেই কোথাও একটা হাসপাতাল আছে। কয়েকজন আহত মানুষকে হাঁটতে দেখেছিলাম। আমাকে বলা

হয়েছিল, এটা একটা বন্দিশালা। এবং আমার সন্দেহ বাড়িয়ে দিতে এখানে গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ছিল আরেক গোলকধাঁধা।

রোববার, ৩০ সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে নয়টায় দুজন আফগান লোককে আমার কক্ষে নিয়ে আসা হয়। আমাকে বলা হয়, তারা দুজন কাবুলের সাংবাদিক। আমার আগ্রহ বেড়ে যায়, কারণ, আমি যত দূর জানতাম, কাবুল থেকে সব সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাদের স্বাগত জানিয়ে অনুরোধ করি আসন গ্রহণ করতে।

সাক্ষাতের মুহূর্তটা ছিল উত্তেজনাময়। কারণ, দুনিয়ার যে প্রান্তেই কাজ করুক না কেন, সাংবাদিকদের মাঝে একটা বিশেষ বন্ধন থাকে। আশা করছিলাম, এই দুজনের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীতে দু-একটা বার্তা পাঠাতে পারব। আমাকে বলা হলো তাদের সামনে আমার বক্তব্য তুলে ধরতে। এরাই আবার হামিদকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবে।

এর মধ্যে তিন-চার মিনিট কথা বলে ফেলেছি। খেয়াল করলাম, তারা কেউই আমার বক্তব্য লিখছে না অথবা রেকর্ড করছে না। সন্দেহের গন্ধ পাই। হয়তো এই দুজন কোনো গোপন অনুচর। আমি তাদের ছদ্মবেশী বলে অভিযুক্ত করি। অথবা তার চেয়েও খারাপ, পালিত সাংবাদিক। তালেবানদের কথার বাইরে যাদের এক অক্ষর লেখার সক্ষমতা নেই।

মনে পড়ে, আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম এরা অনুচর। এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। এরা আমার আতিথেয়তার সম্মান রাখেনি। তাই তখনই বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিই। হামিদ জানায়, এই লোক দুজন খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর কথা কানেই তুললাম না। বরং দুই হাত বগলদাবা করে উঠে পায়চারি করতে থাকি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। একটা সুন্দর ফুলের বাগান চোখে পড়ছে। আমাকে হামিদ কী চরিত্রের ভেবেছিল, তা জানি না। তবে খেয়াল করি, আমার রাগান্বিত অবস্থা অথবা মন খারাপের মুহূর্তে ও কেমন ভড়কে যেত। সাবলীলভাবে অনুবাদ করতে পারত না।

সেদিন দুপুরবেলা অভুক্ত লাঞ্চের পর তিনজনের একটা তদন্ত দল আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এদের একজন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সহকারী। লোকটার চেহারায় প্রভাবিত করার ক্ষমতা বিদ্যমান। ঘন কালো লম্বা দাড়ি গোলাপি গালটার অধিকাংশকেই ঢেকে দিয়েছে।

দাড়িওয়ালা অধিকাংশ পুরুষলোক হাড্ডিসার হলেও এই লোকটা বেশ গাঁট্টাগোট্টা। লোকটার চোখের মণি ঘন কালো এবং হাঙরের মতন অনেকটা। ভয়ার্ত একটা ছাপ চেহারায়। বাজি ধরে বলতে পারি, তিনি সেদিন অবশ্যই ভয় পেয়েছিলেন।

হামিদের মাধ্যমে তারা জানতে চাইল কীভাবে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছি। আমার সাহায্যকারী কারা। ওই দুজন লোকই-বা কারা, যাদের আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া গতদিনের প্রশ্নগুলোও উঠে আসে।

এত প্রশ্নের জবাবে ওই দুজন লোকের কোনো ভূমিকাই নেই বলে জানাই। আমার গুরুত্বপূর্ণ জীবনে এদের উপস্থিতি ক্ষণিকের মাছির মতো। উল্টো আমি জানতে চাই, তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো? তালেবানদের গোয়েন্দাগিরির সক্ষমতাকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিই। তিন গোয়েন্দা এতে খুব বিরক্ত হয়। কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত লোকটা শত চেষ্টা করেও মুখের বিরক্তিভাব আড়াল করতে পারেনি। হয়তো, প্রত্যুত্তরে এখনই কোনো নখ টেনে তোলার অথবা শারীরিক নির্যাতন করার কোনো যন্ত্র এসে হাজির করা হবে।

সাংবাদিকতার কিছু নৈতিকতা রয়েছে। কোনো তথ্য সরবরাহকারী অথবা সাহায্যকারীর পরিচয় ফাঁস করতে অপারগ। ওদেরকে বলি, বিষয়টা সবারই সহজে বুঝে আসবে। একজন সম্মানিত মেহমানকে রক্ষা করাটাও যেমন তোমাদের কর্তব্য।

উসামার মেহমান হিসেবে অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করলেও তারা বিষয়টা এড়িয়ে গেল। কেউ আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে কোনো কথা বলছিল না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অথবা সরাসরি ছাদের দিকে তাকাতে থাকে। পরে জানতে পারি, আফগান সংস্কৃতিতে সম্মানিত কারও দিকে তাকিয়ে সরাসরি কথা বলার প্রথা নেই। হামিদ মাঝেমধ্যে চিৎকার করছিল, 'এই মেয়ে, যখন কথা বলছি তখন সরাসরি আমার দিকে তাকাও।' ব্যাটা রাগান্বিত অথবা বিরক্ত ভাব নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ক্রমেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে দেখে একপর্যায়ে আমি হেসে দিই।

বিকেলের দিকে একজন চিকিৎসক আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসেন। আমার মস্তিষ্ক তখনো ভালোভাবেই সচল ছিল। বুঝতে পারি, অত্যাচার শুরু করার আগে শেষবারের মতো আমাকে সুস্থ রাখার মতলব। যা-ই হোক, ছোটখাটো গড়নের চিকিৎসকের চেহারায় প্রজ্ঞার ছাপ। তিনি

আমার রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন এবং কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। উচ্চ রক্তচাপ আছে, ব্যাপারটা আমার জানা।

হামিদ এ কথাটা চিকিৎসককে অনুবাদ করলেও তিনি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তিনি জানান, আমার রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে। কয়েক বছর আগে আমি উচ্চ রক্তচাপে ভুগেছি। নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে উত্তর দিই।

ব্যস্ত ডাক্তার আবার আমার রক্তচাপ মাপতে শুরু করলেন। হায় খোদা, এবার আমার নিজেকেই দেখতে হলো। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। তিন দিন ধরে তালেবানদের হাতে বন্দী। অথচ এখনো আমার সবকিছুই স্বাভাবিক। বুঝতেই পারছেন ডাক্তার সাহেব, আমি কতটা সুখে, আরামে আছি। এরপর তিনি হামিদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলেন। হামিদ জানায়, ডাক্তার বলে গেছেন, না খেলে আমি মারা যাব।

আব্দুল্লাহ একটা রেডিও নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। হামিদ বলল, 'বিবিসিতে তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। তুমি তো বিখ্যাত হয়ে গেছ। সবাই শুধু তোমাকে নিয়েই কথা বলছে।' আমি চ্যানেল ঘোরাতে থাকলে তারা দুজন উৎসুক ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে। একটা চ্যানেলে খেলার খবর বলছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তিন গোলে টটেনহামের কাছে ধরাশায়ী। ইংরেজি বাক্য শুনতে পেয়ে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়েছিলাম যে রেডিওটা হাত থেকে পড়ে যায়। চ্যানেলটাও ধাক্কা লেগে সরে যায়। আরও কিছু খাবারের বাটি আমার রুমে আনা হয়। আমি সাফ সাফ হামিদকে জানিয়ে দিই, মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগে আমি কিছুই মুখে তুলছি না।

বন্দিত্বের দিনগুলোয় আমি তারিখ উল্লেখ করে কিছু হাবিজাবি কথাবার্তা লিখে রেখেছিলাম। পাণ্ডুলিপি হিসেবে একটা টুথপেস্টের কার্টন ব্যবহার করেছি। কার্টনের গায়ে চোখ মেললেই সেই দিনগুলোতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কল্পনায় ভেসে ওঠে।

ঠিক রোববার দিন লিখেছিলাম, বিবিসি শোনার জন্য আমাকে একটা রেডিও দেওয়া হয়েছে। ওরা জানতে চেয়েছে আমার আর কী প্রয়োজন।

সেদিন আরও লিখেছি, হামিদ জানায় আমার অনাহারী অনশন নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। খাবারে কোনো সমস্যা আছে কি না। অথবা বিশেষ কিছু কিংবা হোটেলে রান্না করা খাবার খেতে চাই কি না।

তারা আমাকে প্রতিনিয়ত তাদের মেহমান বলে সম্বোধন করছে। আমার দুঃখে তারাও দুঃখিত। আমার এসব বিশ্বাস হচ্ছে না। দয়া প্রদর্শন করে তারা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।

এই জাতিটা অনেকটা গোর্খাদের মতো। এরা খুব শান্ত, ভদ্র ও বিবেচক। কিন্তু রণাঙ্গনে এদের মতো নির্ভীক যোদ্ধাবাহিনী আর একটাও নেই। আমার ইচ্ছে হলো, সবাই যদি জানত আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে, তাহলে একটু স্বস্তি পেতাম। সমগ্র বিশ্বের ধারণা, আমার ওপর কঠিন অত্যাচার চলছে, যৌন নিগ্রহ আর প্রহারে প্রায় আধমরা। অথচ এখন পর্যন্ত আমার প্রতি দয়া আর সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবিশ্বাস্য!

ধুত্তোরি, কীভাবে যেন রেডিওটা ভেঙে ফেলেছি। দুনিয়াবাসী আমার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত কি না, তা জানতে পারছি না। কয়েক দিন আগে একটা প্রতিবেদন শুনেছি, কাবুলে আটজন যাজককে আটক করা হয়েছে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে।

আরও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সম্ভবত খণ্ড খণ্ড রোজনামচাগুলোতেই সেই দিনগুলো ভালো ধরা পড়বে।

সোমবার, পয়লা অক্টোবর।

প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছেই। একই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে। পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক। আমার মাঝেমধ্যে অসহায় লাগে। আজকে জেরা করার দায়িত্বে ছিলেন শুকনা, লম্বা হ্যাংলা গড়নের বিজ্ঞ চেহারার এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লাল দাড়ির মোটাসোটা একজন। উভয়ের চেহারায় কেমন ভয় দেখানোর নিরন্তর চেষ্টা। আরেকবার ব্যাখ্যা দিই কেন সীমান্ত অতিক্রম করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের চেহারার কঠোর ভাব দূর হলো না। হামিদ আমার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্বাস করতে না পারলেও আমার বক্তব্য তাঁদের বোধগম্য হয়েছে।

একবার মনে হলো, আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। আমার ব্যাখ্যা তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ঠিক এমন সময় হামিদ আবার জিজ্ঞেস করল, কীভাবে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছি, যেন তার ঠিক ঠিক বর্ণনা দিই।

আমি ক্রোধ আর হতাশায় বাতাসে হাত ছুড়ে বলি, তালেবানে যোগ দেওয়ার খায়েশ মনে জাগায় আফগানিস্তানে এসেছি। সম্ভবত এটা একটা

বাজে মন্তব্য। এমন আচরণের জন্য বুকে একটা গুলি এসে বিঁধতে পারে। মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই বিপদের চিন্তা মাথায় এল।

এতক্ষণ পর্যন্ত তদন্তকারীরা পেছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হামিদ উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কথা পশতুতে ভাষান্তর শুরু করতেই তাঁরা দুজন একসঙ্গে কেঁপে উঠলেন। কাঁধ নাড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। এ রকম রসবোধ নিষ্ঠুর তালেবানদের কাছ থেকে একদমই অপ্রত্যাশিত।

যাক, ভালোই লাগছে, আমার অনুসন্ধানকারীরা অল্প হলেও রসিক মানুষ। পাঁচ মিনিট পরে আমিও হেসে দিলাম। তাঁদের দাবি, আমি আমেরিকার গোপন এজেন্ট। সমুচিত জবাব দিলাম, আমেরিকার গোপন অস্ত্র হয়ে যদি এত সহজে ধরা পড়ে যাই, খোদা যেন সে ক্ষেত্রে আমেরিকাকে সাহায্য করেন। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করি, আমেরিকার গোয়েন্দা হলে আমার ব্যাগভর্তি জেমস বন্ডের গোপন যন্ত্রপাতি থাকত। পরিবর্তে কেবল একটা নাইকন ক্যামেরাই আমার গোয়েন্দাগিরির সম্বল।

আমি কী কী ছবি তুলেছি, তাঁরা জানতে চাইলেন। ক্যামেরার ফিল্মে অল্প কয়েকটা ছবি তোলাই সম্ভব হয়েছে জানিয়ে অনুরোধ করি ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখে নিতে।

সন্দেহ জাগল, হয়তো কেউ একজন আমার ক্যামেরা অথবা ফিল্মটা নষ্ট করে দিয়েছে। ছবি তোলা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখানে প্রিন্ট করার ব্যবস্থাও হয়তো নেই।

একই প্রশ্নে বারবার জেরা করতে থাকায় আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমি সোজাসাপটা জানিয়ে দিই, একই প্রশ্নের উত্তর বারবার দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাঁদের অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এ সময় তাঁদের অন্য কোথাও মনোনিবেশ করার কথা। কিন্তু আমি মাঝখানে বিরাট ঝামেলা হিসেবে উদয় হয়েছি।

আমি স্বীকার করছি, আমি পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই এখানে এসেছি। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। আমার কথায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেও মনে হচ্ছে, বৈঠকগুলো সুন্দর সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে। আমাকে এক-দুই দিনের মধ্যেই বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানালেন। আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম, আমি খুশি। যদিও এ রকম এক-দুই দিনের প্রতিশ্রুতি এর আগেও কয়েকবার দেওয়া হয়েছিল।

লাল বিছানাগুলোর একটাতে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় বাইরে গন্ডগোল শুনতে পাই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। সেই আফগান সাংবাদিককে এদিকে আসতে দেখি। হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোন। আমার জন্য সে সারা রাত অপেক্ষা করেছে এবং সত্যি সত্যি আমাকে সাহায্য করতে চায়। লোকটা আমার মায়ের ফোন নম্বর চাইল। আমার কোনো কথা থাকলে তা মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে। আমি যোগাযোগের নাম্বার দিতে অস্বীকৃতি জানাই। একজন অপরিচিত লোকের কাছ থেকে আমার খবর শুনতে পারলে মা চিন্তায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই আমি এ প্রস্তাবে না বলি।

আমি লোকটাকে আমার হাতে টেলিফোনটা দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করি। হঠাৎ আব্দুল্লাকে আসতে দেখে পর্দাটা টেনে দিই। আমার কিছু প্রয়োজন আছে কি না জানতে এদিকেই আসছিল সে। আবারও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাতের বেলা বাথরুমে যাওয়ার দরকার হতে পারে জানানোয় আব্দুল্লাহ বাইরে থেকে দরজা আটকে না রাখতে রাজি হয়েছিল। চলে গেলে আমি দ্রুত একটা কাগজে মায়ের উদ্দেশে লিখি, আমি ভালো আছি মা, নানি আকাশ থেকে আমার দেখাশোনা করছেন।

সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাতে বলি। বাবাকে বলবে, আমি তাঁর সাহসী মেয়ে হয়ে থাকার চেষ্টা করছি। আমি আরও লিখি, ডেইজি যেন বোর্ডিং স্কুলেই থাকে। ওর জীবন যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। খুব সাধারণ কয়েকটা বাক্য। কিন্তু এটা পেলে মায়ের কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে। আমি জানালার কাছে ফিরে গিয়ে ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে কাগজটা স্যাটেলাইট ফোনধারী আফগান সাংবাদিকের হাতে তুলে দিই। লোকটা খুশিমনে কাগজটা হাতে নেয়। ইঙ্গিত দিই, এই চিঠিটা ঠিকঠাক ঠিকানায় পৌঁছে দিলে আমার জীবনের দারুণ একটা গল্প শোনাব।

ডায়েরিতে লিখেছি–

লোকটাকে সৎ, অমায়িক মনে হচ্ছে। কিন্তু তার মনের প্রকৃত চিত্র বোঝা সম্ভব নয়। খুব করে চাচ্ছিলাম, মায়ের কাছে একটা খবর পৌঁছাক। ডেইজি কেমন আছে জানতে মনটা অস্থির হয়ে ছিল। সামনের বুধবার তার জন্মদিন। একটা কার্ড আর উপহারের আশায় ও অপেক্ষায় থাকবে। বাইরের

দুনিয়ার কোনো খবরই আমার কাছে নেই। বোমা নিক্ষেপ কি আদৌ শুরু হয়েছে? এই দিনগুলোতে নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে। পরিবার ছাড়া আর কেউ কি আমার কথা ভাবছে?

মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো। হাত, পা আর মুখের সর্বত্র কামড়ের দাগ। চুলকাতে চুলকাতে চামড়ার দাগ উঠে গেছে। ওপরে বা নিচে মশা মারার চেষ্টা করেছি বহুবার। বিরক্তি চেপে বসেছে। আমার কক্ষটা সাত ফুট দীর্ঘ আর পাঁচ ফুট প্রশস্ত। গতকাল মাথার ওপর একটা ফ্যান ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাখাগুলো মিনিটে সাতবার ঘুরে, ঘণ্টায় ৪২০ বার।

ইভন, স্বাভাবিক থাক। আচ্ছা, আমি কি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ছি? আমার কাছে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা কখনোই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অফিসের কী খবর? এখনো কি চাকরিতে বহাল আছি? তাদের অবশ্যই এত দিনে জানার কথা আমার দুঃসাহসিক অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এই বন্দিদশা শেষ হবে।

জানালা দিয়ে বাইরের সুন্দর মনোমুগ্ধকর ফুলবাগান চোখে পড়ে। ফুলের পাপড়ি দেখতে দেখতে আমার সময় চলে যায়। এটা কোনো পুলিশ স্টেশন নয়। আবার সামরিক ঘাঁটি হওয়ার কথাও নয়। বাগানের চারদিকে একটা ছোট ঝরনা আছে। সূর্যের আলো পড়ে পাথরগুলো ঝকমক করে ওঠে। ব্রিটিশ বিশেষ গোয়েন্দা দল যদি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেত! আমার বিবেচনা বলছে, তারা এই দেশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। তাদের কাছে কি আমার বন্দিত্বের খবর পৌঁছেছে? হয়তো গোপনে আমাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা চলছে।

মাঝেমধ্যে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। বোরকাটা এখনো আমার কাছেই আছে। গভীর রাতে বোরকা পরে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? বড্ড বিপজ্জনক, কিন্তু এটা ছাড়া আমার আর কী করার আছে!

কী শাখের করাতে আটকা পড়লাম!

পরদিন হঠাৎ করেই প্রশ্নোত্তর পর্বের মোড় ঘুরে গেল। হঠাৎ করেই আমার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নিয়ে তালেবানদের আগ্রহ বেড়ে গেল।

তারা আমার বাবা ও দাদার নাম জানতে চাইল, যা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হলো না। সবাই এতে খুব অবাক হয়ে গেল। বিষয়টা হয়তো অসম্মানজনক। কিন্তু প্রপিতামহ আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছেন, আমিও প্রতিবাদ করি।

প্রশ্নের গতিধারার রং বদলাতে থাকে। তারা কিছু নথিপত্র ঘেঁটে দেখছিল এবং সেখান থেকে আমাকে প্রশ্ন করছিল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। হয়তো তারা আমার ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু কী কী তথ্য তাদের হস্তগত, তা আমি জানতে পারছি না। গত সপ্তাহের আগ পর্যন্ত আমি কখনোই এই দেশে পা মাড়াইনি।

কখনো ইরান গিয়েছি কি না জানতে চাইলে আমি না জবাব দিই। কী অদ্ভুত প্রশ্ন, আমি ইরান যেতে চেয়েছিলাম এবং গত বছর ডেইজির সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার সব পরিকল্পনাও সেরে ফেলেছিলাম। জানতে পারলাম, ইরানের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে একক মায়েদের সহ্য করা হয় না। এমনকি ইসলামি মৌলবাদীদের পাথরের আঘাতে আমার মৃত্যুও হতে পারে।

মঙ্গলবার, ২ অক্টোবর।

তিন থেকে চারজন লোক জেরা করার দায়িত্ব নেয়। বিক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন আসতে থাকে। ওদের চলে যাওয়ার পর হামিদ ফিরে আসে। আমার সন্দেহ হয়, হামিদ নিজেও একজন গোয়েন্দা অফিসার। ও পাগড়ি পরিহিত নয়, মুখের দাড়িও অল্প। তারপরও মাঝেমধ্যে ওকে আমার ভয় হয়।

আমি ভীষণ বিপদে আছি। হামিদ বলতে থাকে, 'তোমার একটা মেয়ে আছে, যার নাম ডেইজি। তোমার জীবনের অনেক কিছুই তুমি তালেবানদের বলোনি। তুমি বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছ। অনেক কিছুই তুমি তালেবানদের বলোনি।'

হামিদ থামল না, 'এখনো সময় আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু তুমি কোনো সুযোগ দিচ্ছ না। এখনো সময় আছে, সঙ্গের দুজন লোকের পরিচয় দিয়ে দাও। ওদের ওপর অত্যাচার চলছে এবং মারধর করা হচ্ছে।'

আমার মাথাটা ঘোরাচ্ছিল। আমি হামিদকে বিশ্বাস করতে পারি না। ওর ওপর আস্থা রাখাটাও বোকামির লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। মনে পড়ে, আমি বলেছিলাম, তুমি ডেইজির কথা জানতে চাওনি। মনে করে দেখো, আমি একলা থাকি, এটা বলার পর তুমি আর কিছু জানতে চাওনি। ডেইজির বাবার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আলাদা থাকার অর্থ কী, তোমরা বোঝো না?

আমি আবার বলতে থাকি। ডেইজির বাবা একজন সুন্নি মুসলিম। তাঁর নাম আবুল হাকিম অথবা দাউদ জারোরা। জাতে ফিলিস্তিনি। তোমাদের ইতিহাস ঘেঁটে দেখো তিনি কী অসাধারণ মহান যোদ্ধা ছিলেন।

নির্লজ্জের মতো আমি ডেইজির বাবার নাম বলছিলাম, এখান থেকে মুক্তির আশায়। ভেবেছিলাম এর ফলে আমার মুক্তির পথ সুগম হবে। কিন্তু ডেভিডের কথা শুনেও হামিদের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিছু একটা ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সে আবার বাকি দুজন লোকের কথা জানতে চাইল এবং তাদের অত্যাচার ও প্রহার করা হচ্ছে বলে পুনরাবৃত্তি করল।

তোমাদের যা ইচ্ছা করো। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। নিরপরাধ লোকদের অত্যাচার করে যদি তোমাদের পাশবিক আত্মা শান্তি পায়, তবে করতে থাকো। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এ নিয়ে একটা সুন্দর গল্প লিখতে পারব। তোমার তালেবান বন্ধুদের কথাটা বলে দিয়ো।

আমার কথায় সে বেশ আঘাত পেল, মনে হয়। দিনের বাকি অংশে আর কেউই আমার কাছে এল না। তদন্তের মুখে পড়ার চেয়েও একাকী বসে থাকাটা বিরক্তিকর ঠেকছিল। সম্ভবত, তালেবান ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করেছি। নির্যাতন পর্ব শুরু হলো বলে। অনেকটা সাপ লুডু খেলার মতো কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। এক পয়েন্ট অর্জন করার সঙ্গেই কয়েক পয়েন্ট পিছিয়ে যাচ্ছি।

২ অক্টোবর ডায়েরির শব্দগাথায় মনের অব্যক্ত হতাশাগুলো গভীরভাবে ফুটে উঠেছিল–

এখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। বলতে গেলে পুরো দিনটাই অনর্থক নষ্ট হয়েছে। কেমন একটা উদ্বেগের পাহাড় গড়ে উঠছে। আমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পথে। খাবার নিয়ে আসা ও যাওয়ার সময় কেউই আমার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না। আমি বিভ্রান্ত, ভ্রষ্ট এবং ভয়ংকরভাবে ভীত।

বাতাসে একটা চাপা উত্তেজনা। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছিল, আমার পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তারা হয়তো শিগগিরই আমাকে মেরে ফেলবে। কিছু একটা করতে হবে। ভয়ে আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। বাথরুমে জং ধরা একটা পুরোনো ব্লেড আছে। সাবানের ভেতর লুকিয়ে ফেলব? মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি নিজেই নিজের মারা যাওয়ার পথ

বেছে নেব। কিন্তু মেরে ফেলতে চাইলে অদ্ভুতভাবে আমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার কেন করা হচ্ছে? আজ সারা দিন আব্দুল্লাহ আর হামিদ কোথায় ছিল?

আমি রুম থেকে বেরিয়ে পরিচালকের কক্ষে টোকা দিই। একটা বদমেজাজি লোক ঘুমাচ্ছে। আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত নেড়ে বেরিয়ে যেতে বলল। তাকে বললাম, পরিচালকের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

লোকটাকে আগে কখনোই দেখিনি।

কী একটা দুঃসহ রাত ছিল এটা। আমি পরিচালকের কক্ষে প্রবেশ করার পর আব্দুল্লাহ ও হামিদ দৌড়ে এল। আমার নাকি একজন ডাক্তার প্রয়োজন। তাদের চেহারায় ছিলো উদ্বেগের ছাপ। কিন্তু আমি একদম স্বাভাবিক আছি। পরিচালক বা ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ডক্টর নয়। হামিদকে বলি, স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছি আমি, আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমার শেষ ইচ্ছা ও বক্তব্য লিখে রাখার জন্য একজন আইনজীবীকে দরকার।

ও আমার দিকে বোকার মতো একটা দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল। আধা ঘণ্টা পরে পরিচালক এলেন এবং জানতে চাইলেন আমার কী প্রয়োজন। আমি তাঁকেও একজন আইনজীবীকে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করি। একই সঙ্গে বলে দিই, এটা একটা ন্যূনতম মানবিক অধিকার। অস্বীকার করার জো নেই।

প্রতিদিন বারান্দা পার হওয়ার সময় গলায় দম আটকে আসত। বাথরুমের বিপরীত দিকে রেজর ব্লেডটা রাখা। প্রতিদিন আমি এটাকে দেখি। কিন্তু আজ ব্লেডটা তুলে নিই। পাকিস্তানের তৈরি ভিজয়া ব্লেড। আমি ব্লেডটাকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এতে করে অশান্ত মন কিছুটা হলেও শান্ত হবে। তা ছাড়া যদি সময় এসে হাজির হয়, তাহলে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারব কখন আমার জীবনাবসান হবে।

আমি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মানুষ নই। কিন্তু পাথরের আঘাতে অথবা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণের চেয়ে আত্মহত্যা ঢের ভালো। এখন আমি নিরাপদে বাসায় বসে আছি। ঠান্ডা মস্তিষ্কে এসব ভাবনাকে অপরিণত মস্তিষ্কের বলে প্রতীয়মান হবে। অথচ ১১ তারিখের দিনগুলোর কথা বিবেচনায় আনলে এমন চিন্তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

তুলনাটা হয়তো যুক্তিযুক্ত হবে না। কিন্তু সেদিন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের অনেক কর্মী আগুনে পুড়ে মরে যাওয়ার চাইতে লাফ দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে সেদিন শান্ত নীল আকাশের নিচে আগুনের আবির্ভাব হয়েছিল। আমারও এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসতে পারে। তাই ভিজয়া ব্রেডটাকে অতি সন্তর্পণে তুর্কি সাবানের নিচে লুকিয়ে রাখি। সাবানটা পেয়েছিলাম একদম প্রথম দিন।

পরের দিন ছিল অন্য রকম ঝক্কিঝামেলা পূর্ণ। দিনের শুরুটা ছিল মন সতেজকারী। আমাকে নতুন পোশাক দেওয়া হলো। কমলা রঙের জামাটা আমি প্রায় সাত দিন ধরে পরে আছি। দুর্গন্ধ আর ঘামে নাক চেপে রাখতে হতো। আব্দুল্লাহ এসে নতুন পোশাকগুলো দিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক আর ধর্মীয় ব্যবধান ভুলে গিয়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। আব্দুল্লাহ ফিক করে হেসে দেয়। তবে এমন অপ্রত্যাশিত অভিবাদনে খানিক চমকে গিয়েছিল। একটা পোশাক ছিল হালকা বাদামি রঙের সঙ্গে দুধেল মিশেল। কিন্তু অন্য পোশাকটা একজন বন্দিনীর জন্য একটু বেশি অভিজাত। এটাকে একটা বিয়ের পোশাক বলে মনে হলো। পরে আমার ধারণাই সত্যি হয়েছিল।

দিনটা বিষাদময় কাটে। আজ ডেইজির নবম জন্মদিন। আমি মেয়ের উদ্দেশে গান গাইলাম। চোখ বন্ধ করে মনের ভেতর ডেইজির চেহারা স্মরণ করি। নিজের চারদিকে হাত জড়িয়ে কল্পনায় ওকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখি। ওর কথা খুব বেশি মনে পড়তে থাকে। ভাবতে থাকি, আবার কি কন্যার মুখখানি দেখতে পাব? একই সঙ্গে চিন্তা এল মাথায়, আমার কথা কতটুকু ওর মনে থাকবে। ও কি মনে রাখবে আমাদের শেষ কথোপকথন?

আসার আগে ডেইজিকে বলে এসেছি, যখনই আমার কথা মনে পড়বে ও যেন দুই চোখ বন্ধ করে চিন্তা করে আমার কথা। উপস্থিত হয়ে সাহস জোগাব মনে মনে। এসব ভাবতে ভাবতে চোখটা ভিজে এল। মনটা দুঃখ ভারাক্রান্ত। কোনো কিছুই এখন আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। অনশন আর রেজর ব্লেড মানসিক শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অক্টোবরের তৃতীয় দিনের বিশেষ ঘটনা সুন্দরভাবে তোলা আছে ডায়েরির পাতায়–

উসখুস লাগছিল খুব। কিছু করার নেই। অবচেতন মনে একটা ক্রিমের কৌটা নিয়ে খেলতে শুরু করি। আটককারীরা কদিন আগে একটা নতুন

জামা দিয়ে গেছে। জামাটা থেকে সুতা এদিক-সেদিক খুঁটে বের করতে গেলে হঠাৎ হাতে তিনটা গুটি আটকে যায়। মনে পড়ে গেল তিন স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা। মহান পিতা খোদা, পুত্র খোদা ও খোদার ছায়ার অস্তিত্ব। ঠিক কী কারণে মন ধাবিত হলো জানি না, তবে আমি প্রার্থনা করতে বসে যাই।

চোখ বুজে খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করি। মনে হলো, শরীর থেকে সব জড়তা ও ক্লান্তি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে শক্তি এসে ভর করল। সময়টা ছিল খুব আন্তরিক। গভীর প্রার্থনায় যেন স্রষ্টার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলাম। পরিচিতজনেরা অবশ্য এসব আধ্যাত্মিক কথা শুনে চোখ উল্টে ফেলবে, বিশ্বাস করতে পারবে না।

তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, একদম মুখে-কানে তালা লাগানো বন্দী হয়ে যাব। আজ থেকে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর নয়। সেদিনই সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমাকে জানানো হলো, কাল বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একদল খ্রিষ্টান যাজক, যাঁদের ইতিমধ্যে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে আটক করা হয়েছিল, তাঁরা হবেন আমার যাত্রাসঙ্গী।

আমার মানসিক শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। আমার প্রার্থনায় মন দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙে। হামিদের ঘড়িটা ও আমাকে দিয়েছিল। উত্তেজনায় সারা রাত দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। খোদা এত দ্রুত আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। প্রার্থনার শেষ অংশটা ঠিকমতো শেষ করিনি। সমস্ত অশুভ শক্তি থেকে রেহাই চাওয়ার দরকার ছিল। সারা জীবন অশুভ মুহূর্তের উপস্থিতির জন্য আমাকে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি।

হামিদ ও আব্দুল্লাহ এসে সানন্দের সঙ্গে একটা পশতু ভাষার পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরে। সম্ভবত *তালেবান বুগল*। প্রথম পাতায় আমার বড় বড় দুটো ছবি। একটা ছবি *সানডে এক্সপ্রেস*-এ ছাপা হয়েছিল আমার আটক হওয়ার খবরের সঙ্গে। আরেকটা ছবি খাইবার পাসে তোলা। বিদেশিদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ লেখা সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তুলেছিলাম। তালেবানদের আইনে পত্রিকায় মেয়েদের ছবি ছাপানো বা তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য আমি ছিলাম নিয়মের ব্যতিক্রম।

বোঝাই যাচ্ছে, বিখ্যাতদের তালিকায় নাম লিখিয়েছি। হামিদের মতে, জালালাবাদের সবাই আমাকে চেনে। জানতে চাইলাম, শিরোনামে কী লেখা? একনজর দেখে হামিদ হাসতে থাকে।

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হামিদ শিরোনামটা পড়ে শোনায়। ইভন রিডলি ভালো আছেন। শিরোনাম শুনে আমিও হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। একাধিকবার আমার রক্তচাপ মাপা ডাক্তার অথবা তার পরিচিত কেউ গণমাধ্যমে আমার সুস্থতার কথা ছড়িয়েছে। অথবা নিজেদের আতিথেয়তার কথা জাহির করে মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ার তালেবানি চেষ্টাও হতে পারে। কে জানে সত্যিটা!

কাবুল বিমানবন্দর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। হামিদ সঙ্গে আসবে কি না জানতে চাইলে ও যেতে পারবে না বলে জানায়। আমি শেষমেশ অনশন ভেঙে একটা রুটি খেতে রাজি হলাম। আমার খাওয়া দেখে দুই হতভাগা বন্ধু যারপরনাই আনন্দিত হলো। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তখনই আমার পায়ের দিকে হামিদের চোখ পড়ে এবং জুতাবিহীন আমার নগ্ন পা দেখে হামিদের একটু মনে হয় মায়া হলো।

ব্যাপার না, জুতার দরকার নেই। বিষয়টা শেষ করে দিতে চাইলেও হামিদ এক জোড়া জুতা খুঁজতে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারি, এক জোড়া জুতা খুঁজে না পেলে কাবুল বিমানবন্দরের উদ্দেশে আমার যাত্রা পিছিয়ে যেতে পারে। ও আবার ফিরে এসে পায়ের মাপ নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আধা ঘণ্টা বসে রইলাম। অপেক্ষা করতে অসহ্য লাগছিল। মনের ভেতর অজানা আশঙ্কা উঁকি দিতে লাগল।

চতুর লোকগুলো আমার ভঙ্গুর মন নিয়ে খুব সফলভাবে খেলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই আমাকে বাড়ি যাওয়ার কথা শোনানো হতো। ফাঁদে পা দিয়েছিলাম, পরে বুঝতে পারি। ওদের ভাষ্য ছিল, আমি একজন গোয়েন্দা। তার মানে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। আমার বিরুদ্ধে ওরা তদন্ত করছিল কিন্তু যার কোনো যৌক্তিক সমাপ্তি ছিল না।

শেষমেশ তারা কিছুই খুঁজে পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। আমি শুরু থেকে শেষ দিন অবধি একজন সাংবাদিক এমনকি *এক্সপ্রেস*-এর পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও এসেছিলেন বলে তারা আমাকে জানিয়েছিল। কী এক গোলকধাঁধার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। অথচ তত দিনে বাড়ি যেতে পারব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

একজোড়া হাওয়াই চপ্পল নিয়ে ফিরে এল হামিদ। ওপরের দিকে বড় করে লেখা লন্ডন। চপ্পল জোড়া পায়ে গলিয়ে হামিদকে এক গাল হেসে ধন্যবাদ জানাই। সে জবাব দিল, ধন্যবাদ। এরপর আমাকে বসতে বলে হামিদ আবার কোথায় যেন চলে গেল।

অপেক্ষার পালা শেষ হলো রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কিছু মুহূর্ত দিয়ে। আরেকবার ফিরে যাই সেদিনের ডায়েরির লেখনীতে।

দরজায় টোকা দিয়ে হামিদ জানাল, কেউ একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি ছিলেন সম্ভবত একজন মাওলানা (আরবি ও উর্দু ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা অর্জনকারী)। হামিদের মুখে উদ্বেগের ছাপ। লম্বা, শুকনা গড়নের একজন লোক। তাঁর চোখা বাদামি চোখে একটা বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ। ভদ্রলোক কপাল কুঁচকে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আঁচড়ানো দাড়িতে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে হাত বোলাতে বোলাতে কথা শুরু করলেন মাওলানা। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল আমার ধর্ম প্রসঙ্গে। একই সঙ্গে ইসলাম নিয়ে আমার ভাবনা জানতে চাইলেন।

শুকনো মুখে ভয়ে ভয়ে জানালাম, আমি একজন খ্রিষ্টান। কিন্তু তিনি খুব সহজ ভঙ্গিতে আমি খ্রিষ্টানদের কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তা জানতে চান। জবাব দিই, প্রটোস্ট্যান্ট। মাওলানার চেহারায় একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। মনে হচ্ছিল, আমি কোনো পাতা ফাঁদে পা দিয়েছি। আমি বলতে থাকি, ইসলাম একটা চমৎকার ধর্ম। ইসলামের অনুসারীরা যেভাবে তাঁদের বিশ্বাস ও আচার-কর্ম পালন করেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি জানাই, লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পর ইসলাম নিয়ে আরও গভীর পড়াশোনা করব। আরেকবার বাঁকা একটা হাসি দিয়ে তিনি আচমকাই আমাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে চিন্তা হলো, যদি এখন হ্যাঁ বলে দিই, তাহলে আমাকে ভীত ভেবে নিয়ে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হবে। অন্যদিকে এই প্রস্তাব অস্বীকার করলেও আমাকে মেরে ফেলার আশঙ্কা শতভাগ।

খুব ঠান্ডা মাথায় ভদ্রলোককে তাঁর প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিই। সঙ্গে এ-ও জানাই, এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তা আর প্রতিকূল পরিবেশে জীবন পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। মাওলানাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি এবার একটা সুন্দর হাসি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন।

তখনো আমার হৃৎপিণ্ড ধুঁকধুঁক করছিল। হামিদ ফিরে এলে জানতে চাইলাম বাইরের পরিস্থিতি কী রকম। হামিদ জানাল, আমি যেতে পারি, কিন্তু বের হওয়ার আগে যেন বোরকাটা পরে নিই।

এই প্রস্তাবে আমার চোখে পানি চলে এল। আমি বোরকা পরতে অস্বীকৃতি জানালে হামিদ একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার মতামত নিতে চলে যায়। গোয়েন্দা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না।

হামিদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ও আমার দিকে একটা চাদর ছুড়ে মারে। চিৎকার করে চাদরটা আমার গায়ে জড়িয়ে নিতে বলে। বুঝতে পারছিলাম না ও হঠাৎ এত আগ্রাসী হয়ে উঠল কেন। তবে তখন এসব কথায় খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলাম না। মনের মধ্যে শুধু একটাই ভাবনা, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

পিকআপ ট্রাকের সামনে ৪০ জন তালেবান আমাকে অভিবাদন জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ওরা মিষ্টি হাসি দিয়ে বিদায় জানালে আমিও প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানাই। যে দুজন লোককে আমার সঙ্গে বন্দী করা হয়েছিল, তাদের দেখতে পেলেও সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গেলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। লোক দুজনকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাচ্চামেয়েটাও তাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে পিকআপের সামনের আসনে বসে পড়ি। দুজন সশস্ত্র তালেবান আমার সঙ্গী হলো। সঙ্গে যোগ দিলেন জ্ঞানী জ্ঞানী চেহারার সেই গোয়েন্দা কর্মকর্তা। মুহূর্তটা ছিল আবেগঘন। অতি কষ্টে চোখের পানি আটকে রাখি। আব্দুল্লাহও দেখি তার প্রথম ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে বসল। বিদায়।

আব্দুল্লাহ আগে থেকেই ইংরেজি জানত বলে আমার সন্দেহ হলো। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রহস্যময় জাদুর ঘরটা, যেখানে আমি বন্দী ছিলাম, একনজর দেখে নিই। গাড়ি চলতে শুরু করলে অঝোর ধারায় গাল বেয়ে চোখের পানি ঝরতে শুরু করল।

মা, আমি বাড়ি আসছি।

কাবুল পর্যন্ত ছয় ঘণ্টা ধরে যাত্রাটা ছিল নরক যন্ত্রণার। তবে রাস্তার দুই পাশে ছিল চোখ জুড়ানো সবুজ মাইলের পর মাইল সবুজ ফসলের খেত। মাঝেমধ্যে সুন্দর নদী অতিক্রম করে আমাদের গাড়িটা ছুটে চলল। পুরো রাস্তায়ই অসাধারণ সব নৈসর্গিক দৃশ্য, পানির আধার, সুউচ্চ পাহাড়। চোখে

পড়ল অজস্র শিয়ালের গর্ত আর পাহাড়ের অভ্যন্তরের সুড়ঙ্গ। ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে লাগলাম, প্রেসিডেন্ট বুশের আফগানদের শিকড় সমূলে উৎপাটনের হুংকার ছিল ফাঁকা বুলি।

একসময় চারপাশের পরিবেশ হঠাৎ বদলে যায়। পাথরে ভরা প্রান্তর আর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া মাঠের পর মাঠ। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অতিক্রম করছি। পথিমধ্যে সঙ্গের লোকজনের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ও নামাজ আদায় করার জন্য গাড়ি থামানো হলো। কেউ একবারও জানতে চাইল না আমার কোনো প্রয়োজন আছে কি না। অবশ্য আফগানিস্তানের নারীদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। নিজেকে বোঝালাম, এই মেয়ে এখনো সন্ধ্যা নামেনি, সুতরাং তোমার প্রস্রাব চাপার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে আমি ধূমপান করার অনুমতি পেয়েছিলাম। ধন্যবাদ ওদের। আমাকে কয়েক প্যাকেট আফগান সিগারেট দেওয়া হয়েছিল। এখানকার সিগারেটগুলোতে নিকোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি। যাত্রাপথে গাড়ির চালক একবার নেমে এক বান্ডিল আখ খরিদ করে।

আখগুলো ছিল সতেজ। অতি দ্রুত তা শেষ হয়ে যায়। পরে একটা ছিলে রসভরা অংশটুকু একটা কাগজের ব্যাগে ভরে আমাকে দেওয়া হলো। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তবে আফগান নিয়মে ফল খাওয়ার ধরনটাও মজাদার। ফলটার নাম উচ্চারণ করতেই সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। নামটা মোটেই হাস্যকর নয়। মনে করার চেষ্টা করলাম, কোথা থেকে নামটার উৎপত্তি। গাড়িচালক কয়েকটা চুইংগাম বাড়িয়ে দিলে খুশিমনে তা গ্রহণ করি।

আবারও নিকোটিন ধোঁয়া টানছি এবং চুইংগাম চিবুচ্ছি। মা থাকলে নির্ঘাত বকুনি জুটত কপালে। যাত্রার মাঝপথে গাড়িচালক মুখ থেকে চুইংগামের দলা বের করে সামনের উত্তপ্ত ড্যাশ বোর্ডে লাগিয়ে রাখে। এরপর একগাদা ফল মুখে পুরে নেয়। আধা ঘণ্টা পরে চুইংগামের দলাটা আবার মুখে ভরার চেষ্টা করতেই আঠালো চুইংগামটার একটা অংশ স্টিয়ারিং হুইলে আর একটা অংশ চালকের দাড়িতে আটকে যায়। দুই মিনিটের মধ্যে লোকটার মুখ, চোখ, দাড়ি আর হাতে চুইংগামে মাখামাখি হতে দেখে আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

বেচারা গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। শরীর থেকে চুইংগাম ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা দেখে সবাই হাসতে লাগল। হামিদের দেওয়া চাদরটা লোকটার দিকে

বাড়িয়ে ধরি। চাদরটার অন্তত পক্ষে আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার কাছে। কারণ, বাড়ি চলে যাচ্ছি একেবারে। ওই মুহূর্তে এমনই মনে হয়েছিল।

চুইংগাম ছাড়ানো হলে আমরা কাবুলের দিকে পুনরায় চলতে থাকলাম। রাস্তার প্রতি মিটারে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে যেতে থাকে। পুরো সড়ক পাথর আর অসংখ্য খানাখন্দে ভরা। বোমাবর্ষণের ইতিহাস থাকায় সড়কের অধিকাংশ স্থানেই বড় বড় গর্ত হয়ে আছে। এর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কোমরের হাড্ডিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ধুলাময় রাস্তার পাশে উদোম গায়ে আর অবহেলার শরীর নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট ছোট রুক্ষ হাতে এসব খানাখন্দ ভরাট করে দুটো পয়সা পাওয়ার চেষ্টা। এসব বাচ্চার বাড়ি কোথায়, এ সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পেলাম না।

যেতে যেতে বেশ কয়েকটা গ্রামও অতিক্রম করতে হলো। গ্রামের ঘরগুলো মাটির তৈরি একতলা। দৃশ্যটা অনেকটা ছোটদের চিত্রিত বাইবেলে আঁকা ঘরগুলোর মতো। তবে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত অনেকগুলো গ্রামও চোখে পড়ে, যেন প্রস্তর যুগের ভুতুড়ে কোনো দৃশ্য। মনে হলো, প্রাচীন যুগে ফিরে গেছি। মনে পড়ল, কেউ একবার বলেছিল, তালেবানদের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর প্রথম বসতি স্থাপনের যুগে ফেরত যাওয়া।

তালেবানদের প্রকৃত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্মম ও একরোখা প্রচেষ্টা আমার কাছে শুধুই অবুঝ পাগলামি। আমার বেড়ে ওঠা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে, টেলিফোনে কান পেতে। গরম-ঠান্ডা জলে গোসল করে সতেজ হই। নাচ-গানের আনন্দ তো আছেই।

ভাঙা রাস্তায় এক ঘণ্টা অতিক্রম করার পর জানের হাতকড়া খুলে নিয়ে ওকে গাড়ির পেছনের আসনে জ্ঞানী জ্ঞানী চেহারার গোয়েন্দা অফিসারের পাশে বসানো হলো। আমার গায়ে আলতো আঘাত করে জান আস্তে আস্তে জানাল, চিন্তার কিছু নেই। ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আমার।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ধমকের সুরে বলি, তোমাকে আমি চিনি না। আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টার ফল ভালো হবে না। এক মিনিট পরে বাঁকা চাহনিতে দেখতে পেলাম, গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানকে ইশারা করছেন। জান আবার বলতে থাকে, 'তোমার মেয়ে কেমন আছে? ওর কোনো ছবি আছে তোমার কাছে?' জানকে ডেইজির একটা ছবি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব তো পাকিস্তানে পাশার কাছে রেখে এসেছি। সন্দেহের গন্ধ পেয়ে বুদ্ধি

খাটিয়ে উত্তর দিলাম, তোমার কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। বিরক্ত করা বন্ধ করো।

আমরা এরপর নীরবতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। জানকে আরও কয়েকবার ইশারা করা হয়। আমার কানে একটা কথাই শুনতে পেলাম, তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

ব্যস, এ পর্যন্তই। আমি হাত উঁচু করে চিৎকার করতে থাকি, ট্রাক থামাও। প্রয়োজনে আমি কাবুল পর্যন্ত হেঁটে যাব।

আধা ঘণ্টা পর গাড়ি থামিয়ে জানকে পেছনে নিয়ে পুনরায় বেঁধে রাখা হলো। কষ্ট হলেও কিছুই করার নেই। যে গল্পটা শুরু থেকে বলে এসেছি, সেই গল্পের দৃশ্যপট বদলানোর কোনো সুযোগ নেই। যতটুক জেনেছি, তারা সবকিছু স্বীকার করেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।

আফগানিস্তানের প্রকৃতি এখানকার অধিবাসীদের মতোই ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। পাথুরে মাটি পেরিয়ে আমরা আবার সবুজের মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়লাম। আফগানিরা অসাধারণ দয়ালু ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। কিন্তু এদের মন নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যে রূপ নিতে এক মিনিটও সময় লাগে না।

কাবুল যখন পৌঁছাই, তখন সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারে কিছুই আলাদা করে চেনার জো নেই। এটা নিশ্চয়ই কোনো রাজধানী নয়। আমি হন্যে হয়ে বিমানবন্দর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমাদের গাড়ি গিয়ে থামল একটা বিশাল অট্টালিকার পাশে। কোনো সরকারি অফিস হবে হয়তো। গোয়েন্দা অফিসার ভেতরে প্রবেশ করলেন। ১০ মিনিট পর ফিরে এসে গাড়িচালককে কিছু একটা বললেন।

গাড়ি পুনরায় আরও পাঁচ মিনিট চলার পর একটা দুর্গসমেত অবকাঠামোর সামনে এসে দাঁড়াল। কাবুল জেলখানার সন্ত্রাসী সেল। তালেবানদের হাতে বন্দী থাকাকালে বিভিন্ন সময় আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। এই মুহূর্তটা সেসবের মধ্যে অন্যতম।

আমাকে একটা ভাঙাচোরা গেট দিয়ে একটা চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে একটা অন্ধকার করিডোর ধরে হেঁটে শেষ প্রান্তে আরেকটা করিডোরের মাথায় গিয়ে পৌঁছাই। একটা দেড় মিটার উঁচু ভারী ধাতব দরজা ঠেলে কালো পাগড়ি মাথায় একজন ভেতরে ঢুকলেন। তিনি ছিলেন কারা পরিচালক।

কৌতূহলবশত আমি ভেতরে উঁকি দিলাম। দুজন নারী হাঁটু ভেঙে বসে আছে। একটা শীর্ণকায় বাচ্চা তারস্বরে কেঁদেই যাচ্ছে। আমি কারা পরিদর্শক ও গোয়েন্দা অফিসারের দিকে ফিরে তাকাতেই তাঁরা আমাকে ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন।

তোমরা নিশ্চয় তামাশা করছ। আমি ভেতরে যাচ্ছি না। বরং রেড ক্রিসেন্টের বিমানে করে বাড়ি যাব। আমি একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক এবং আমার সঙ্গে এহেন আচরণ কাম্য নয়। বাড়ি গিয়ে আমি তোমার এবং তোমার সম্পর্কে লেখালেখি করব। এই বলে আমি আঙুল তুলে তাদের দুজনের দিকেই নির্দেশ করলাম।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে লাগল। আমি বলেই চললাম, আমাকে কোনো আবাসিক হোটেলে রেখে আসো। আমার পত্রিকা অফিস থেকে এর ব্যয় সরবরাহ করা হবে। মোটেই অস্বাভাবিক কোনো কথা বলছি না। তোমরা জারজ মিথ্যাবাদীর দল। বলেছিলে আমাকে বাড়ি পাঠানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছ।

যে দুজন লোক এত দিন ধরে ইংরেজি না বোঝার ভান করেছিল, তারা এবার খুব সুন্দর করেই আমার আকুতি বুঝতে সক্ষম হয়। অনেকবার আমাকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলার অপচেষ্টা কিছুটা সফল হচ্ছে দেখে গোয়েন্দা অফিসার পৈশাচিক খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুন্দর অনর্গল ইংরেজিতে বলে চলল, এটা আফগানিস্তান। তুমি নিয়ম ভেঙে অবৈধভাব প্রবেশ করেছ। এটাই তোমার ঠিকানা।

আমি একই সঙ্গে ভয় পেয়ে যাই ও রাগান্বিত ভাব দেখাতে শুরু করি। এমন পরিস্থিতিতে একসঙ্গে রাগ আর ক্রোধের সম্মিলনে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা বুঝতে পারছ না কেন? আমি একজন সভ্য দেশের বাসিন্দা। আমি ব্রিটিশ নাগরিক। তোমরা আমার সঙ্গে এমন করতে পারো না।

এমন সময় পাশের একটা কারাঘর খুলে ছয়জন নারী বাইরে কী ঘটছে, তা দেখতে উঁকি দিল। ঘন কালো চুল ও চশমা পরিহিত একজন জিজ্ঞেস করে বসে, আমি কি রেডক্রস থেকে এসেছি?

তখনো আমি ক্রোধে ফুঁসছিলাম। ঘুরে গিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকি, অবশ্যই আমি রেডক্রস নই, বরং ক্রস পরিহিত। কিন্তু তুমি কি

ইংরেজিতে কথা বলতে পারো এবং...? আমি বাক্যটা শেষ করতে পারিনি। অবাক না হয়ে পারছিলাম না।

মেয়েটা বিস্ময়ের পর বিস্ময় উপহার দিয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ, আমি অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। এই তিনজন জার্মান নাগরিক। বাকি দুজন আমেরিকার অধিবাসী। হঠাৎ করে তালেবানদের উপস্থিতি ভুলে বসি। মনে পড়ে গেল, এরাই সেই খ্রিষ্টান দল। কিন্তু আমি তো জানতাম, তাঁদের সবাইকে হোটেলকক্ষে রাখা হয়েছে। টেলিভিশন, কম্পিউটার, ভিডিও গেমস সজ্জিত।

কথা শেষ হলে চারদিকে একটা হাসির রোল পড়ে গেল। মেয়েটা বলতে থাকে, তারা সবাই জার্মানভিত্তিক দাতব্য সংস্থা শেলটারের কর্মী। সংস্থাটি তখন আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা নামে কার্যক্রম চালাচ্ছিল। এদের আরও দুজন পুরুষ সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার করা হয় মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানানোর অভিযোগে। আমি জানতে চাইলাম, তারা পশতু ভাষা জানে কি না। মোটামুটি সবাই পশতু ভাষা বুঝতে সক্ষম। অবাক করা ব্যাপার। আমি ওদের অনুরোধ করি, যেন এই তালেবানদের বুঝিয়ে বলে, এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে যেন একটা হোটেলকক্ষে রেখে আসা হয়। অথবা কপালে ঝুলে থাকা শাস্তি দিয়ে দেয়।

কেথি নামের জার্মান একটা মেয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও খুব সম্ভব আমার কথাই ধীর গলায় নিচু স্বরে তালেবান দুজনকে শোনাল। তালেবান দুজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ডায়ানা নামের অস্ট্রেলিয়ান মেয়েটা আমাকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রস্তাব দেয়। সকালবেলা নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা করা হবে। মেয়েগুলো আমাকে দুশ্চিন্তা না করতে বলে।

আমি মনের সাধ মিটিয়ে দুজন তালেবানকে গালি দিয়ে মেয়েগুলোর কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষটা ছিল ৭ মিটার দীর্ঘ ও ৫ মিটার প্রস্থ। বসে বসে কিছুক্ষণ উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করলাম। একটা সিগারেট ধরাতে চাইলে ওরা সবাই নিষেধ করল। হায়রে খ্রিষ্টান বন্ধুত্বের কী অসাধারণ প্রতিফলন! ওরা যা-ই ভাবুক, কিছুক্ষণ পরে ধূমপান করব বলে জানিয়ে কথা বলতে লাগলাম ওদের সঙ্গে।

সাত দিন ধরে আমি কোনো নারীর সাক্ষাৎ পাইনি। এবং কারও সঙ্গে অনর্গল কথা বলার সুযোগ পাইনি। এতগুলো মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল

আনন্দঘন একটা ব্যাপার। মনের দুশ্চিন্তা কমানোর উপশম। আমি ওদের জানাই যে, বোকার মতো রাগ দেখিয়ে আমি ওদের সামনে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছি এবং সবকিছু বলে দিয়েছি।

আমার টানা সাত দিন অনশনের কথা শুনে ওরা জানায়, ২০ দিন পর্যন্ত অনশন করতে হয়েছে তাদের।

মেয়েটার মুখে অনশন ও ২০ দিন শব্দটা শুনে আমার নিজেকে অক্ষম মনে হতে লাগল। তাই ঠিক করলাম, শুরু করব নোংরা আন্দোলন। মুক্তি দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি গোসল করব না।

'নো, তুমি এমন করবে না।' ডায়ানা আমার কথায় হেসে দিল। এই রকম আবদ্ধ ঘরে একজন দুর্গন্ধযুক্ত মানুষই যথেষ্ট। কথায় ছিল স্পষ্ট নির্দেশ কিন্তু একটা আন্তরিক ভঙ্গি। বলতে বলতে ডায়ানা হেনরির দিকে দেখিয়ে দিল। মেয়েটা আমেরিকার অধিবাসী। বুঝতে পারলাম, ও এই ছোট দলের নেতা।

মেয়েগুলো তাদের সন্ধ্যাকালীন বিশেষ আলোচনা শুরু করলে আমিও একটু নিকোটিন পোড়াতে পাশের চত্বরটায় চলে আসি। আকাশে অনেক তারা জ্বলজ্বল করছে। নাহ্, স্যাটেলাইটটা আর দেখা যাচ্ছে না।

আমার কাছে অবশিষ্ট থাকা তিনটা সিগারেটই একের পর এক জ্বালিয়ে জালালাবাদের লোকটাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। লোকটা পুরো পথেই আমার সঙ্গে বোনের মতো ব্যবহার করেছে। অথচ, এরা নিশ্চয়ই জানত, আমাকে এখানে নিয়ে আসা হবে শেষমেশ।

তারা মিথ্যার পর মিথ্যা বলেই চলছিল। আমি যখন তাদের দেওয়া মুক্তির আশ্বাস বিশ্বাস করতে শুরু করেছি মাত্র, তখনই বদমাশের দল আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। এমন সময় কারাঘর থেকে খুব সুন্দর সংগীত ভেসে এল। কী আশ্চর্য, মেয়েগুলো গান গাইছে। কাবুল জেলখানায় মুহূর্তটা তখন অন্য রকম লাগছিল। অপার্থিব একটা সময়।

ঘরটাতে ফিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে সময় কাটাই। মেয়েটাকে জানাই, আমার পরিকল্পনা ছিল একজন নরকবন্দি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। যতটা খারাপ ব্যবহার করা যায়, ওদের সঙ্গে আমি তা-ই করব। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর আগের ভাবনা থেকে সরে আসি। মেয়েগুলোর সঙ্গ ভালো লাগতে শুরু করেছিল। আমি আলাদা

একটা ঘরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এই মেয়েগুলোর ওপর আমার খারাপ আচরণের কোনো প্রভাব পড়তে দেওয়া যাবে না।

তারা আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। রাগ একটু পর এমনিতেই কমে যাবে। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয় রাগ প্রশমিত করা। এর ফলে তালেবানরা আমার কঠিন মানসিকতা ভেঙে পড়ছে বলে মনে করবে। একজন মানসিকভাবে দুর্বল মানুষ খুব সহজেই নিয়তিকে মেনে নেয়, যা আমি হতে দিতে পারি না। আমার ব্যাখ্যাটা হয়তো সম্পূর্ণ পাগলের প্রলাপের মতো শোনাল।

ডায়ানা আমার কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। হয়তো সে-ও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে এর আগে অথবা শুনেছে কোথাও। ও আমার জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে নিউক্যাসলের কথা উল্লেখ করি। ডায়ানার এক বান্ধবীও ডারহাম কাউন্টির অধিবাসী।

চিন্তা কোরো না। বাড়ি যাওয়ার পরে ওর বান্ধবীকে খুঁজে বের করে তোমার কাছে চিঠি পাঠাতে বলব। আমি বলতে থাকি, বাহ্, কী প্রশান্তিময় চিন্তা! আমি তাহলে বাড়ি যাচ্ছি।

বাথরুমে যেতে চাইলে ওরা একটা সরু জায়গা দেখিয়ে দিল।

সাবধানে পানি ঢালতে হবে। ডায়ানা জানাল, মাঝেমধ্যেই ড্রেনের পাইপ আটকে যায়। এখানে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ব্যবহৃত টিস্যু রাখতে হয়। বাহ্, কী ভাগ্য আমার। ফ্ল্যাশ টয়লেট নেই। তবু এই জায়গাটা অনেক পরিষ্কার। ভাবতে লাগলাম, ভাগ্যে কি এর থেকেও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে কি না, কে জানে।

ঘরে ফিরে এসে একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। এখানে রাতের বেলা পরার জন্য আলাদা কোনো পোশাক নেই। সারা দিন যে পোশাক পরতে হয়, তা পরেই বিছানায় গা এলিয়ে দাও, এই ভালো। বন্দী হওয়ার পর থেকে তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সুযোগ মেলেনি। জালালাবাদে থাকাকালে একটা চাদর দিয়ে গা মুছতাম।

আব্দুল্লাহ্ বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত, যতক্ষণ না আমার গোসল শেষ হচ্ছে। ব্যাপারটা বিরক্তিকর হলেও লোকটার ধৈর্য ছিল। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হতো বাথরুমটা একটু পরিষ্কার করি। তবে ব্লিচিং পাউডার বা এ-জাতীয় কোনো পরিষ্কারক চোখে দেখিনি কখনো। মনে মনে ভাবতাম,

তারা কি চায় না মেয়েরা কাজ করুক? একবার সুযোগ পেলে হাঁটু গেড়ে বাথরুম ঘষে মেজে পরিষ্কার করে ওদের দেখিয়ে দিতাম কাজ কাকে বলে!

সেদিন ঘুমের মধ্যে নিশ্চুপে অঝোর ধারায় কেঁদেছি। জালালাবাদের লোকগুলো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। যখন গোয়েন্দা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন হতচ্ছাড়ার দল নিশ্চয় আমার পেছন পেছন হাসছিল। সিদ্ধান্ত নিলাম খারাবির একটা শেষ দেখিয়ে ছাড়ব ওদের। তালেবানদের আস্পর্ধা বেড়েছে বহুগুণ।

মনে পড়ে, তখন ভেবেছিলাম, একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনা ধরে এগোতে চাচ্ছি। কিন্তু একবার যদি বর্তমান পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করি, তাহলে এই নোংরা গর্তে আরও কয়েক বছর কাটাতে হবে।

কাবুল কারাগারের সকালটা শুরু হলো খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে। চোখ খুলে দেখি, কাঠের ছাদের নিচে শুয়ে আছি। ক্ষণিকের জন্য মতিভ্রম হলো, যেন অবকাশ যাপনে স্কি লজে এসেছি। এতটাই খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম, সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল ডেইজির সঙ্গে কোথাও ছুটি কাটাতে এসেছি। বর্তমান পরিস্থিতিকে মনে হচ্ছিল নির্ঘাত রাতের বেলা দেখা একটা দুঃস্বপ্ন।

উঠে বসতেই পিঠটা মট করে উঠল। জার্মান মেয়ে তিনটা মেঝেতে তোশকের ওপর তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাকি মেয়ে তিনটা আমার পেছনে অপ্রশস্ত একটা খাটে শোয়া। না, এটা কল্পনা নয়, বরং একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন।

আমি এখন কাবুল জেলের একজন বন্দিনী।

বসে বসে বিগত দিনের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করি। শুক্রবার, ৫ অক্টোবর। আমার দুর্ভাগ্যের গাধার পিঠে যাত্রার এক সপ্তাহ পার হলো। কেথি নামের জার্মান মেয়েটাই প্রথম নড়েচড়ে বসল। ওর একটা ডাকনামও ছিল। জেলিনেক, পরে জেনেছিলাম অবশ্য। গোসল করার ইচ্ছা আছে কি না জানতে চাইল জেলিনেক। বাহ্, কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে। আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাস দেখে ও মুচকি হেসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল গোসল বিলাসিতার উদ্দেশ্যে।

চত্বরে একটা পুরোনো জং ধরা জিঙ্কের পানির আধার। সেখান থেকে বালতিতে পানি সংগ্রহ করতে হয়। আমি সরলভাবে জানতে চাই, গরম

পানির ব্যবস্থা আছে তো? জবাবে কেথির মুখ বাঁকানো হাসিতে উত্তরটা পেয়ে যাই।

ঠান্ডা পানির বালতিটা টেনে নিয়ে গেলাম করিডোর ধরে। খোলা জায়গাটার এক কোনায় একটা ছাউনির মতো আছে। সেখানেই একটা রড বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। বিশ্বের অন্য যেকোনো জায়গায় এই ব্যবস্থাটা বিপজ্জনক বলে গণ্য হবে।

আধা ঘণ্টা পরে পানি গরম হলে পুনরায় বালতিটা টেনে বাথরুমে নিয়ে যাই। ব্যাগ থেকে সাবান আর টুথব্রাশটাও বের করে আনি। চায়নিজ একটা টুথপেস্ট আমাকে প্রথম দিন দেওয়া হয়েছিল। সেটাও টেনে বের করি।

গায়ের সব পোশাক খুলে স্যান্ডেল পায়ে শরীরের প্রতিটি অংশে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে শুরু করি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে সাবানের মধ্যেই রেজর ব্লেডটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কী ভয়ংকর!

আরেকটু হলেই নিজের কত বড় ক্ষতি করে ফেলতাম, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্লেডটা টেনে বের করতেই মনে হলো, তালেবানদের চাইতেও আমি নিজেই নিজের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারি।

মেয়েদের দেওয়া একটা নীল তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব পানি মুছে ফেলি।

ততক্ষণে আমেরিকান হেথার মার্সার, ডায়ানা কারি, পাগলা অস্ট্রেলিয়ান ডায়ানা যার ডাকনাম থমাস ও বাকি দুজন জার্মান স্লাইক ডার্কফ এবং মারগ্রিট স্টেবনারের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। আমি জিনিসপত্র বের করতেই ওদের একজন জানতে চাইল, আমাকে বিয়ের ড্রেস কিনে দেওয়া হয়েছে কোন দুঃখে? আমি সাদা শিফন আর সোনালির কারুকাজে মিশ্রিত পোশাকটার দিকে তাকিয়ে হেসে দিই। এক ইমাম সাহেব যে আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে গল্প শোনাই ওদের। সম্ভবত, আমার জন্য একজন স্বামীও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে, তাহলে নির্ঘাত এই দেশের কোনো এক হতভাগা পুরুষের কপাল পুড়েছে।

আমার তিনটি বিয়ের কথা শুনে মেয়েগুলো ভিরমি খেল। খোদা জানে, চতুর্থ জনের জন্য কি অপেক্ষা করছে। এই রকম দুরবস্থার মধ্যেই কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে মজা হলো। জালালাবাদেও আমাকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে

হয়েছিল। মাঝেমধ্যে বন্দিত্বের দুঃসহ পরিস্থিতি এমন মুহূর্ত ক্ষণিকের জন্য হলেও মনটাকে সতেজ করে তুলত।

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন বন্দী হওয়ার পরিকল্পনার কথা ওদের জানালে ওরা আমাকে আরও সাবধান হতে অনুরোধ করে।

ডায়ানা একজন প্রশিক্ষিত সেবিকা। আমি ওকে হাতে ওঠা কিছু ফুসকুড়ি দেখাই। বন্দী হওয়ার পর এগুলো দেখা দিয়েছে। ও জানাল, চর্মরোগ অথবা ছারপোকার কামড় অথবা তীব্র গরমে এদের উৎপত্তি।

বেচারা কেথি মাথায় করে আগের জেলখানা থেকে উকুন নিয়ে এসেছে। বিষয়টা কিছুটা ভয়ংকর। এখানে সবারই কমবেশি চুলকানি হচ্ছে। আছে ইঁদুরের উৎপাত, সেই সঙ্গে বিষাক্ত বৃশ্চিকের কামড় খাওয়ার ভয়। বৃশ্চিকের কথা শুনে আমার আত্মারামা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়।

আমার আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল, যখন জানলাম মেয়েগুলোকে নিয়মিত বৈদ্যুতিক তার দিয়ে চাবকানো হয়। তবে এখন পর্যন্ত কারও ওপর ব্যক্তিগত নির্যাতন করা হয়নি।

এখানকার জেলকর্মীদের আচার-ব্যবহার যথেষ্ট আন্তরিক এবং এখন পর্যন্ত কারও কোনো ক্ষতি করেনি তারা।

আরেকটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ডায়ানা জানাল, দীর্ঘদিন অন্তর্বাস পরে থাকার দরুন গরমে চুলকানি সৃষ্টি হয়েছে। আফগানিস্তান আসার পর থেকে কোনো দিনই শান্তিমতো বাথরুম করার সুযোগ মেলেনি। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য সারানোর কোনো ওষুধ আছে কি না জানতে চাইলাম। একটা কাবার্ডে ওরা জমিয়ে রেখেছিল কিছু কিছু ওষুধ।

ও জানাল, দীর্ঘদিন ধরে অনশন করার কারণে আমার খাদ্যনালিতে কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

যা-ই হোক, আফগানিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা শুরুর আগে হোটেলে বুফেতে ইচ্ছেমতো খেয়েছিলাম। মনে পড়ে, মজা করে হোটেল ম্যানেজারকে বলেছিলাম, পরবর্তী খাবার কোথায় বসে খাব জানি না। তখন সেটা নিছক মজা হলেও এখন কী কঠিন বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ডায়ানা আমাকে আমেরিকান দূতাবাস থেকে দেওয়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণের একটা পানীয় অথবা মলদ্বারে সাপোজিটরি ব্যবহারের প্রস্তাব করে। জেলখানায় বসে কী অদ্ভুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শেষমেশ

সাপোজিটরি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, এটা আমার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু রেচক তরল, বাপরে বাপ, কে জানে আবার যদি দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় এবং তখনই বাথরুম পেয়ে বসে।

মারগ্রিট বলল, বউ সেজে সারাক্ষণ হাঁটাচলা করার কোনো মানে হয় না। একটা নেভি ব্লু রঙের পাজামা আর রং মিলিয়ে জামা পেলাম ওর কাছ থেকে। বেশ ভালোমতোই এটা সেঁটে গেল গায়ে। কাপড়টা বদলে নেওয়ার পর গায়ের সব পোশাক ও বাদামি রঙের ড্রেসটা ধোয়ার জন্য জিঙ্কের বালতির কাছে চলে যাই। অনেক দিন পর একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কিছু একটা কাজ পেলাম। প্রথম দিকে এতে নতুনত্ব থাকলেও কয়েক দিন এভাবে চললে নিশ্চিত আমি বিরক্ত হয়ে পড়ব।

পোশাকগুলো চত্বরে টানানো তারে ঝুলিয়ে দিলাম। ডায়ানা অন্তর্বাসগুলো ঢেকে নাড়ার জন্য সতর্ক করে দিল। তালেবানরা এই চত্বরে সর্বদা কড়া নজরদারি করে। এবং মেয়েদের কেউ সেখানে গেলে তাদের গতিবিধি সুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাই খোলা হাওয়ায় তারে ঝোলানো অন্তর্বাস তালবানদের মেজাজ বিগড়ে দিতে পারে। তবে তা-ই হোক, আমিও জবাব দিলাম। এবং ঘাড় ত্যাড়ামির যে পরিকল্পনা করেছিলাম, সেই অনুসারে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করলাম।

সেদিন মেয়েগুলোর সঙ্গে একজন আইনজীবীর দেখা হওয়ার কথা ছিল। সবাই বাইরের পৃথিবী দেখার আকুতি জানিয়ে তার উদ্দেশে চিঠি লিখতে শুরু করল। ব্যথাতুর হৃদয়ে আমার কর্মক্ষেত্রের সম্পাদক জিম মুরের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখলাম পাকিস্তানি আইনজীবী তা পৌঁছে দেবে এই আশায়। শেষ বাক্যটা ছিল এ রকম, জিম, এখানে নরক যন্ত্রণার মধ্যে দিনাতিপাত করছি। সাহায্য করো।

হতাশা থেকে বেপরোয়া ভাব দেখাতে আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমার সহকর্মীদের অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় ভোগানোর কোনো ইচ্ছাও ছিল না আমার। কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি, যেন নরকের চোরা গর্তে আটকা পড়ে গেছি। বড় বড় অক্ষরে কল্পনায় হিজিবিজি করে বারবার লিখছি, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও।

দুর্ভাগ্যবশত লোকটা ছিল গোড়া আইনজীবী। আমার চিঠিটা পৌঁছে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। আইন নিয়ে সতর্ক লোকটা জানাল, কাবুলে আমাকে দেখতে পেয়ে সে যারপরনাই খুশি হয়েছে। সবাই নাকি জানে আমি

জালালাবাদেই অবস্থান করছি। আমাকে দেখতে অচিরেই নাকি অনেকে আসবে। একই আশ্বাস আবার শুনতে পেয়ে আমি রাগে গড়গড় করতে লাগলাম। লন্ডনের একজন ভালো আইনজীবীর খুব দরকার এখন। আইনের ফাঁকা বুলি কপচানো কেউ নয়।

আমার বক্তব্যে একটু অসন্তুষ্ট হলেও লোকটা নিশ্চিত আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। ততক্ষণে ছয়টা মেয়ে আর তাদের দুজন পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলার জন্য লোকটা একটা গারদের ভেতর প্রবেশ করেছে। পুরুষ সহকর্মী দুজন হলেন জর্জ টাবম্যান ও পিটার মাঞ্চ। যথাক্রমে জার্মান ও আমেরিকান নাগরিক। এই দুজনকে আলাদা কক্ষে আটক রাখা হলেও আইনজীবীর সঙ্গে বৈঠকের সময় তাদের একত্র হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো।

ওরা বৈঠকে বসলে আমি চত্বরে হাঁটাহাঁটি করতে থাকি। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বোঝার চেষ্টা করি মনে মনে। দেয়ালের চারদিকে ঘুরে লুকিয়ে লুকিয়ে লাথি মেরে চেষ্টা করি এর স্থায়িত্ব বোঝার। কোনো ফাঁকা স্থান বা দুর্বল অংশ তো থাকতেই পারে। এমন মুহূর্তে সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়ে হিথার হন্তদন্ত হয়ে চত্বরে ছুটে এল। ওর চেহারায় রাজ্যের মেঘ। ২৪ বছরের মেয়েটা দুম করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

আমি কিছু না বলে চুপ করে সরে আসি সেখান থেকে। কান্নাকাটির সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ একা থাকতে চায়। পিটারকে দেখলাম এদিকে এগিয়ে আসতে। এসেই মেয়েটাকে কঠোর ভাষায় সংযত হতে বলে ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। হায়রে পুরুষ মানুষ, কবে তোমরা বুঝবে কাঁদতে থাকলে মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে হয় না।

এহেন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করাটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়। আমি বললাম, মেয়েটাকে কাঁদতে দেওয়া হোক। এর ফলে কিছুটা হলেও ওর কষ্ট লাঘব হবে। পিটার পাকিস্তান ফিরে যাচ্ছে শুনে মেয়েটা সাংঘাতিকভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে চাইছিল সবার সঙ্গে পিটার কাবুলেই থাকুক। তার ধারণা, ছেলেটা নিশ্চয় এখানে হামলা হবে ভেবে ভয় পেয়ে গেছে।

অসি লোকটা জানাল, সবকিছুই ফাঁকা বুলি মাত্র। কোনো হামলা-টামলা হবে না। আমি বলতে থাকি, হামলা শুরু হয়ে গেলে তখন যদি বলে কোনো উপায় থাকবে না। অবশ্যই এখানকার মাটিতে বোমা পড়বে এবং সবার উচিত নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়া। সীমান্তের বাইরে পাকিস্তানে তিন

হাজার সাংবাদিক অপেক্ষা করছে। কিন্তু সম্পাদকেরা তাদের আহত হওয়ার ভয়ে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দিচ্ছে না।

ছেলেটার তাকানো দেখে মনে হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ধীরস্থির ভঙ্গিতে বলতে থাকি, মাত্র এক সপ্তাহ আগেও আমি বাইরের দুনিয়ায় বিচরণ করে এসেছি। অন্যদিকে তোমরা আড়াই মাস ধরে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী। সামরিক সাজসজ্জা আমি নিজ চোখেই দেখেছি। মোটেও আমার অলক্ষুনে কথা বলার ইচ্ছে নেই। তবে বাস্তব ধারণা থেকেই বলছি, বোমা হামলা হতে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই।

ছেলেটা স্বভাবতই আমার কথা মানতে পারল না। মেজাজ বিগড়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। আমি হিথারকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ওর চোখের পানি মুছে দিয়ে শুনিয়ে দিলাম, গত রাতে আমার নিঃশব্দে কান্নার ঘটনাও। চোখে পানি আসাটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

পরে কারা পরিচালক এসে তাদের আইনি বৈঠকে যোগ দেন। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমার কথা উল্লেখ করে কোনো চিঠি লেখা হয়ে থাকলে তা পুনরায় নতুন করে লিখতে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কোনো লিখিত কাগজে আমার উপস্থিতির দলিল থাকতে পারবে না। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। আমাকে লুকিয়ে রাখতে চাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য কী?

আমি ভেতরে প্রবেশ করে জানতে চাই, সবকিছু ঠিক আছে কি না? কিন্তু সবাইকে কেমন ঠান্ডা আবেগহীন বলে মনে হলো। জার্মান জর্জ টাউবম্যান, যিনি কিনা আফগানিস্তানের ত্রাণ কমিটির প্রধান ছিলেন, আমাকে সবকিছু সহজভাবে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর মতে, আমার কাঠিন্য আর গোয়ার্তুমি দিয়ে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে না।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মনে হচ্ছিল, লোকটা তালেবানদের দয়া-দাক্ষিণ্য পাচ্ছে। আর তাকে চিনিও না। আমি বললাম, তুমি নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুশি থাকলেও আমি নই। এই বন্দিত্বের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেই যাব। এখানে যদি বন্দী থাকতেই হয়, তাহলে প্রতিদিন আমি ওদের নরক যন্ত্রণা দিয়ে ছাড়ব। সতর্ক না থাকলে তুমিও একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। একসময় বন্দিকারীদের প্রতি তোমার মায়া জন্মে যাবে। অচিরেই তোমার মতো অবিবেচক লোকজন স্টকহোম সিনড্রোমে আক্রান্ত হবে।

দেখলাম, আমার কথা বলার ধরন মোটেই পছন্দ হয়নি মেয়েদের। লোকটা হয়তো ভালো মানুষ। কিন্তু আমার সঙ্গে ভুল বিষয়ে তর্ক করেছে, যেমন করেছিল অসি ছেলেটা।

হিথার চত্বরে এল। ওর হাতে একটা পাকিস্তানি কাগজ। এতে লেখা হয়েছে, তালেবানদের মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, আমি বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য। ব্যাপারটা যতই মারাত্মক হোক না কেন, হাসি পেল আমার। মেয়েগুলো উঠে চলে যেতেই পাকিস্তানি আইনজীবী আমার দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না করল। আমি শুধু বললাম, দ্রুত আমার অফিসকে জানানোর ব্যবস্থা করো। একজন শক্তপোক্ত আইনজীবী প্রয়োজন আমার। লোকটা একবার আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। আমি আবার চিৎকার করে বললাম, যা-ই হোক, আমি দুশ্চিন্তা করছি না! কেন করব? আমি তো এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিই।

সেদিন ছিল শুক্রবার। তাই আমার পক্ষে সেদিন কাবুল ছাড়ার সম্ভাবনা ছিল না। মেয়েরা জানিয়েছিল, শুক্রবার মুসলমানদের পবিত্র ছুটির দিন। এদিন সবকিছুই বন্ধ থাকে।

পরের দিন থেকে চত্বরে গিয়ে ইয়োগা অনুশীলন করতে শুরু করি। ভাঙা গেটটা খুলে দিয়ে জ্ঞানী জ্ঞানী চেহারার সেই গোয়েন্দা অফিসার প্রবেশ করলেন। এই লোকটা জালালাবাদ থেকে আমার যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। খুব শিগগির আমার মুক্তির ফরমান ঘোষণা হতে যাচ্ছে। আমি শুধু একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। এই বদমাশদের ওপর আমার আর একটুও বিশ্বাস নেই। অন্তত আমার সঙ্গে যে ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে, তারপর বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কাবুলের বন্দিশালায় প্রথম রাতের প্রহরে নিঃশব্দে আমার চোখ দিয়ে যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরেছে, তার জন্যও এরাই দায়ী। তবে সেটাই শেষ। আমার মূল্যবান অশ্রু ঝরানোর পরবর্তী সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

পায়চারি করতে করতে কারা পরিচালক এলেন এবং আমার নাম জিজ্ঞেস করে হাতে একটা নিবন্ধন ফরম ধরিয়ে দিতে চাইলেন। আমি সেদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে নিজ কক্ষে ঢুকে পড়ি। পরিচালক মেয়েদের জানালেন, নিবন্ধন ফরম পূরণ না করলে আমার জন্য কোনো খাবার বরাদ্দ করা সম্ভব হবে না। জবাবে আমি মেয়েগুলোকে

পশতুতে বুঝিয়ে বলতে বলি, খাবারের কোনো দরকার নেই। আমি অনশন করছি। আর উনি যদি আমার নাম জেনে না থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর ভুল, আমার নয়। এখন তিনি বিদায় নিলেই আমি খুশি হই। কারণ, তাঁর প্রতিটা প্রশ্নই আমাকে বিরক্ত করছে।

মেয়েগুলো কথা বলার সময় আমি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, তাঁর চেহারা ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। চলে যাওয়ার আগে ব্যাটা চিৎকার করে কিছু একটা বলে গেল। মেয়েগুলো ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল। জানতে চাইলাম, কী বলেছে লোকটা? কিছুক্ষণ পরে ডায়ানা কানে কানে বলল, লোকটা আমার মৃত্যু কামনা করেছে। আমি এক গাল হেসে দিয়ে সবাইকে আমার ব্যাপারে একদম নিশ্চিত থাকতে বলি। তবে অনুভব করলাম, গলার কাছে কিছু একটা এসে আটকে আছে। মনটাকে শান্ত করতে একটা সিগারেতে আগুন ধরাই।

পরে আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা নিয়ে কমবেশি কথা হতে লাগল। হিথার জানাল, এক কানাডিয়ান স্বেচ্ছাসেবক তার সঙ্গে জায়গা অদলবদল করতে চেয়েছিল। লোকটাকে হিথার চেনে না, তবে কত সুন্দর মানসিকতা আমারও মনে পড়ে গেল, জালালাবাদে থাকাকালে তালেবানরাও লন্ডনে বন্দী কারও সঙ্গে আমাকে বন্দিবিনিময় করতে চেয়েছিল।

গত সপ্তাহে জেরা চলাকালে কোনো এক সময় আমাকে এ কথা জানানো হয়েছিল। দিনটা ছিল অদ্ভুত এবং এত এত স্মৃতিতে ভরা যে আমি টুথপেস্টের বক্সের অপর পৃষ্ঠায় সব কথা লেখার সুযোগই পাইনি।

জেরা চলাকালে একজন লোক প্রবেশ করলে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। ভদ্রলোক এসে সবার সঙ্গে হাত মেলালেন। পরে শুনেছি, তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর কমান্ডার। যা-ই হোক, সেদিন কিছুক্ষণ পরে আমিই জিজ্ঞেস করি, তোমরা নাকি আমাকে দিয়ে বন্দিবিনিময় করাতে চাও। প্রশ্নটা শুনে উপস্থিত সবাই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আমি বলতে থাকি, মার্গারেট থ্যাচারের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার কোনো দিন বন্দিবিনিময়ের চুক্তি করেনি। এ ধরনের দাবি তুললে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে। কস্মিনকালেও বন্দিবিনিময়ের চিন্তা মাথায় এনো না।

একজন জানতে চাইল, তোমার সরকার বর্তমানে কী ভাবছে?

আমি শুধু চোখ কচলে বললাম, তোমরা জানো না আমি আটক হওয়ায় টনি ব্লেয়ার কী খুশি হয়েছে? তার দুঃখ একটাই, কেন আরও অধিক সাংবাদিককে তোমরা গ্রেপ্তার করোনি।

আমার কথায় তারা একেবারে চমকে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। হয়তো আমি তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছি বলে, অথবা তারা ইতিমধ্যেই হতাশ হয়ে গিয়েছে বা যে কারণেই হোক, আমি তা জানতে পারিনি এবং কোনো দিন পারবও না।

হিথারের হাসির শব্দে আমার কল্পনায় ছেদ পড়ে। ওর কাছে এখানে এক দিন বেশি বন্দী থাকার চাইতে বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়াই কাম্য। স্বীকার করতেই হবে, মেয়েগুলোর মানসিক শক্তি ছিল প্রবল এবং তারা সব সময়ই নিজেদের সংযত রাখার চেষ্টা করেছে। ভেঙে পড়েনি।

পরদিন সকালে প্রস্তুত হতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। দুই ঘণ্টা লেগে গেল শুধু ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতেই। কেথি ও সিঙ্কে চত্বরের এক প্রান্তে বসে কিছু একটা পড়ছিল এবং ডায়ান অপর প্রান্তে চুপচাপ বসে ছিল। মার্গারিট শুয়ে ছিল। হিথার সম্ভবত প্রধান কারারক্ষীর সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় কানে ভেসে এল বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের কান-ফাটানো গর্জন। আমি বিছানা থেকে এক লাফে উঠে বসি। চারদিকে গোলাবারুদ ফাটার বিকট শব্দ। এত শব্দে হিথার খেই হারিয়ে ফেললে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। ও শুধু চিৎকার করে ডাকছিল কারারক্ষী ও ওদের দুই পুরুষ সহকর্মীকে।

কী ঘটছে কিছুই বোঝার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু মেয়েটা যেভাবে পাগলামি করছে, তাতে করে সবার মধ্যেই এর প্রভাব পড়তে পারে। এখনই হয়তো আমাদের একটা কক্ষে আটকে রাখা হবে। আমি হিথারের হাত ধরে ওকে শান্ত হয়ে বসতে ধমক দিই। হিথার, এমন করে কোনো লাভই হবে না। বরং উদ্ভ্রান্ত নীল প্রজাপতির মতো তোমার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারানোর দৌড়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। মনটাকে একটু শান্ত করো। আমি তোমার সঙ্গে আছি। কিন্তু ও আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে দৌড়াতে থাকে।

আমি ডায়ানার কাছে গিয়ে ওকে কিছু একটা করতে বলি। কারণ, এখন আমাদের উচিত সবাইকে একসঙ্গে থাকা। এমনও হতে পারে, বিশেষ বাহিনী তাদের অপারেশন শুরু করেছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে ওদের হাতে ২০ সেকেন্ড সময়ও নেই। ডায়ানা

বলল, হিথার মানসিকভাবে একটু দুর্বল। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ওকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ততক্ষণে কারা পরিচালক এসে হাজির হয়েছেন। ডাকা হয়েছে পুরুষ দুজনকে। অসি লোকটা হিথারকে শান্ত হতে অনুরোধ করে। কিন্তু বাংকারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে কিছুতেই শান্ত হবে না। শেষমেশ এই ঘটনা ঘটাই বাকি ছিল। পিটার ওকে বারবার আশ্বস্ত করে, বিমান হামলা প্রতিরোধের মহড়া চলছে। ভয়ের কিছু নেই। সবাইকে শান্ত করার জন্য এবার আমাকেও চেষ্টায় নামতে হলো। অমার্জিত মিথ্যা কথা একদম পছন্দ করি না। হিথারকে উদ্দেশ করে বলি, পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটেনি, যার জন্য ভূমি থেকে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইলের আঘাতে মরতে হবে। না, আমরা এভাবে অসহায়ের মতো প্রাণ দিতে পারি না। পরে জানা গেল, আমেরিকার সরকার দুটি ড্রোন বা চালকবিহীন উড়োযান কাবুলের আকাশ প্রদক্ষিণে পাঠিয়েছে।

সৌভাগ্যবশত একসময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এল। আমি হিথারকে পুনরায় এমন উল্টাপাল্টা আচরণ করতে কড়া ভাষায় নিষেধ করি। এর প্রভাব পড়ে সবার ওপর। আমাদের কেউই বাংকারে যেতে রাজি নয়। হিথার শান্ত হলো বটে, কিন্তু মনে একটা উদ্বেগ রয়েই গেল।

আমি বিশ্বাস করতে শুরু করছিলাম, বিশেষ কমান্ডো বাহিনী আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। এই ধারণার কথা বলতেই সবাই একে ভয়ংকর পরিকল্পনা বলে অভিহিত করল। হিথারকে বোঝালাম, সত্যি সত্যি যদি বিমান হামলা শুরু হয়, তাহলে বাংকারে লুকানোর চেষ্টা ছাদসমেত চাপা পড়তে পারে। আমার কথায় ও ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো। বয়স মাত্র ২৪। এইটুকুন বয়সে এত নির্মম বাস্তবতার মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। আমিও খুব সাহসী বালিকা নই। তবে কারও পাগলামির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করার কোনো ইচ্ছা নেই।

এর মধ্যে হিথার ও ডায়ানার নামে আসা চিঠি হাতে এসে পৌঁছালে চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বিজয়ীর বেশে হিথার বলতে থাকে, চিঠিতে বাবা তাকে দুশ্চিন্তা করতে একদম নিষেধ করেছেন। নিরাপদে হিথারের বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত আমেরিকার সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এহেন ফাঁকা কথায় আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। জবাবে হিথার বেশ রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে জানায়, তার বাবা আমেরিকার দূতাবাসের একজন

কর্মচারী। তিনি কখনো হিথারের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না। আমি বললাম, অবশ্যই তোমার বাবা মিথ্যা বলেন না, আর বলতেও চান না। কিন্তু কলিন পাওয়েল কি তোমার বাবাকে জানিয়ে বিমান হামলা শুরু করবে? বিশেষ করে, যখন তিনি কাবুলের জেলে তাঁর মেয়ের কাছে চিঠি লিখছেন।

খারাপ সংবাদ বলে বেড়ানোর জন্য আমি দুঃখিত হলেও এখন আবেগ সরিয়ে রেখে বাস্তববাদী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। জেলখানা কোনো আকাশকুসুম কল্পনার বাড়ি নয়। যা-ই হোক, চিঠির আনন্দে হিথার আর ডায়ানার সময়গুলো ভালোই কাটতে লাগল। ক্যাথির নামে সচরাচর কোনো চিঠি আসত না। একদিন দেখি ও চোখে-মুখে উত্তেজনা নিয়ে কিছু একটা পড়ছে। মনে হয়, দূর থেকে কেউ ওকে মনে করেছে। এসব চিঠির প্রতিটিই ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতে হতো। এত ঝামেলা পোহানোর ইচ্ছা বা সময় কোনোটাই তালেবানদের ছিল না।

হতভাগিনী সিল্কের নামে কোনো চিঠিই আসেনি। মেয়েটার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। একদিন দেখি মেয়েটার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। বিষয়টা অস্বাভাবিক। কারণ, সিল্কে কান্নাকাটি করার মতো মেয়ে নয়। চত্বরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে মেয়েটা নিজেকে সামলে নেয়। দুঃখের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল কোনো কারণে হয়তো। মেয়েটার কান্না কারা পরিচালকের মন ছুঁয়ে গেল বোধ হয়। উনিই এখানে অস্থায়ী ডাকপিয়নের কাজ করেন। লোকটা নরমসরম নিরীহ গোছের একজন বৃদ্ধ। কিন্তু এ জন্য আমার কাছ থেকে করুণা লাভের কোনো সুযোগ নেই।

পরের দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দুজন কর্মকর্তা সাক্ষাৎ করতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন কঠোর দর্শনের কারা মহাপরিচালক। তাঁরা জানালেন, আজ থেকে আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেহমান। অর্থাৎ আমার ওপর গোয়েন্দা বিভাগের কোনো কর্তৃত্ব রইল না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এত দিনের তদন্ত, গোয়েন্দাগিরি আর জেরার দিন ফুরিয়ে এল তাহলে!

সেদিন মধ্যদুপুরে আমি ইয়োগার দ্বিতীয় সেশনে অনুশীলন করি। বিকেল চারটা পর্যন্ত অনুশীলন চালিয়ে যাই। ইচ্ছে করেই এ সময়টা বেছে নিয়েছিলাম। তালেবানরা দেখুক আমি কতটা শক্তসমর্থ নারী অথবা ঘেউ ঘেউ করা কুত্তা। যা ইচ্ছা তা-ই মনে করুক। আমার খোলা চত্বরে অনুশীলনের দৃশ্যটা তালেবানদের কাছে দৃষ্টিকটু প্রতীয়মান হয়েছিল। চোখ

খুলে অনুশীলন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা জড়সড় হয়ে বসে ছিল এক কোনায়।

সুসংবাদ দেওয়ার পরে কর্মকর্তারা জানান, আমাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে। বেশি সময় লাগবে না। কথা শুনে যুদ্ধংদেহী রূপে আবির্ভূত হই। তাঁদের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করি। দ্বিতীয়বারের মতো যখন রণরঙ্গিনী রূপ দেখাই, আমি রীতিমতো কাঁপছিলাম। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা দিয়ে মৃদু স্বরে আঘাত করতে থাকি। তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁকে আমি হাসিমুখের খুনি বলে অভিহিত করতাম, আমাকে জালালাবাদের সেই পুরোনো জ্ঞানগর্ভ কথাগুলোই আবার শোনাতে থাকেন। আমি তাঁদের মেহমান এবং তাঁরা সব সময় আমাকে খুশি দেখতে চান ইত্যাদি।

আমি চিৎকার করে বললাম, আমি কোনো মেহমান নই। এখান থেকে আমার নড়াচড়ার কোনো জো নেই। আমি একজন বন্দী। একটা দেশের উন্নতির মাত্রা কখনো কখনো জেলখানার মানের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এই জায়গাটা একদম জঘন্য নরকের মতো। তোমরা হলে আদিম যুগের নিষ্ঠুর জগতের লোক।

লোকটার সহকারী প্রতিবাদ জানাল আমার কথায়। ২২ বছর ধরে এখানে প্রতিদিন যুদ্ধ হচ্ছে। বিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে আর কী আশা করা সম্ভব? জেলখানার উন্নতি সাধনের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। বরং তুমিই আমাদের না জানিয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছ।

আমি হাত নেড়ে লোকটার কথাকে পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গি করি। তোমরা নরকে যেতে পারো, এই কথা বলে তাদের চলে যেতে বলি আমার চোখের সামনে থেকে। পরমুহূর্তে নিজেই উঠে দাঁড়াই, থুতু ফেলি ওদের পায়ের কাছে আর হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি কারাঘরে। মেয়েগুলো আমার কাণ্ড দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে যায়। আমাকে আরও সাবধান থাকতে নির্দেশ দেয়। এবার একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল আমারও। উঠে দাঁড়াতেই আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হলো যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে যাব। হাজার হাজার প্রজাপতি যেন কিলবিল করছে পেটে।

পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে এল হিথার। কারার লোকজনের সঙ্গে ওর ভালোই খাতির। একজন নারী কারারক্ষী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সঙ্গে এমন আচরণ করলে আমাকে যেন চাবুক দিয়ে প্রহার করা হয়। আমার দায়িত্ব শুধু তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া। ঠিক এই জায়গায় এসে নিশ্চয়ই যেকোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক চুপ হয়ে যেত। কিন্তু সেদিন মাথায় ভূত চেপেছিল। আমি একটুও দমে না গিয়ে উত্তর দিলাম, প্রহারের সময় যদি ব্যথা পাই, তাহলে খুশিই হব আমি। বুঝতে পারব বেঁচে আছি।

খুব শক্ত ও সাহসী বাক্য। কোনো সিনেমায় দেখেছিলাম? মনে করার চেষ্টা করলাম। বাস্তবতা ছিল একেবারে অন্য রকম। বাইরে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ভেতরে ভেতরে আমি তখনো ভয়ে কাঁপছিলাম। আশঙ্কা জাগছিল মনে, এক্ষুনি হয়তো আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাইপ দিয়া চাবকানো হবে। জেলে বন্দী স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয়।

২০ মিনিট পরে ভাঙা গেটটা খুলে যায়। পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। হিথার কাঁপতে কাঁপতে রুমের এক কোণে বসে পড়ে। হাসিমুখের খুনি একজন লোককে সঙ্গে করে পুনরায় ফিরে এসেছে। আমার পা দুটো কাঁপছিল। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। ওদের কণ্ঠস্বর আমাদের কক্ষের দিকেই এগিয়ে আসছিল।

ওদের মধ্য থেকে তিনজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লেগে গেল। খোদা, রিডলিকে শক্তি দাও। অত্যাচার-নির্যাতনের সময় ও যেন কোনো ব্যথা অনুভব না করে। আমার মঙ্গল কামনা করাই ছিল ওর উদ্দেশ্য। এ যেন ঠিক মন্টি পাইথনের *লাইফ অব ব্রায়ান* সিনেমার দৃশ্য। জালালাবাদে থাকাকালে খোদা আমায় অনেক শক্তি জুগিয়েছিলেন। জানি না, ঈশ্বর এখানে এসেও উপস্থিত হয়েছেন কি না! সবাইকে অবাক করে দিয়ে আফগান সাহেব উপস্থিত হলেন হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে। না, আমাকে প্রহার করার জন্য কোনো বৈদ্যুতিক তার নয়। সবাইকে তাদের বাড়িতে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলো। মেয়েগুলো আনন্দে ফেটে পড়ে। একের পর এক গল্প চলতেই থাকে। জার্মান মেয়েটা ও ডায়ানার জন্য এটা ছিল বিশেষ আবেগঘন মুহূর্ত। বন্দী হওয়ার পর থেকে কারও সঙ্গেই কথা বলার সুযোগ হয়নি ওদের। হতাশায় ভেঙে পড়া সিল্কে হয়তো অপেক্ষা করছিল এমন একটা মুহূর্তের জন্যই।

তবে এই আলাপচারিতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমি বাদ পড়ি। কেথি, মেয়েটার মঙ্গল হোক, আমার জন্য এগিয়ে এল। আমিও যেন বাড়িতে কথা বলতে পারি, আফগান লোকটাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। না, আমার জন্য কোনো অনুমতি নেই। এই মহিলা আমাদের কোনো সহযোগিতাই করছে না এবং খারাপ ব্যবহার করছে। তোমরা জানো, সে আমাদের দিকে থুতু নিক্ষেপ করেছে? বাড়িতে কথা বলতে পারার এত বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় স্বভাবতই আমার মন খারাপ হলো। তবে মেয়েগুলোর জন্য এ রকম একটা মুহূর্তের দরকার ছিল খুব।

আফগানিস্তানে খারাপ খবর ও খারাপ ব্যবহারের খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। পরদিন দেখতে ছোটখাটো গড়নের সদা হাস্যময় সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। খুব দ্রুতই আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়ে গেলেন। এ সংবাদ শোনার পরও আমি ওনাকে অগ্রাহ্য করে গেলাম। তিনি আমাকে কোনো দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। জবাব দিলাম, দুশ্চিন্তা করছি না, কিন্তু প্রচণ্ড রেগে আছি। তোমাদের কথার কোনো মূল্যই আমি দিচ্ছি না। বিশেষ করে, কাবুল নিয়ে আসার কথা বলে তোমরা আমাকে যেভাবে ধোঁকা দিয়েছ। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন অনর্গল মিথ্যার পর মিথ্যা বলে গেছে। এখন আবার আমাকে এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করেছ তোমরা। শেষ দিকে আমি চিৎকার করতে থাকি। তোমরা কী ধরনের লোক?

আমরা কথা বলছিলাম চত্বরে দাঁড়িয়ে। কারারক্ষী আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। থোড়াই কেয়ার করে আমি নিজ কক্ষে ফিরে এসে কম্বলের নিচে ঢুকে যাই। ইয়োগা অনুশীলন চলল কিছুক্ষণ। সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে এবং গরমে গায়ে ফোসকা পড়ার উপক্রম। মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে তাঁকে চলে যেতে বললাম।

মানসিকভাবে আমি খুব বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত ছিলাম তখন। মনে হচ্ছিল, আমি যতই ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না কেন, বিনিময়ে ওরা শুধু একগাল হাসি আর মেহমানের প্রতি চিরাচরিত সম্মান দেখিয়েই যাচ্ছিল। আবার সব সময় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে থাকাটাও বিরক্তিকর। কত দিন এমন রাগ দেখিয়ে যেতে পারব, ঠিক নেই। এমনিতেই আমি মোটেও কঠিন প্রকৃতি ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গির মানুষ নই। সহজাত প্রকৃতির বাইরে অন্য কোনো চরিত্রে অভিনয় করাটা মোটেও স্বাভাবিক আচরণ নয়।

হিথার একটা উপন্যাস পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কেন ফলেটের লেখা *কোড টু জিরো*। ওদের সবাই ইতিমধ্যেই এটা পড়া শেষ করেছে। মেয়েটা আমাকে উৎসাহ জোগায়, চমৎকার উপন্যাস। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠতেই পারবে না। তবে ওর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই। এত বড় একটা উপন্যাস পড়তে শুরু করার অর্থ হচ্ছে, আমি কয়েদখানার দীর্ঘদিনের বন্দিত্ব মেনে নিয়েছি।

মার্গারিট ওর কাছে থাকা ছোট ছোট গল্পের একটা বই দিতে চাইল। গল্পগুলো বেশি দীর্ঘ নয়, তাই মন ভালো থাকলে খুব অল্প সময়েই একটা একটা করে পড়ে শেষ করা যাবে। বইটার দিকে একনজর দেখে হাসি পেল আমার। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কুখ্যাত ধান্দাবাজ, প্রতারক রাজনীতিবিদ জেফরি আর্চারের লেখা গল্পের সংকলন। ওই বদলোক বর্তমানে কারাগারে বন্দী। মেয়েগুলোকে বলি, তবে তাকেও মনে হয় না প্রতিদিন নিজের হাতে পানি টেনে তুলতে হয়।

লোকটা কি আমার আগেই কারাগার থেকে মুক্তি পাবে? বৈরুতে আটক পশ্চিমা বন্দীদের ভাগ্য নিয়ে আমরা কথা বলতে শুরু করি। টেরি ওয়েট, টেরি অ্যান্ডারসন ও জন ম্যাকার্থি–এই তিন হতভাগা দীর্ঘদিন ধরে বৈরুতে বন্দী ছিলেন। তাঁদের বন্দিত্বের কথা মনে করে আমার মনেও হতাশা চেপে বসল। তবে তাঁদের চেয়ে কাবুলে আমরা অনেক ভালো আছি। হিথারকে বলি এই কথা। অন্ততপক্ষে সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে হয় না। চত্বরে হাঁটাহাঁটি করা যায়।

তবে কারাগারের জীবন একঘেঁয়েমিপূর্ণ ও নিয়মমাফিক। খাওয়ার সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় খুব বিরক্তিকর কাটে। কারাগারের নিয়মিত সকালের নাশতা রুটি ও ভাতের বদলে তাজা ফলমূল ও সবজি খেতে পারলে ভালো হতো। মেয়েগুলো একটা বাজারের ফর্দ তৈরি করে এক নারী কারারক্ষীর হাতে তুলে দেয়। অধিকাংশ কারাগারেই হাতে টাকা থাকলে বাইরে থেকে খাবারদাবার কিনে আনার সুযোগ থাকে। ডায়ানার হাতে কিছু টাকা ছিল, মেয়েরা সবাই তখন রান্না করার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। তত দিনে আমার ক্ষুধার জ্বালা উবে গেছে। খাবারের চিন্তায় মুখ থেকে এখন আর পানিও ঝরে না। তবু মনে আছে, একদিন সিল্কে কিছু একটা রান্না করছিল আর চারদিকে রান্নার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিল। কাটা ধনে পাতার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে। এখনো চোখ বন্ধ করলে সেই সুবাস আমার নাকে এসে লাগে।

সেদিন রাতে ঘুমাতে পারিনি। বারান্দার শেষ মাথার ঘরের বাচ্চাটা সারা রাত কেঁদেই যাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ওই ঘরে দুজন আফগান নারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁদের অপরাধ, কার্পেট কিনতে আসা দুজন অপরিচিত লোককে তাঁরা বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলেন।

তালেবান রাজত্বে আফগানিস্তানের নারীদের কোনো অধিকার নেই। তবে এর আগেও যে নারীদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল, এমনও নয়। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, নারীরা চরম মাত্রায় বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত। বাচ্চা উৎপাদনের যন্ত্র ব্যতীত তাঁদের আর কোনো ভূমিকা নেই।

মধ্য নভেম্বরের মাঝামাঝি তালেবান রাজত্বে ফাটল ধরলে দুঃসাহসী অনেক নারী প্রকাশ্যে চেহারা দেখিয়ে চলাফেরা করেছেন। তবে দীর্ঘযাত্রায় তাঁদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা দেখার জন্য আরও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোকটা সেদিন আরেকবার দেখা করতে আসেন। আমাকে খুব শিগগির আলাদা কক্ষ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। আপনি আমাদের মেহমান এবং আমরা আপনাকে খুশি রাখতে চাই।

আমি কিছু একটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু লোকটা দ্রুত বলতে শুরু করে, 'আমরা জানি, আপনি ইরানেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাই শুধু কেন আমাদেরই আদিম যুগের মানুষ বলছেন, বুঝতে পারছি না।' এই কথা বলে লোকটা এমনভাবে তাকাল, যেন এই মাত্র সে খুব গোপন কিছু উদ্ধার করে ফেলেছে।

খোদাই জানেন, সে কী নিয়ে কথা বলছে কিন্তু আমি কোনো দিন ইরানেই যাইনি।

কাবুল জেলের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে একেবারেই অন্ধকারে আছি। শুধু জানতাম, আমার পত্রিকা অফিসের লোকজন ইসলামাবাদে তালেবান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করেই যাচ্ছেন। *এক্সপ্রেস*-এর চেয়ারম্যান আবার আমাকে নিয়ে 'বিন লাদেনের ডেরায়' বা এ ধরনের কোনো গল্প লিখছেন কি না কে জানে! ওকে ম্যাগাজিনে আমাকে নিয়ে কী প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে, আমি একদমই জানি না।

কারা পরিচালক মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলে বসেন, 'তোমাদের জন্য জর্জ বুশ প্রতিনিয়ত আমাকে চাপ দিচ্ছে। এখন আবার যোগ দিয়েছেন টনি ব্লেয়ার এই ইংরেজ নারীর জন্য।'

আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। নিজেকে আমার কখনোই এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি যে আমাকে মুক্ত করার জন্য এত প্রচেষ্টা চলবে। একটা পাকিস্তানি পত্রিকা হাতে এল, যেখানে লেখা হয়েছে আমি বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য। হ্যাঁ মেয়েরা, জেনে রাখো আমি বিশেষ বাহিনীর একজন কমান্ডো। আজ রাতেই চত্বরে লুকিয়ে রাখা অদৃশ্য হেলিকপ্টারে করে তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাব।

এটা ছিল একটা ছোটখাটো চুটকি। বন্দিজীবনের এসব হাসি-তামাশাই মনে শক্তি জোগায়। কিন্তু ওই প্রতিবেদন পড়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে যাই। ইচ্ছা করছিল প্রতিবেদকের টুঁটি চেপে ধরি। সে প্রায় আমার মৃত্যু পরোয়ানা লিখেই ফেলেছে। কোনো না কোনোভাবে এসব গুজবের রাশ টেনে ধরতে হবে।

আমার জীবনের দুটি গোপন ঘটনার জন্য জীবন দেওয়া লাগতে পারে। তালেবানরা কখনোই বুঝতে চাইবে না কেন আমি একজন ইসরায়েলিকে বিয়ে করেছিলাম। আমার তৃতীয় স্বামীর কথা বলছি। এই বিয়েটা যে কেন করেছিলাম, সেটা ঠিক আমিও জানি না। এ জন্য আমাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হতে পারে। আরেকটা গোপনীয়তা হলো, আমি আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম।

আমাদের নিজেদের কক্ষে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো। কয়েকজন পুরুষ মানুষ আসবে একটা নতুন কক্ষ পরিষ্কার করতে এবং আমাদের তাদের থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে। এসব অভিজ্ঞতা ছিল খুবই বিরক্তিকর। যদিও বেশি দিন হয়নি এখানে এসেছি, তবে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ায় নিজেকে একজন তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে মনে হচ্ছিল।

পরে আমার জন্য বরাদ্দ কক্ষটা দেখতে যাই। মোটেও ভালো কিছু নয়। এক প্রান্তে একটা বিশাল গর্ত। উঁকি দিতেই ইঁদুর-জাতীয় কিছু একটা সরে গেল। দেয়ালে আরবিতে অনেক কিছু লেখালেখি করা। জানালা দিয়ে পুরুষদের কারাগার চোখে পড়ে।

দরজার দিকে তাকাই। ধাতব দরজা। মনে মনে ভয় হতে লাগল, মাঝেমধ্যে গালিগালাজ করলে আবার না আমাকে দরজায় তালা দিয়ে বন্দী করে রাখা হয় টানা ২৪ ঘণ্টা। দরজার লকটা নষ্ট করতে মেয়েদের কাছে আঠাজাতীয় কিছু চাইলাম। পরে অবশ্য একটা পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে দরজার লকটা ভেঙে ফেলি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদা হাস্যময় লোকটা কারা পরিচালকের সঙ্গে দেখতে এলেন নতুন কক্ষটা আমার পছন্দ হয়েছে কি না। কক্ষটা অপ্রশস্ত এবং এমনকি খোদ আফগানিস্তানেও মানুষ কেন একটা প্রাণীকেও এখানে রাখা সম্ভব নয়। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি আমার কথায় সম্মতি জানালেন। এ রকম নোংরা কষ্টকর জায়গায় আমাকে থাকতে বাধ্য করার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

তিনি আমাকে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের তালেবানদের আবাসিক এলাকায় নিয়ে যেতে চান। তাই বললেন, কাপড়চোপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। তাঁদের এমন ভদ্র ও নরম ব্যবহারে আমার সন্দেহ হতে লাগল। ভয় লাগছিল নির্ঘাত কোথাও নিয়ে আমাকে অত্যাচার করা হবে। তিনি বলতে থাকলেন, আগামীকাল সকালে মুক্তি দেওয়া হবে আমাকে। আমিও বলতে থাকি, হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুবার শুনেছি এই ম্যাড়মেড়ে সংলাপ। আগামীকাল, ইনশাল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।

আমি প্রথমে কক্ষটা দেখতে চাইলে আমাকে চত্বর পেরিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা বেশ বড়সড় কক্ষ। ওখান থেকে কাবুলের পাহাড় চোখে পড়ে। স্বীকার করি, যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম। তবে তা প্রকাশ হতে দিলাম না। মুখে একটা কঠিন ভাব ধরে রাখলাম।

আমি পুরোনো কক্ষে ফিরে গিয়ে মেয়েগুলোকে জানালাম, হঠাৎ করেই ওরা বেশ ভালো ব্যবহার করছে। জানি না এর রহস্য কী। তবে তোমাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। খোদা মঙ্গল করুক। একটা মেয়ে আমার হাতে উপন্যাসটা গুঁজে দিল। আমাকে দ্রুত সরে আসতে হলো সেখান থেকে।

সেদিন ছিল রোববার। সন্ধ্যা নামতেই আঁধার ঘনিয়ে এল। রুমের আলো জ্বালিয়ে দিলাম। মাঝখানে ঐতিহ্যবাহী আফগান শতরঞ্জি ও চারদিকে বালিশ সাজিয়ে রাখা। এক প্রান্তে পুরোনো জীর্ণশীর্ণ একটা খাট। একবার মনে হলো, কক্ষে অনর্থক বসে না থেকে উপন্যাসটা পড়তে শুরু করি। গল্পটা বেশ ভালোই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গল্পের ভেতরে ঢুকে গেলাম।

রাতের নীরবতা চিরে প্রকট শব্দে আকাশটা আলোর ঝলকানিতে ভরে উঠল। উজ্জ্বল আলো, বিমানবিধ্বংসী মিসাইল আর ক্রুজ মিসাইলের লক্ষ্যভেদী কান-ফাটানো শব্দ। ২০ মাইল দূরে থেকেই মিসাইলের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এই মিসাইলগুলো কারাগারের আধা মাইলের মধ্যে

আঘাত হানছিল। ঘরের জানালাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল প্রচণ্ড শক ওয়েভে।

তড়াক গতিতে বিছানা থেকে নেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। দূরে পাহাড়ের ওপর বাড়িঘরের বাতিগুলো জ্বলজ্বল করছিল। উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপর বিন্দু বিন্দু মৃদু আলো সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব শোভা, যেন ক্রিসমাসের রজনী। হঠাৎ করে কোনো রকম সতর্কতা ছাড়াই আলো নিভে গেল। অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হলো এই মৃত্যুপুরী। আটজন তালেবান সৈন্য হন্তদন্ত হয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করল। ওদের তাড়া দেখে ভয়ে চমকে উঠলাম। কারণ, সাধারণত কক্ষে ঢোকার আগে ওরা দরজায় আঘাত করে।

আমার খাটের নিচ থেকে বের হলো রকেটচালিত গ্রেনেড। হায় খোদা, ক্ষুদ্র অ্যাশ লির মতো অসহায় হয়ে ছিলাম এতক্ষণ। এক মিটারেরও কম দূরত্বে রক্তখেকো অস্ত্রের মজুত। আমি একরকম বেপরোয়া হয়েই জানতে চাইলাম, তারা কী করতে যাচ্ছে?

ওদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। ওই হতচ্ছাড়াও খিলখিল করে হাসছিল। আকাশের দিকে নির্দেশ করে চিৎকার করে ওঠে, আম্রিকা, আম্রিকা, আম্রিকা, অ্যাচ, অ্যাচ, অ্যাচ, অ্যাচ। নির্বোধ ধর্মান্ধ লোকটার অঙ্গভঙ্গিতে বিরক্তির উদ্রেক হলো। আমিও বলে ফেললাম, সামান্য কালাশনিকভ আর আরপিজি দিয়ে আকাশে উড্ডীয়মান বি-৫২ বোমারু বিমানের পাখার নাগালও পাওয়া যাবে না। ওদের অস্ত্র ফুরিয়ে আসতে থাকলে আমি খোঁচা দিয়ে বলি, তির-ধনুক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

এমন সময় কারা পরিচালক এসে হাতের ইশারায় শান্ত হতে বললেন। অভয় দিয়ে বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি আমার জন্য মোটেও চিন্তিত ছিলাম না। তবে নিচের মেয়েগুলোর জন্য অজানা আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠছিল। বিশেষ করে, হিথারের জন্য বেশি মায়া লাগছিল। দুই দিন আগে চালকবিহীন বিমানের সামান্য শব্দেই ও কী পরিমাণ আতঙ্কে পাগলামি করেছে! তাহলে আজ ওর অবস্থা হবে কী ভয়ংকর, এসব ভাবতে ভাবতে আমি নিচে যাওয়ার অনুমতি চাইলে আমাকে বাধা দেওয়া হলো।

তিনি চলে গেলেন একটু পরই। চাইলে লুকিয়ে নিচে নেমে যেতে পারতাম। কিন্তু শকুনি দৃষ্টিসম্পন্ন একদল তালেবান যারা হন্যে হয়ে শিকার খুঁজছে, তাদের চোখ ফাঁকি দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। যুদ্ধের ডামাডোলের

কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই চিলেকোঠাতে ফিরে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে বোমাবর্ষণ দেখতে লাগলাম। ৪০ মিনিট ধরে যুদ্ধবিমানের পেট থেকে বোমা পড়ল। দুটি লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে হামলা হচ্ছে। একটা হলো সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, যেটা বিমানবন্দরের খুব কাছে অবস্থিত। আরেকটা তার বিপরীত দিকে মাইলখানেক দূরে হবে হয়তো।

অদ্ভুত যেটা ছিল, তা হলো আকাশের অবস্থা। শুধু রুপালি, সাদা আর ধূসর রঙের মিশেল চোখে ভাসছিল, যেন একরঙা আকাশ। সবচেয়ে বেশি হতাশার ছিল বোধ হয় এটাই। একমাত্র পশ্চিমা সাংবাদিক কাবুলে বসে বসে বোমা হামলার শুরুটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সংবাদ প্রচারের কোনো উপায় নেই।

পাখির চোখে সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু বার্তাকক্ষে ফোন দিয়ে বলতে বা জানাতে পারছিলাম না, এটা কী অপূর্ব দৃশ্য! কোনো দিন কি একের পর এক বোমারু বিমানের আগুনের ফুলকি কীভাবে ছুটে যাচ্ছিল, এ দৃশ্যের বর্ণনা কাউকে শোনাতে পারব? আমি তখনো জানতাম না।

হামলার প্রথম দিকে মনে শান্তি লাগছিল। মনে পড়ে, কিছুক্ষণ পরই বিরক্তিকর আফগান বাহাদুর ওরফে হাসিমুখের খুনির উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলাম। তালেবানরা একটা গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করেছে শুনে লোকটা শূন্যে ঘুষি মেরে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। তাই তার সম্মানার্থে সর্বোচ্চ স্বরে 'রুল ব্রিটানিয়া' গানটা গাইতে শুরু করি।

টের পেলাম আনন্দ লাগছে খুব। দেহে অ্যাড্রেনালিনের গতি বাড়ছে দ্রুত। যাক, অবশেষে বোমা হামলা শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা হয়তো খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপরের মতো শোনাবে, তবে কয়েদখানা মানুষকে এসব ভাবতে বাধ্য করে। একটু খুঁতখুঁতেও লাগছিল। ভেবেছিলাম, আমার ও সাহায্যকর্মীদের কথা চিন্তা করে হয়তো বোমা হামলা শুরুর আগে কিছুটা কালক্ষেপণ করা হবে।

হঠাৎ আমার পরিবারের কথা মাথায় এল। জর্জ বুশের বোমা হামলার কথা ঘোষণার পর তাদের কী কষ্টটাই না লাগছে।

দরজায় আঘাতের শব্দ কানে এল। তালেবান সৈন্যরা ফিরে এসেছে। কেমন বিপর্যস্ত লাগছে সবাইকে। বিছানার নিচে আরপিজি রাখতে ফিরে এসেছে ওরা।

# ইসলামাবাদের পথে

সোমবার, ৮ অক্টোবর। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। গোসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। গোসলখানার অবস্থা দেখে প্রাণ উড়ে যায় যায় অবস্থা। নোংরা অপরিষ্কার টয়লেট। দুর্গন্ধে বমি বমি লাগছিল। মনে মনে ঠিক করলাম, ভবিষ্যতে যেকোনো জায়গায় থাকার আগে টয়লেটের অবস্থা যাচাই করে নেব।

গোসলের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে দ্রুত প্রয়োজন সেরে বেরিয়ে এলাম। রুমেই দাঁত ব্রাশ করতে করতে ছয়টা বেজে গেল। আমাকে খুব সকালেই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। এমন সময় দরজায় কেউ কড়া নাড়তেই উত্তেজনা অনুভব করলাম। হয়তো মুক্তির পয়গাম এসে হাজির। কিন্তু না, এক টুকরা রুটি আর সবুজ চা।

কালকের বোমা হামলার পর মেয়েগুলো কেমন আছে, কে জানে। আমি ওদের বারবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি। যতই ভয়ংকর শব্দ হোক না কেন, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ, হামলার লক্ষ্যবস্তু আমরা নই। সন্ত্রাসী ঘাঁটি লক্ষ্য করেই বোমারু বিমান আঘাত হানবে। মনে আছে, হিথারকে একদিন অভয় দিয়ে বলেছিলাম আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের নির্ভুল নিশানার দক্ষতার কথা। এমনকি যদি সামনের বাগানের একটা গাছ লক্ষ্য করেও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়, তাহলেও আমাদের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। নির্ভুলভাবেই লক্ষ্যে আঘাত হানা হবে।

যে বিষয়টা নিয়ে আমরা সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকতাম, তা হচ্ছে কাবুলের জনগণের প্রতিক্রিয়া। এই বোমা হামলার প্রতিশোধ নিতে যদি আমেরিকান ও ব্রিটিশদের হত্যা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে গর্দান যাবে আমাদেরই। ওরা ভালোভাবেই জানে, কোন কয়েদখানায় পশ্চিমা নাগরিকদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। তবে সেদিন রাতে এমন কিছু ঘটেনি।

পরক্ষণেই নিজের চিন্তা ফিরে এল মাথায়। চত্বরে খানিক হাঁটাহাঁটি করার জন্য বেরিয়ে এলাম। কারা পরিচালক ও কয়েকজন তালেবান কথা বলছিলেন। তাঁকে দেখেই আমি হাত নেড়ে চিৎকার করতে থাকি, কোথায় আমার গাড়ি? তার চালকই-বা কোথায়? বানোয়াট কথা শুনিয়েছ আমায়। তোমরা যুদ্ধ চাইলে আমিও কম যাই না। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী। স্লোভাদান মিলোশোচিভের কথা একবার ভেবে দেখো। হতচ্ছাড়া এখন চৌদ্দ শিকের ভেতর দিন গুনছে। তোমাদেরও একই দশা হবে। আমি তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করব এবং তোমাদের খুঁজে খুঁজে বের করা হবে।

কথা শেষ করেই আর কোনো দিকে তাকালাম না। এক দৌড়ে রুমে ফিরে এসে দরজাটা দড়াম করে আটকে দিলাম ভেতর থেকে। হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম আবার আমাকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। তালেবানরা নিশ্চয়ই আবার মানসিক খেলা খেলতে বসেছে।

পেছনে ফিরে তাকালে এখন মনে হয়, তখন আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, কোনো কিছু দিয়েই ওদের হুমকি দেওয়ার অবস্থায় ছিলাম না নিশ্চয়। আগের দিন রাতেই আমি তির-ধনুকের কথা বলে ওদের ব্যঙ্গ করেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছু হলে একটা বাদাম ছুড়ে মারার ক্ষমতাও ছিল না আমার।

মনে পড়ে, ভাঙা খাটে শুয়ে ছিলাম। নিচে তাকাতেই স্তূপ করে রাখা আরপিজি চোখে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই ভালো লক্ষণ। বিশেষ বাহিনীর সদস্য অথবা নারী গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ হলে নিশ্চয় এত মারাত্মক মারণাস্ত্র আমার হাতের নাগালে ফেলে রাখা হতো না। বন্দুক ধরতেই আমার হাত কাঁপাকাঁপি শুরু হতো। একটা আরপিজি হাতে নিলে বোধ হয় হামলার বদলে নিজের হাত-পাই উড়িয়ে দিতাম।

মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া বইটাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। গল্পটা সত্যিই নেশা ধরানোর মতো। তবে আগের দিন এত দ্রুত পড়েছি যে, শেষ অধ্যায়ে এসে মনে হতে লাগল, বইটা শেষ হয়ে গেলে কীভাবে সময় কাটাব? এখানে আমাকে এখনো অনেক দিন থাকতে হবে।

একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েগুলো আমাকে এক কার্টন ভর্তি ২০০ সিগারেট উপহার দিয়েছে। ওদের কারোরই ধূমপানের অভ্যাস নেই। ভাগ্য ভালো বলতেই হয় আমার, আগুন জ্বালাতে গিয়ে লক্ষ করি, দেশলাইয়ের

কাঠি প্রায় শেষের দিকে। হায় এখন যে আবার ফিরে গিয়ে পাহারাদার তালেবানের কাছে দেশলাই চাইব, সে অবস্থাও অবশিষ্ট নেই।

করার ছিল একটাই। একের পর এক সিগারেট জ্বালিয়েই যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত না অসুস্থ লাগছে। সেদিন বইটা সমাপ্ত হওয়ার আগে আমি টানা সাতটি সিগারেটের ধোঁয়া টেনেছি। উঠে রুমের চারপাশেই পায়চারি করতে লাগলাম। গলা ছেড়ে পুনরায় রুল ব্রিটানিয়া গাইতে শুরু করি। মনে পড়ল, গত বছর স্কুলের অনুষ্ঠানে কত মজাই না করেছি, আর এ বছর চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছে আমার সব আনন্দের পসরা।

এরপর ভাঙা রুক্ষ কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাইতে শুরু করলাম। এর আগে কোনো দিন গান গাওয়ার চেষ্টাও করিনি। শুধু কর্কশ নয়, গাওয়ার সময় আমার কণ্ঠস্বর রীতিমতো কাঁপছিল। আমার হেঁড়ে গলার গান শুনে নিশ্চয়ই বাইরে দাঁড়ানো সৈন্যরা মনে মনে ভাবছিল, কেন গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সন্দেহ নেই, তারা ধরতে পেরেছিল গানের সুর-তাল-লয় কিছুই ঠিক নেই। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলে দেখি একজন সৈন্য ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমাকে দেখেই সৈন্যটা একটা ধুলোয় ঢাকা গাড়ির সামনে থেকে সরে গেল। কাচে জমে থাকা ধুলোর ওপর লেখা, তুমি কাবুল থেকে মুক্তি পাচ্ছ। আমি সৈন্যটার সঙ্গে এক দফা হাসি বিনিময় করলাম। তবে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

একটু পরে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ততক্ষণে সৈন্যটার গাড়ির কাচের চিঠিতে আরও অনেক কিছু লেখা হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি চলে যাচ্ছ। তোমার কথা আমার সব সময় মনে পড়বে। বিদায় হে প্রিয়। কিছুটা অবাক হলাম। মনে পড়ছে না কখন এই দূরপ্রেমিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও হ্যাঁ, আমার ইয়োগা অনুশীলনের দ্বারা যেসব সৈন্য বিনোদিত হয়েছিল, এ নিশ্চয় তাদের একজন। অথবা কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কথা শুনেই দিওয়ানা হয়ে গেছে বোধ করি।

একটা সিগারেটের খালি প্যাকেট ও কলম নিয়ে লিখতে থাকি, ধন্যবাদ তোমার সহানুভূতির জন্য। যদি সত্যিই আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি প্রার্থনা করছি তোমার বাকি জীবনটা যেন সুখে-শান্তিতে কাটে। গরাদের ফাঁক দিয়ে কাগজটা ছুড়ে মারি। লোকটা দ্রুত তা কুড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

মোল্লা ওমর কি এসব গোপন যোগাযোগ নিষিদ্ধ করেছেন? সে ক্ষেত্রে আমার কী হবে? আমার বন্দিত্বের মাঝেই হয়তো সে আবার উদ্ভট কোনো আইন জারি করেছে। নারীরা বাইরে খেতে বা বনভোজনে যেতে পারবে না এবং খেতে পারবে না। যদি না তাদের জন্য কোনো তাঁবু টাঙানো হয়, যেখানে তারা পুরুষের চোখের আড়ালে থেকে খাওয়াদাওয়া করতে পারবে। যত্ত সব অনর্থক বকোয়াজ।

সকাল সোয়া নয়টার দিকে দূতাবাসের সেই হাস্যময় লোকটা দরজায় আঘাত করে ভেতরে আসতে চাইল। দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানালাম। চলে যেতে বললাম লোকটাকে। ব্যাটা জাহান্নামে যাও। তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী। যথেষ্ট হয়েছে। তোমাদের মিথ্যা কথার ফাঁদে আর পড়ছি না আমি। ক্ষোভে ফেটে পড়লাম আমি। লোকটা প্রায় জোর করেই বলতে লাগল, গাড়ি হাজির এবং আমি যেতে পারি। কিন্তু আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না।

একসময় দরজায় জোরে জোরে কড়াঘাত হতে লাগল। বাধ্য হয়েই দরজাটা খুলে দিলাম। ছিটকিনিটা খুলতেই দরজাটা সজোরে হাঁ হয়ে যেতেই পাঁচজন লোক হুড়মুড় করে রুমে ঢুকে পড়ল। আমাকে বসতে বলে তারা জানাল, একটা গাড়ি আমাকে সীমান্তে নিয়ে যেতে বাইরে অপেক্ষা করছে।

কারা পরিচালক আমার জন্য সুন্দর একটা উপহার নিয়ে এসেছেন। ভারী, কালো রঙের খুব সুন্দর একটা পোশাক। সঙ্গে লাল ও সোনালি রঙের একটা পর্দা। ঐতিহ্যবাহী আফগান পোশাক। উপহারটা পেয়েই আমার মনটা বিগলিত হয়ে এল। এই সেই কারা পরিচালক, যাঁর জীবনটা আমি একরকম দুঃসহ করে রেখেছিলাম এই ক'দিনে। তিনি আমাকে পোশাকটা পরিধান করতে বললেন। আমি অস্বীকার করলাম। এত সুন্দর পোশাকটা ছয় ঘণ্টার ভ্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হাস্যময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বললেন, 'কাল রাতে বোমা হামলা শেষ হওয়ার পর আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে এসেছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে আর জাগাইনি।'

কিসের বোমা হামলা? ও আচ্ছা আমি তো ভেবেছিলাম, তালেবানদের পক্ষ থেকে আতশবাজি পুড়িয়ে আমাকে বিদায় জানানো হচ্ছিল। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে চমৎকার একটা হাসি দিল। রিডলি, তুমি একটা মানুষই। অতিশয় চালাক ব্যক্তি। এখন চলো, যাওয়ার সময় হয়েছে।

অবশেষে আমি প্রথমবারের মতো লোকটার দিকে তাকিয়ে একটা উষ্ণ হাসি দিলাম। এত দিনের খারাপ ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। এরপর কারা পরিচালকের দিকে তাকিয়ে সুন্দর পোশাকটার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁকেও বলি, আমি যতই রুক্ষ ও কঠোর আচরণ করে থাকি না কেন, এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি অভয় দিলাম, সব ইংরেজ নারীই আমার মতো এত ঝগড়াটে নয়। লোকটা একটু অবাক হয়ে আমাকে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত অবলোকন করলেন। তাঁর কঠিন পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মুখে একটা সুন্দর হাসি দেখতে পেলাম প্রথমবারের মতো। কুঁচকে থাকা ভ্রু জোড়াও সোজা হয়ে এল।

চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই। তালেবান সৈন্যরা হতবিহ্বল হয়ে দেখতে লাগল কঠিন হৃদয়ের রিডলি একটা মহাকাশযান-সদৃশ গাড়িতে উঠছে। আমি আর কিছু দেখতে পাইনি। প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাই, যেখানে একজন কূটনৈতিক কর্মকর্তা আমাকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে অপেক্ষা করছিলেন।

হাসিমুখের খুনি লোকটা দেখা করতে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করলেও এই ব্যাটার প্রতি কোনো মায়া অনুভূত হলো না। আমি নিরুত্তাপ চেহারা নিয়ে বসে রইলাম। সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে লোকটা বলতে থাকে, আশা করব ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে খারাপ কিছু লিখবে না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তোমাকে জ্বালাতন করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নয়। আমি তাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছি না দেখে তার মুখের হাসিটা মলিন হয়ে এল। এটা ছিল আমার জন্য একধরনের নৈতিক বিজয়।

কূটনৈতিক কর্মকর্তা ভালো ইংরেজি জানেন না। দীর্ঘ পথ আমাকে চুপ হয়ে থাকতে হবে। রওনা দেওয়ার সময় দেখা গেল লোকটা পাসপোর্ট নিয়ে আসতে ভুলে গেছেন। অগত্যা আবার তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলো। যোগাযোগের মাধ্যম না থাকলেও তাঁর সঙ্গে ভ্রমণটা হয়তো মন্দ হবে না।

কাবুল শহরের এক অভিজাত এলাকায় সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন। এলাকাটায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বসবাস। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, কয়েকটা বাড়ির ছাদে নিষিদ্ধ টিভির অ্যানটেনা বা ডিশ স্যাটেলাইট দেখা যাচ্ছে। আমাকে জানানো হলো, শাসকগোষ্ঠীর সন্তান, এমনকি

মেয়েরাও পাকিস্তানের নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য!

দিনের বেলায় কাবুলে পথে চলতে চলতে শহরটাকে দুই ভাগ মনে হলো। এক পাশে বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সব স্থাপনা। বহু বছর ধরে চলা যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা। অন্য প্রান্তে প্রশস্ত সড়কের দুই পাশে গাছগাছালিতে ঘেরা মনোরম সব দালানকোঠা। এখানেই সব দূতাবাস অবস্থিত। উঁচু একটা দালানের ওপর চীনের পতাকা উড়তেও দেখা গেল।

চারপাশে ধোঁয়া উড়ছে। গতকালের বোমা হামলায় অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। কাবুল শহরে এতবার বিদেশি শক্তি বোমা হামলা করেছে যে, এখানকার অধিবাসীদের কাছে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঠিক যেন, ইংল্যান্ডের বৃষ্টিবহুল শহর ম্যানচেস্টার, যেখানে বৃষ্টিপাত হলো নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। কাবুল যেন একটা ভুতুড়ে নগরী। যারা চলে যাওয়ার, তারা বোমা হামলা শুরু হওয়ার অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

শহরের ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। শহরের গিরিখাতের দৃশ্য দেখে যেন দম আটকে যাচ্ছে। খাইবার পাস এই ভয়ানক দৃশ্যের কাছে কিছুই নয়। সংকীর্ণ ঢালু পথ দিয়ে যখন গাড়ি চলছিল, স্বীকার করি, একেকবার ভয়ে নীল হয়ে যাচ্ছিলাম। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। সরু পাহাড়ি পথ ও খাড়া ঢালগুলো গাড়ি চলাচলের জন্য এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে।

গিরি সংকট ও সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে সামনের ছয় ঘণ্টা ভ্রমণের কথা ভাবতে থাকি। সুড়ঙ্গগুলো পাথর খোদাই করে বানানো। সমগ্র পথজুড়েই পাথর আর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রতিটা চেক পয়েন্টেই কূটনৈতিক কর্মকর্তা একটা কাগজ দেখাতেই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। কাগজে স্বয়ং মোল্লা ওমর স্বাক্ষর করেছেন। এতে লেখা, ইভন রিডলিকে মানবতার দিক বিবেচনা করে মুক্তি দেওয়া হবে।

তবে তালেবানদের একটা দল আমাদের সহজে ছেড়ে দিচ্ছিল না। বিশেষ করে, গতকাল রাতের ভয়াবহ বোমা হামলার পর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। কোথাও কোথাও তাদের সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়া লেগে যাচ্ছিল।

কিন্তু গাড়িচালক কথা না বাড়িয়ে সব জায়গাতেই মোল্লা ওমরের স্বাক্ষরিত কাগজ দেখিয়ে দ্রুত সটকে পড়ছিল। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। তবে চালক নিজ উদ্যোগে এসব জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মাঝপথে এসে যাত্রাবিরতি করতে হলো। একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থেমে গেল। একটা দরজা দেখিয়ে আমাকে ভেতরে যেতে বলা হলো। সঙ্গের পুরুষ লোকজন অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। ভেবেছিলাম, টয়লেট আছে এখানে নিশ্চয়ই। ভেতরে যেতেই দেখি কয়েকজন নারী ও বাচ্চাকাচ্চা একত্রে মাটিতে বসে খাবার গ্রহণ করছে। আমি মরিয়া হয়ে জানতে চাইলাম, টয়লেট কোথায়? আমার ভাষা বুঝতে না পারলেও ওরা একটা পর্দার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

দ্রুত ভেতরে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিশাল একটা হলঘর। দুটি সারিতে প্রায় ২০ জন লোক বসে খাচ্ছে। খোদার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ, টয়লেট মনে করে পর্দার ভেতরে গিয়েই আমি কাপড় খুলে ফেলিনি। তাহলে আগেরবারের মতো এবারও দ্রুতই রুমটা খালি হয়ে যেত। আমার সঙ্গে আসা লোকেরাও ভেতরে বসা ছিলেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে বসে খেতে অনুরোধ করলেন।

দেশটাতে আসার পরে এটাই ছিল আমার প্রথম স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ। মাছি ভনভন করতে থাকলেও খাবারটা ছিল খেতে দারুণ সুস্বাদু। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করতে গিয়ে জায়গাটাকে আমি 'হাজার মাছির রেস্তোরাঁ' বলে সম্বোধন করতাম। এখন হয়তো কোথাও মাছি বসলেও সারা বাড়ি দৌড়ে তাকে তাড়িয়ে দেব। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওখানে হাজারখানেক মাছি উড়তে থাকলেও আমি একবারও ভ্রু কুঁচকে তাকাইনি। কূটনৈতিক কর্মকর্তা, গাড়িচালক ও দুজন সশস্ত্র গার্ডসমেত আমরা সবাই প্রায় নিঃশব্দে বসে খেয়ে নিলাম। আমরা চলে যাওয়ার পর তাঁরা সবাই নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তখনো আমার টয়লেটের প্রয়োজন সারেনি। মনে আছে, এক পাশে আদিম ধরনের একটা টয়লেট চোখে পড়েছিল, যেখানে গোসল করার ব্যবস্থাও ছিল। কানাডা সরকারের উদ্যোগে এটা তৈরি করা হয়েছিল। জানি না ঠিক কী কারণে, কিন্তু নিরাপদ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। নারীদের টয়লেটে যেতে দেখে স্থানীয় ব্যবস্থাপক উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু দরজা ছিল আটকানো।

গোছা থেকে চাবি বের করে লোকটা দরজা খুলে দিল। মনে হচ্ছিল, নতুন টয়েলেটে আমাকে যাওয়ার সুযোগ দিতে পেরে সে যারপরনাই খুশি। প্রয়োজন শেষে বের হয়ে লোকটাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইংরেজ সাংবাদিক? আমি হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। কীভাবে বুঝল জানি না। সঙ্গের সৈন্য দুজন তাদের বলে থাকতে পারে।

যেতে যেতে অসংখ্য উটের কাফেলা ও ভেড়ার পাল চোখে পড়ল। এত মানুষ উটের পিঠে করে কোথায় যাচ্ছে? কাফেলার লোকগুলো দেখতে খুব সুন্দর ও চমকপ্রদ। চোখ ফেরানো দায়। চেহারায় হাজার রকম বৈচিত্র্য। কঠিন চেহারা। ঘাড় অবধি লম্বা চুল। কারও কারও চোখ পান্নার মতো জ্বলছে। গাঢ় বাদামি বর্ণের চোখ, গাঢ় সবুজ চোখ।

দেশটার এই স্থানগুলো একদম ফাঁকা, ধূসর ও প্রাণহীন; যেন পৃথিবীর সর্বশেষ স্থান। প্রকৃতি এখানে বড় নির্মম। কাবুলে যাওয়ার পথেও একই রকম দৃশ্য চোখে পড়েছিল। তবে শহরের বাইরে আর কোথাও বোমা হামলায় ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য চোখে পড়েনি।

জালালাবাদ অতিক্রমের সময় আমাদের গাড়ির সামনে ভিড় জমে যায়। লোকজন ইংরেজ সাংবাদিক বলে সোল্লাসে স্লোগান দিচ্ছিল। এই শহরেই মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমাকে বন্দীর মতো করে ঘোরানো হয়েছিল। আর আজ নিজেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

কূটনৈতিক কর্মকর্তা এসব দেখে হেসে দিলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, এখানে সবাই তোমাকে চেনে। তুমি মোটামুটি বিখ্যাত হয়ে গেছ সমগ্র আফগানিস্তানে। তোরখামের দিকে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। পথিমধ্যে আমরা একটা পিকআপকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাই। দুজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি অলস ভঙ্গিতে পেছনে বসে ছিল। পা দুটো আয়েশ করে ছড়িয়ে কালাশনিকভ বুকে জড়িয়ে সূর্যাস্তের সর্বশেষ দৃশ্য দেখছিল ওরা।

ওদের একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি আবার ভালো করে লক্ষ করলাম। পৃথিবীটা এত ছোট যে মাঝেমধ্যে তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সবুজ চোখের লোকটা পিকআপের পেছনে বসা। এই লোকটার জন্যই আমার আফগানিস্তান ভ্রমণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। একটা গাধার পিঠে চড়তে গিয়ে কী দুর্ভোগেই না পড়লাম।

লোকটাও আমাকে মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেলে। তার চোখে ভয় আর অবিশ্বাস। এর মধ্যেই তারা পিকআপ নিয়ে বেশ কয়েকবার অতিক্রম করে

আগে যাওয়ার চেষ্টা করে। সবুজ চোখের লোকটা বারবার আমাদের গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করছিল আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আতঙ্কে আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। আবার কি আমাকে বন্দী করা হবে? এই নরক যন্ত্রণা আরও একবার সইতে হবে? কিন্তু না, তেমন কিছুই ঘটল না। বরং, আমি বাড়ি যাচ্ছি শুনে লোকটাকে খুশি খুশি আর ভারমুক্ত দেখাল।

আরও কয়েক মাইল আমাদের গাড়ি ওদের পিকআপের পাশাপাশি ছুটে চলল। পিকআপের লোকগুলো অতীব উৎসাহের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় যাত্রী ও পথচারীদের আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছিল। মানুষগুলো চমৎকার। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী দেশজুড়ে বোমা হামলা করেছে। অথচ এদের মাঝে কোনো আক্রোশ অথবা ক্ষোভ নেই।

সীমান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে এল। আমরা প্রকাণ্ড লোহার গেটটার সামনে বসে পড়লাম। এই গেটের ওপারেই আমার বন্দিত্বের অবসান হবে। মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসের অপেক্ষা। এপারে চারদিকে কেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। আমাদের সঙ্গের গার্ড দুজন উৎসাহী জনতাকে দূরে সরিয়ে রাখছিল।

আমি নীরবে প্রার্থনা করছিলাম গেট খুলে দেওয়ার জন্য। ৩৮ মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই ৩৮ মিনিট ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম অপেক্ষা। সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও সংঘর্ষে তিনজন মানুষ মারা যাওয়ার সংবাদ পাই। ভয় ছিল, আমার মুক্তির খবর পেলে কেউ কেউ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকার বোমা হামলার পর ২৪ ঘণ্টা সময়ও পেরোয়নি।

সঙ্গের সৈন্য দুজন নিরাপত্তার আশঙ্কা করছিল। তাই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে স্থানীয় সৈন্যদের কাছে নিরাপত্তা জোরদার করতে অনুরোধ জানাল। আবার কি নতুন কোনো খেলা শুরু হলো? আমাকে জানানো হলো, আমাকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, ওপারে ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে কেউ আমাকে নিতে আসেনি। আবার মাথায় চেপে বসতে শুরু করল হতাশা আর বিরক্তি। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ওরা আবার কোনো প্রতারণাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করছে।

তবে যে তরুণ কূটনৈতিক কর্মকর্তা আমার সঙ্গে এসেছেন, তিনি আমার চোখে-মুখে হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ ধরতে পারলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তার হাতে আমাকে তুলে

দেওয়ার। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি আমাকে আগেই মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। এই লোকটার নিকট আমি চিরদিন ঋণী হয়ে রইব। ভারী লোহার গেটটা ম্যাচম্যাচ শব্দ করে আস্তে আস্তে খুলে গেল। আমাদের গাড়ি সামনের দিকে আরও পাঁচ গজ অতিক্রম করার পর শুনতে পেলাম, তুমি এখন যেতে পারো। হৃৎস্পন্দন থেমে গেল বুঝি!

গাড়ি থেকে নামতেই চোখে এসে লাগল টেলিভিশন ক্যামেরার আলোর তীব্র ঝলকানি। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু কানে এল, অসংখ্য কণ্ঠস্বর। তালেবানরা তোমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে? বিগত ১০ দিনের স্মৃতি আর মানসিক খেলার সবকিছু যেন এক মুহূর্তে জ্বলজ্বল করে উঠল চোখের সামনে। আমি উত্তর দিলাম, সম্মান ও সৌজন্যের সহিত।

আমি জোরে চিৎকার করে কাঁদতে চাইলাম। পরক্ষণেই মনে হলো মা ও ডেইজি নিশ্চয় টেলিভিশনে সরাসরি আমাকে দেখছেন। আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধব সবাই নিশ্চয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সহকর্মীরাও নিশ্চয়ই দম বন্ধ করে টেলিভিশন সেটের সামনে বসা। থাক আর কাউকে কষ্ট আর যন্ত্রণা দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

ইচ্ছে হচ্ছিল আনন্দের আতিশয্যে সজোরে শূন্যে ঘুষি মারি। কিন্তু পারলাম না। আমার সঙ্গের সেই দুজন নারী, বাচ্চা মেয়েটা ও জার্মান দাতব্য সংস্থার সাহায্যকর্মীদের দলটা এখনো কাবুলে বন্দী। আমি অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সীমান্তের দুঃসহ অপেক্ষার চাইতেও বেশি কষ্ট লাগল, যখন সীমান্তের ওপারে এসে কোনো ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে দেখতে পেলাম না।

হাজার হাজার লোক চারদিকে গিজগিজ করছে। আমাকে একটা ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটা বিশাল ঘরে সামরিক কর্মকর্তা, কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও অসংখ্য সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন কিছু খেতে চাই কি না। ইচ্ছে করছিল এক বোতল স্কচ চেয়ে বসি। কিন্তু, আমি সদ্য একটা মুসলমান দেশ থেকে আরেকটা মুসলমান দেশে প্রবেশ করেছি।

ক্যামেরার ফ্লাশলাইট পুনরায় জ্বলে উঠল। স্বীকার করতে হবে, ওই সময়ে এসে আমার সাংবাদিক সত্ত্বা জেগে উঠল। আমার ঝুলিতে থাকা

অসংখ্য অভিজ্ঞতা ছাপাতে আমার পত্রিকা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়।

আমি পেশোয়ারের নিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম প্রধানের দিকে ফিরে ক্যামেরা বন্ধ করতে পাকিস্তানি সাংবাদিকদের অনুরোধ করতে বলি। দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের পরে আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত। এই মুহূর্তে কারও সঙ্গেই কথা বলার ইচ্ছা নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই টিভি কর্মীরা কোনো অভিযোগ ছাড়াই ক্যামেরা বন্ধ করে দিলেন। এমনকি আমার পাশে বসা সাংবাদিকটাও আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলেন।

চা ও বিস্কুট। সবকিছুতেই সভ্য জগতের ছোঁয়া, যেন ব্রিটিশদের আদব-কায়দা। কিন্তু এখানে শুধু আমি একাই ইংরেজ। তালেবান কূটনৈতিক কর্মকর্তা আমার বিপরীত দিকেই বসা ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর একটা হাসি দিলেন।

তিনি বোধ হয় মনে মনে বেশ খুশি হয়েছেন যে এখন পর্যন্ত আমি তাঁর দেশ ও তাঁদের নিয়ে কোনো গালাগাল দিইনি। অথচ বন্দী থাকা অবস্থায় আমি সর্বদা এই ভয়ই দেখিয়েছি ওদের। এখন তিনি গুলি খাওয়ার ভয় অথবা পাথরের আঘাতে মৃত্যুর ভয় কাটিয়ে নিশ্চিন্তে কাবুল ফিরে যেতে পারবেন।

অপ্রিয় বাস্তবতা হলো, তালেবানরা তাদের কুখ্যাতির বদলে বরং আমার সঙ্গে সম্মান ও সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। লোকগুলো চাইলেই নিষ্ঠুর ও বর্বর হতে পারত। অথচ আমার সঙ্গে তারা অমায়িক ব্যবহারই করেছে। সাংবাদিক সহকর্মীরা হয়তো এখনই নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার গল্প ফেঁদে বসবে।

সশস্ত্র পাহারায় খাইবার পাস অতিক্রম করে রাজনৈতিক এজেন্টের অফিসে উপস্থিত হলাম। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সহকারী রাজনৈতিক কর্মকর্তা শাহজাদা জিয়াউদ্দিন আলী। আমাকে দেখেই বলতে লাগলেন, 'আমাকে চিনতে পারছ? আমিই তোমাকে আগের বার খাইবার পাস যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। যদি জানতাম তুমি এভাবে আফগান যাবে, তাহলে আমি নিজ দায়িত্বেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। তোমাকে নিষেধ করেছিলাম ক্যামেরা নিয়ে যেয়ো না।'

অফিসটার প্রবেশপথে কয়েকজন সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের গাড়িটা তাঁদের কোনো রকম সুযোগ না দিয়েই সোজা

ভেতরে প্রবেশ করেছিল। ভেতরে প্রবেশ করলে আমাকে মূল্যবান সেগুন কাঠের তৈরি একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে ঝামেলাবাজ রিডলির জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফিদা মোহাম্মদ ওয়াজির। ভদ্রলোকের পেছনে একটা কাঠে খোদাই করে খাইবার পাসে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া সব রাজনৈতিক কর্মকর্তার নাম লিখে রাখা। সবার শেষে খোদাই করে ওয়াজির সাহেবের নাম লেখা। দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি আমি আটক হওয়ার কয়েক দিন পরেই সদ্য দায়িত্ব পেয়েছেন বলে জানান।

এবার সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি জানতে চাইলেন, কাদের সহায়তায় আমি আফগানিস্তান গিয়েছি? ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত কারা আমাকে সাহায্য করেছে? প্রশ্ন শুনে আমি একটু হেসে উত্তর দিই, যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জানাচ্ছি, ১০ দিনের বন্দিজীবনে আমি খোদ তালেবানদেরও এই প্রশ্নের উত্তর দিইনি। এখনো দিচ্ছি না। তিনি শুধু একবার মাথা নাড়লেন। আমার উত্তর মেনে নিয়েছেন কি নেননি, তা বোঝা গেল না।

এবার আমি জানতে চাইলাম, আমি আটক হওয়ার পরে তাঁদের কোনো লোক আফগানিস্তানে নিখোঁজ হয়েছে কি না। তিনি শুধুই মাথা নাড়লেন। আমার দুই গাইড ও ছোট মেয়েটার জন্য কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু এদের তথ্য আমি যার-তার কাছে ফাঁস করে দিতে পারি না। অন্যথায় মুক্তি পাওয়ার পরে তারা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবে।

আমি বলতে থাকি, শাহজাদার কাছ থেকে শুনেছি, প্রেসিডেন্ট মোশাররফ আমার মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তাঁকে কৃতিত্ব ও ধন্যবাদ দিতেই হবে। ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, প্রেসিডেন্ট আপনার মুক্তির জন্য তালেবানদের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে আমার আন্তরিক অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলাম।

ঠিক এমন সময়ে *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর ডেভিড স্মিথ দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে উঁকি দিল। আমাকে দেখেই ও মুখ টিপে হাসতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল হায় আমাকে কিম্ভূতকিমাকার লাগছে দেখতে। উস্কখুস্ক চুলের ওপর দিয়ে মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। চেহারায় কোনো মেকআপ নেই। পরনের সালোয়ার-কামিজটা ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। যা-ই হোক, আমাকে খুব বাজে দেখাচ্ছে না নিশ্চয়ই।

পরে জানলাম, ডেভিডের হাসির রহস্য। মিনিট দুয়েক আগেই ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে ওকে ফোন করে জানানো হয়, আমার মুক্তির ব্যাপারে যেসব সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তা নিতান্তই অমূলক। দূতাবাসের কর্মকর্তার কণ্ঠস্বর নকল করে দেখায় ডেভিড। ওকে বলা হয়েছিল, সীমান্তের কাছেই দূতাবাসের লোকজন অপেক্ষায় থাকবে। আমি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডেভিডকে জানানো হবে।

অনেকক্ষণ ডেভিড আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখল। *এক্সপ্রেস*-এর ভাড়া করা চিত্রগ্রাহককে ডাকতে ছুটে গেল সে। একদম পুরোদস্তুর সংবাদসন্ধানী সাংবাদিক। কয়েক সেকেন্ড পরই মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে ফিরে এল সে। চিত্রগ্রাহক ইতিমধ্যেই আমার ছবি তুলতে শুরু করেছে। মুঠোফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর প্রধান সম্পাদক ক্রিস উইলিয়ামস প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, স্বাগত। ওপাশে তখন মুহুর্মুহু করতালি আর চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই আনন্দিত। কেমন আছ?

আমি আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ক্রিসের সঙ্গে কথা বলতে পেরে চমৎকার একটা অনুভূতি হচ্ছে। ক্রিসকে বলি, স্ট্যামির এক টুকরা পিম কেকের জন্য মারা যাচ্ছি আমি। ডেভিডকে জানালাম দারুণ শ্বাসরুদ্ধকর একটা গল্প অপেক্ষা করছে ওর জন্য। কিন্তু একই সঙ্গে আমার একটা সংবাদ সম্মেলনও করা উচিত। এরপর ডেভিডকে আমার অভিজ্ঞতার একটা সারসংক্ষেপ বলে ফেললাম। নিজেও একজন প্রতিবেদক হওয়ায় আমি জানি কী কী বলতে হবে।

আমি রাজনৈতিক এজেন্টের সঙ্গে বসে আরও এক কাপ চায়ে চুমুক দিলাম। তিনি আমাকে কিছু খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। খাবারগুলো ছিল দারুণ সুস্বাদু। জানতে চাইলাম, উনি আরও লোকের জন্য অপেক্ষা করছেন কি না। জবাবে তিনি জানালেন, তাঁকে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ হাইকমিশনের কোনো একজন কর্মকর্তা আমাকে সীমান্ত থেকে গ্রহণ করবেন।

আমার খুব অসহায় ও বিব্রত বোধ হতে লাগল। আমি কি এমন কোনো অপরাধ করে ফেলেছি যে দূতাবাস আমার জন্য কিছুই করতে চাচ্ছে না। শাহজাদা আমাকে হতাশ হতে নিষেধ করল। আমাকে বরণ করে নিতে তাঁর বাড়িতে এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানায় সে। পরে জানতে পারি হাইকমিশনের অনুপস্থিতির কারণ। আমাকে আরও আগেভাগেই মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি যখন ভারী লোহার গেটটা

অতিক্রম করছিলাম, ততক্ষণে চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঘন অন্ধকারে রাজকীয় নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের পক্ষে উড্ডয়ন সম্ভব ছিল না।

মাকে ফোন করে তাঁর মুঠোফোনটা ব্যস্ত পেলাম। সম্ভবত তিনি ভিভের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটু আগেই আমার মুক্তির সংবাদ মাকে জানিয়েছে ডেভিড। এ-ও বলেছে, পরে আমার সঙ্গে কথা হবে মায়ের। *সান ফ্রন্টিয়ার*-এর এক চিত্রগ্রাহক গ্যারি ট্রটার মনে হয় শ খানেক ছবি তুলল। ওর ক্যামেরাটাকে বিশ্রাম দিতেই এই ফাঁকে আমি ও ডেভিড একটা গাড়িতে উঠে পড়ি। গাড়িতে আমাদের সঙ্গী হলো আরেকজন চিত্রগ্রাহক অ্যারল সেদাত। শাহজাদার গাড়ির পিছু পিছু আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। শাহজাদার অফিসে পৌঁছামাত্রই জনা পঞ্চাশেক সাংবাদিক, চিত্রগ্রাহক ও ক্যামেরাম্যান আমাদের একদম ছেঁকে ধরল। মাথা নিচু রাখো। মুখ ঢেকে ফেলো। কাউকে কিছুই বলবে না। ডেভিড প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। আমি চমকে উঠি। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল একই রকম আরেকটা দৃশ্য। তালেবানদের ভূমিতে পা রাখার পর থেকে আমাকে একই কথা শুনতে হয়েছিল বারবার।

ড্রাইভার ঝাঁকি খেতে খেতে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এমন সময় হঠাৎ করেই একজন সাংবাদিক এক হ্যাঁচকা টানে চালকের দরজা খুলে গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, যাতে আমরা আর এগোতে না পারি। চালক ব্যাটা বিমূঢ় হয়ে গেল। আগে থেকেই প্রস্তুতি থাকলে ও হয়তো এসব বদমাশকে তোয়াক্কা না করেই জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিত। কিন্তু ও ভুল করে গাড়িটা থামিয়ে দিল।

অপর দিক থেকে কেউ একজন আমার পাশের দরজা খুলে দিয়ে আমাকে বাইরে বের করার চেষ্টা করতেই অ্যারল আমাকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে এল। চেষ্টা করল আমার চারপাশে হাত দিয়ে প্রতিরক্ষাবেষ্টনী দেওয়ার। এবার ডেভিডের গলা শুনতে পেলাম। সবাইকে উদ্দেশ করে ও বলতে থাকে, অনেক হয়েছে। হতভাগা মেয়েটাকে একটু শান্তি দাও। ১০ দিন ধরে ও বন্দিশালায় আটক ছিল। আমরা এখনো ওর স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না।

সহানুভূতি, শব্দকোষে থাকা বহুল প্রচলিত একটা শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে সিমপ্যাথি। অভিধানে শিট (মলমূত্র) ও সিফিলিস (একধরনের রোগ) শব্দদ্বয়ের মাঝেই এর অবস্থান। পেশোয়ারে সেদিন রাতে এই শব্দটার টিকিটিরও অস্তিত্ব ছিল না। এক চিত্রগ্রাহক চিৎকার করে উঠল,

ওই পাপিষ্ঠাকে বের করো। এর সবই ধান্দাবাজি। আরেকজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে একজন ইতর সাংবাদিক। সব গুমর তার জানা। আরও অনেক গালিগালাজ ও ঘৃণাসূচক শব্দ শুনতে পেলাম।

এমনকি যখন আমাকে আমেরিকান গোয়েন্দা হিসেবে জালালাবাদে প্রদর্শন করা হয়েছিল, তখনো আফগান বা তালেবানদের কেউই এ ধরনের হিংস্রতা বা গালি দেয়নি। তারা হয়তো আকাশে গুলি ছুড়েছে কিন্তু সেদিনের জমায়েতটা আরও কুৎসিত রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল। আমার সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি কী শুনছি। এমনকি অত্যাচারী তালেবানরাও এ রকম বাক্য ব্যবহার করেনি। উল্টো আমি তাদের কাছে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি। ব্যাপারটা সত্যিই বিভ্রান্তিকর। কেন এমন হচ্ছে?

শাহজাদা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একরকম ধাক্কা দিয়েই সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। ওর অফিসে পৌঁছে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ডেভিড আমার অবস্থা জানতে চাইলে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি। ও এরপর তৃতীয়বারের মতো আমাদের হাইকমিশনের কারও সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। অবশেষে কূটনৈতিক কর্মকর্তা কলিন মুঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হই আমরা। ততক্ষণে আমার মুক্তির সংবাদ হাইকমিশনে পৌঁছে গেছে। তিনি আমাকে ব্রিটিশ হাইকমিশনে নিয়ে যেতে আসছেন বলে জানান।

ডেভিড জানায়, *এক্সপ্রেস*-এর এক পরিচালক পল অ্যাশফোর্ড ও সালেহ হুসনুদ্দিন, একজন উর্দুভাষী আইনজীবীও ইসলামাবাদে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি লাফিয়ে উঠলাম। কী? অ্যাশফোর্ড? উনি ইসলামাবাদে এসেছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না। হায় খোদা! আমাকে তালেবানরা বলেছিল *এক্সপ্রেস*-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার মুক্তির জন্য তদবির করছেন। আমি ভেবেছিলাম হয়তো উনি লন্ডন থেকেই ফোনে কথা বলছিলেন। কিন্তু খোদ ইসলামাবাদেই তিনি চলে এসেছেন, তা কে জানত?

ডেভিড জানায়, আমি আটক হওয়ার পরমুহূর্তেই ও কোয়েটা থেকে সরাসরি ইসলামাবাদে চলে আসে। পল আসার আগ পর্যন্ত ওকে একাই প্রতিবেদক-কূটনীতিক-তদবিরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর পরের খবর আরও চমকপ্রদ ছিল।

সাংস্কৃতিক দূরত্ব কাটাতে সালেহ হুসনুদ্দিন সব জায়গায় তাকে সঙ্গ দেয়। ২০০০ সালের নভেম্বরে রিচার্ড ডেসমন্ডের ঘটনার পর থেকে আমি আর ওর মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কর্মস্থলে আমার টেবিলের কাছেই আইনগত প্রক্রিয়া সারার জন্য আলাদা দপ্তর খোলা হয়। পল অ্যাশফোর্ড ঠিক আমার বিপরীত দিকেই বসতেন অফিসে। আমরা তিনজন প্রায়ই একত্রে বসে চা-কফি পান করতাম।

ডেভিডের কাছে আমার পরিবারের খবর জানতে চাইলাম। কারণ, আমি জানতাম, আমার মা ইসলামাবাদের কোথাও অবস্থান করছেন। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা মাকে নিয়ে এতটাই উৎফুল্ল ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন, যেন তাঁরা সবাই সশরীরে মায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে, এই ১০ দিনে মা রাতারাতি ব্রিটিশ তারকা বনে গেছেন। সামনের দিনগুলোতে গার্ডেন গেটে মা গণমাধ্যমের সামনে যে চমৎকার ভূমিকা রাখতে যাচ্ছিলেন, তা তখনো আমার ধারণার বাইরে ছিল।

এক কোনায় শান্ত চুপচাপ একজন তরুণ বসে ছিল। ডেভিড পরিচয় করিয়ে দিল– আকবর শিনবারি। এই কয়েকটা দিন ডেভিডের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গাড়ি ঠিক করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা, কাগজপত্র জোগাড় করা–আমার মুক্তির জন্য যা যা করণীয় ডেভিড আর ও মিলে রাজ্যের কাজ সমাধা করেছে। এমনকি বের হওয়ার সময় গন্ডগোল করতে থাকা নাছোড়বান্দা গণমাধ্যমের চোখ ফাঁকি দিতে ও একটা বোরকাও কিনে নিয়ে এল। বুদ্ধিটা দারুণ কাজে দেয়। গুটি কয়েকজন মাত্র বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে গাড়ির পেছনে বোরকা পরিহিত নারীই আমি।

কলিন মুক্ক একটা রেঞ্জ রোভারে করে এলেন। অবশেষে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা। আমার শরীরে আর কুলাচ্ছিল না তখন। তবে কলিন খুব স্নেহপ্রবণ আর ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। এ জন্যই বোধ করি তিনি কূটনীতির চাকরি বেছে নিয়েছেন। রাজধানী ইসলামাবাদের দিকে যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সম্ভবত, আটক অবস্থায় তুমি খুব কঠিন সময় পার করে এসেছ। আগে কখনো বিদেশি জেলে ছিলে?' কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে কোথাও গ্রেপ্তার বা আটকের পর কী করতে হয়, তা শেখানো হয়।

আমি আগে কোনো দিন কোনো জেলেই বন্দী ছিলাম না। অবাক হলাম উনি কেন এসব প্রশ্ন করেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার এমন অদ্ভুত প্রশ্নের

সম্মুখীন হলাম। আমি বলতে থাকলাম, ইরাক বা ইরানে আটক হলে হয়তো আমি ওদের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতাম কিন্তু এ মানুষগুলো ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আমি তালেবানদের সর্বোচ্চ চাপে রাখার চেষ্টা করেছি। ওদের বুঝিয়েছি, আমি তোমাদের শান্ত নিরীহ নারীদের চেয়ে অন্য কিছু। এটা দারুণ কার্যকর ছিল এবং ফলাফল আমি এখানে বসে আছি। আশা করছি, আমাকে ইসলামাবাদে আর কটা দিন থেকে অসমাপ্ত কাজগুলো সমাধা করতে দেওয়া হবে।

তিনি বললেন, কোনোভাবেই আমাকে থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সবাই এখন আমাকে চেনে। ফলে নিরাপত্তাঝুঁকিও বেড়ে গেছে। তখন আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে গত কয়েক দিন আমিবিহীন পৃথিবীতে কী কী ঘটেছে। আমাকে নিয়ে গণমাধ্যমে দুর্দান্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। শোরগোল পড়ে গিয়েছিল চারদিকে।

এমন সময় কলিনের ফোন বেজে উঠলে তিনি মুঠোফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দেন। ওপ্রান্তে পলের কণ্ঠস্বর শুনেই আমার হাত-পা অবশ হয়ে এল। তাঁকে বিধ্বস্ত, ক্লান্ত ও একই সঙ্গে খুশি মনে হচ্ছিল। আমি এ রকম উটকো ঝামেলা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এরপর আমাদের পত্রিকার কাটতি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। 'ইভন, এটা পত্রিকার কাটতি নিয়ে কথা বলার সময় নয়। আমরা জানতে চাই তুমি কেমন আছ। তুমি জানো না আমাদের ওপর দিয়ে কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে। তবে তোমাকে ফিরে পেয়ে আমরা যারপরনাই আনন্দিত।'

সেদিন মুঠোফোনের ফাঁক গলে যে উষ্ণতা আর সৌহার্দ্য ভেসে আসছিল, তা আমি নিজ কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারিনি। সবার ধারণা, অ্যাশফোর্ড কাঠখোট্টা আর ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। বরং মোটেই তা নয়। অ্যাশফোর্ড লম্বা গড়নের হ্যাংলা ধরনের মানুষ। অফিসে যখন গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে উনি হেঁটে বেড়ান, তখন মনে হয় বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। আমাদের চেয়ারম্যান রিচার্ড ডেসমন্ডের একরকম ডান হাত হিসেবে কাজ করেন উনি। এ জন্য বোধ হয় উনি অনেকের চক্ষুশূল।

ঘড়ির কাঁটা তখন ১১টার ঘর অতিক্রম করেছে। তাই পরদিন ভোরে হাইকমিশন অফিসে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পৌঁছানোর পর একজন চিত্রগ্রাহক আমার চিত্র ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চত্বরের ভেতর রাষ্ট্রদূত হিলারি সিনট ও তাঁর স্ত্রী অ্যানি আমাকে অভিবাদন জানানোর জন্য

অপেক্ষা করছিলেন। কী খাব জানতে চাইলে জবাব দিই, বড় এক পেয়ালা স্কচ ও বেকন স্যান্ডউইচ। পরমুহূর্তেই বলি, স্যান্ডউইচটা মজা করে বলেছি। বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

যা-ই হোক, অ্যানি তখনই অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সুস্বাদু বেকন স্যার্নি নিয়ে হাজির হলেন। ইতিমধ্যেই বাড়ির ফোনে সংযোগ করতে সক্ষম হই। ফোনটা রিসিভ হলে ও পাশ থেকে একটা অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কে? জানতে চাইলাম। মার্ক ব্ল্যাকলক, নিউক্যাসলভিত্তিক একজন এক্সপ্রেস সাংবাদিক। তার দায়িত্ব হচ্ছে আমার মাকে পাহারা দিয়ে রাখা, যাতে করে সংবাদ সংগ্রাহকেরা তাঁকে ছেঁকে ধরতে না পারে। ঘোলাটে একটা পরিস্থিতি।

অবশেষে টেলিফোনের ওপাশে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁকে খুবই উৎফুল্ল ও খুশি মনে হচ্ছিল। মাকে জানাই, পরদিন সকালে বিস্তারিত কথা বলব। আমার মুক্তির সংবাদে ডেইজি এতটাই উত্তেজিত হয়ে আছে যে ফোনে কথা বলার সময় পায়নি। নানির কাছে সংবাদ শোনার পরই লাফাতে লাফাতে বন্ধুদের এই খবর পৌঁছে দিতে বাইরে চলে গেছে।

এদিকে হিলারির আতিথেয়তা ছিল দেখার মতো। উনি আমাকে যাবতীয় সংবাদ জানাতে লাগলেন। কয়েদখানার ভেতরে আমি যে সাহসী ও উদ্ধত বন্দীর মতো আচরণ করেছি, সে খবরও তাঁর কানে পৌঁছেছে বলে জানান তিনি। তালেবান রাষ্ট্রদূত জায়িফ জানিয়েছেন এ কথা।

উপরন্তু জায়িফই তাঁকে সীমান্তে লোক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁর মতে, আমি তালেবানদের বিরুদ্ধে খুব বাজে কথা বলছিলাম। হাইকমিশনের কর্মকর্তারা যেন আমাকে থামাতে সেখানে উপস্থিত থাকেন। যাক, পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্ধর্ষ রাজত্ব নিজেদের ভেতরের খবর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। পাছে আমি না আবার সব প্রকাশ করে দিই, এ ভয় ওদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে এত দিন। হিলারিও ব্যাপারটিতে মজা পেয়েছেন। জায়িফের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। চাইলেই তিনি সাংবাদিকদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে পারবেন না। আমি ভাবলাম, মুক্তি পাওয়ার আগে এসব কথা হিলারি না বললেই পারতেন। ভাগ্য ভালো, হিতে বিপরীত হয়ে যায়নি।

আমার বোঁচকাটা নিয়ে ওপরের তলায় গেলাম। ক্রাউন প্লাজায় আমার ভাড়া করা রুম থেকে সব জিনিস গুছিয়ে ডেভিড একটা পোঁটলা বানিয়েছে। ছেলেরা কখনোই ঠিকমতো কিছু গোছাতে পারে না। যা-ই হোক, উল্টেপাল্টে দেখলাম, কিছু জিনিস বাদ পড়েছে। গ্রেনেডসমেত কৌটায় প্রোভোকেটিয়ারের একটা বেশ দামি সুগন্ধি ছিল। ওটা পাওয়া গেল না। জানি না কে নিয়েছে কিন্তু কী ভেবেছে কে জানে আমাকে তো অনুচর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয় তারা আমার রুম তল্লাশি করে এই গ্রেনেডটা খুঁজে পেয়েছিল।

এরপর নাইতে নেমে গেলাম। না, এবার আর কোনো জিঙ্কের বালতি বা ঠান্ডা পানি নয়। আহ্ কী আনন্দ! সবকিছু কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো। চারপাশ গন্ধে ম-ম করছে। রাতের পোশাকটা খুঁজে না পেয়ে উসামা বিন লাদেন টি-শার্টটাই গায়ে চাপিয়ে নিই। এরপর সোজা লেপের নিচে, যেন স্বর্গে এসে পড়েছি।

পরদিন সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙে গেল। হাইকমিশনের বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে পড়ি। বাগানে হরেক রকম ফুলের গাছ। এক পাশে একটা কৃত্রিম ঝরনা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। বাড়ির এক কোণে আরও একটা সংরক্ষিত বাগান দেখতে পেলাম। তবে এই গাছগুলো স্থাপত্যকলার দৃষ্টিতে দেখলে বেমানান লাগে।

সিনটের দুটি পোষা কুকুর। আমার কুকুরের প্রতি নাক সিঁটকানোর কথা সবাই জানে। একটাকে দেখলাম একটা বিড়ালকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিড়ালটা নির্বিকার ভঙ্গিতে নিরাপদ দূরত্বে একটা দেয়ালের ওপর বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমি কুকুরটাকে একটু ধমক দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু ওর কাছে আমাকে কেন পছন্দ হলো কে জানে, আমার পিছু পিছু বাগানের সিঁড়ি পর্যন্ত চলে এল।

অ্যানি সুপ্রভাত জানাতে এগিয়ে এলেন। বাগানের এক পাশে নাশতার টেবিলে বসার জন্য আহ্বান জানান তিনি। কী সুন্দর ও সভ্য নিয়মে একটা নতুন দিন শুরু করতে যাচ্ছি। ডেভিড স্মিথ একটু পরে আমার সঙ্গে যোগ দেয়। ও আমার বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতার পরবর্তী কিস্তি লেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ওকে আমার গোপন ডায়েরিটার কথা জানিয়েছিলাম আগেই। এবার ও সেই ডায়েরিটাতে একনজর চোখ বোলাতে চাইল। কিন্তু এটা তো লিখেছি

*সানডে এক্সপ্রেস*-এর জন্য। ওর কাছে আমার সুগন্ধি বোতলটার কথা জানতে চাইলাম। আমার রুমে এমন কিছু ওর চোখে পড়েনি বলে জানায়। ও বলতে থাকে, 'তোমার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না প্রথমে। তুমি বেঁচে আছ না মরে গেছ, এ রকম পরিস্থিতিতে তোমার ব্যবহৃত হোটেল রুমে প্রবেশ করা ছিল একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা। কক্ষটা ছিল অগোছালো। মনে হচ্ছিল, সদ্য কেউ বিছানা থেকে উঠে বাইরে গেছে। তখনো টেলিভিশন চলছিল। রুমের সব লাইট আমি জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। দরজার বাইরে তখনো 'বিরক্ত করবেন না' লেখা চিহ্নটা ঝুলছিল।'

ডেভিড বলতে থাকে, 'তোমার কক্ষে রাখা ব্যাগে পাসপোর্ট জায়গামতোই ছিল। কিন্তু কোথাও তোমার বিখ্যাত কার্টিয়ার হাতঘড়িটা খুঁজে পাইনি। অথচ ওটা খুঁজে বের করতে আমাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। পরে অবশ্য হোটেলের নিচতলার সেফ থেকে ওটা খুঁজে পাই। আর হ্যাঁ, তোমার কক্ষের সেফটা কিন্তু খোলা ছিল।'

ওর কথা শুনে আমি খুব অবাক হই। ডেভিডকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই, কিন্তু না। বেরোনোর আগে আমি সবকিছু বন্ধ করে বের হয়েছিলাম। কেউ নিশ্চয় প্রবেশ করেছিল আমার কক্ষে। তালেবানরা কি কাউকে পাঠিয়েছিল? জেরার সময় আমি ওদের আমার কক্ষ নং ও পাসপোর্ট কোথায় রেখেছিলাম বলে দিয়েছিলাম।

একটা অমূলক সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল মনের ভেতর। পরে জানতে পারলাম, ইতালির একজন সাংবাদিক ঘুষ দিয়ে আমার কক্ষের ভেতরটা ভিডিও করেছিল। *এক্সপ্রেস*-এর চিত্রগ্রাহকেরাও আমার ২০৯ নং কক্ষে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ওদের তোলা ছবিগুলোর সঙ্গে যে অবস্থায় কক্ষ ত্যাগ করেছিলাম, তার কোনো মিল খুঁজে পেলাম না। আমার যোগাযোগের খাতাটা পড়ে ছিল খোলা অবস্থায়। বিছানা ছিল অগোছালো। সুগন্ধির বোতলটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এবং অবশ্যই আমি দরজায় বিরক্ত করবেন না চিহ্ন ঝুলিয়ে যাইনি।

তখন বিষয়টা নিয়ে অত ভাবার সময় ছিল না। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল প্রয়োজনীয় আরও অনেক চিন্তা। তবে একটা সুযোগ ও পরবর্তী কিছু ঘটনাপ্রবাহ আমাকে আবার ২০৯ নং কক্ষেই ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

# অবশেষে মুক্তি

পরদিন সকালে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মান দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা আমার সঙ্গে সদলবলে সাক্ষাৎ করতে আসেন। জার্মানিভিত্তিক দাতব্য সংস্থার আটক হওয়া আটজন সাহায্যকর্মীর ব্যাপারে তাঁরা সবাই উদ্বিগ্ন। আমার কাছে জানতে চাইলেন কী অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে? কেমন আছে সবাই?

ওদের কাছে সংবাদ পৌঁছাতে পেরে আমার খুব আনন্দ অনুভূত হলো। জার্মান টিমের সদস্য জর্জ টবম্যান, ক্যাথি জেলিনেক, মার্গারিট স্টেবনার ও সিল্কে ডার্কোফ সবাই খুব ভালো আছে। আমার ভাষ্যমতে, খোদার প্রতি তাদের চরম আস্থা রয়েছে। খোদার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও মনের শক্তির জোরেই তারা এখনো টিকে আছে। আমার কথা শুনে তাঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে ফিরে গেলেন।

এবার আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে জানালাম ডায়ানা বেশ ভালো ও সুস্থ আছে। তবে ওদের দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যাকে নিয়ে একটু আশঙ্কা রয়েছে। হিথার মার্সার, বিপদের মুখে ও সহজেই ভেঙে পড়ে। আমি ওদের সঙ্গে খুব অল্প সময় কাটিয়েছি। এই সময়ের মধ্যেই আমার কাছে হিথারকে খুব প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমতী ও বন্ধুবৎসল মনে হয়েছে। তবে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত হওয়ার খবর শোনার পর ওর অস্থিরতা আমিসহ সবাইকেই চিন্তিত করেছিল।

আমি অনুরোধ করলাম, তোমরা দ্রুত ওদের বের করে আনার ব্যবস্থা করো। ওদের ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর কত দিন ওরা, বিশেষ করে হিথার আর কত দিন টিকতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই যাচ্ছে।

পরে কারাগারের একটা নকশা এঁকে ফেলি। সবগুলো ঢোকার ও বের হওয়ার পথ চিহ্নিত করে দিই। পাহারাদারদের কাজের রুটিন উল্লেখ করি। চারপাশের দেয়ালের অবস্থা ও ভেতরের গর্তগুলো চিহ্নিত করে দিই। যে চত্বরে প্রচুর হাঁটাহাঁটি করেছি সেটার আয়তন অনেক আগেই মনে মনে মেপে নিয়েছিলাম। তা-ও উল্লেখ করতে ভুলি না।

আমেরিকান কনস্যুলের প্রধান কর্মকর্তা ডেভিড ডৌহাউ গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শোনেন। আমার কথা শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ডায়ানার মা ন্যান্সি ক্যাসেলের ফোন নম্বর ধরিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা খুব দুশ্চিন্তা করছেন এবং আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন।

আমার প্রদত্ত তথ্যগুলো কী কাজে লাগত, তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমি মনে মনে আশা করছিলাম, বিশেষ বাহিনীর একটা দল ঝটিকা আক্রমণ করে ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। সাহায্য সংস্থাটির পরিচালক জর্জ ও পিটারকে মেয়েগুলো থেকে দূরে ও আলাদা একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল। সপ্তাহে মাত্র একবার তাদের দেখা হতো। এটাই ছিল উদ্ধার অভিযানের প্রধান বাধা। মেয়েগুলোকে মুক্ত করার সময় যদি ওদেরও বের করে আনা সম্ভব না হয়, তাহলে তালেবানরা নির্ঘাত ওদের মেরে ফেলবে। যদিও জর্জ তালেবানদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। পরিস্থিতিটা সংশ্লিষ্ট সবাইকে একটা উভয়সংকটে ফেলে দিয়েছিল। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ইরানে বন্দী আমেরিকান নাগরিকদের মুক্ত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা শেষ হয়েছিল রক্তপাতের মাধ্যমে। অতএব, শক্ত ও কঠিন মানসিকতার একজন প্রেসিডেন্টের পক্ষেই কেবল এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ একটা পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

যা-ই হোক, আমার সাধ্যে যতটুকু কুলায় তা আমি করেছি। এখন শুধুই ওদের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। আমি শয়নকক্ষে ফিরে যাই এরপর। এই কক্ষের পাশের ঘরেই টনি ব্লেয়ার সর্বশেষ ইসলামাবাদ ভ্রমণের সময় অবস্থান করেছিলেন। শরীরে ঘামাচির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। ওদের ঘরে মাছি বা পোকাজাতীয় কিছু নিয়ে এসেছি কি না এ ভয়ে অ্যানির কাছে আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিই।

এই মহিলা কখনোই বিচলিত হন না। অন্য কোনো গৃহিণী হলে হয়তো এতক্ষণে আমাকে ঘাড় ধরে বাইরে বের করে দিতেন। অথচ অ্যানি একটুও

বিরক্ত হলেন না। একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে দিয়ে পরে ঘর পরীক্ষা করে দেখবেন, শুধু এতটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত দিলেন। অ্যানি খুব ভালো মানসিক পরামর্শ দিতে পারেন। মাথা থেকে যদি কোনো দুশ্চিন্তা দূর করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে যেন তাঁকে জানাই। মনে হলো, আমাকে সাহায্য করতে পারলে তিনি বেশ খুশিই হবেন।

পল অ্যাশফোর্ড ও সালেহা এসে পৌঁছালে অনেকক্ষণ আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করি। সালেহা একটা সুন্দর সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে। মেয়েটাকে দেখতে দারুণ লাগছে। আমরা ওপরে গিয়ে গল্প করতে লাগলাম। এরই মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী সব ধরনের ক্রিম, লোশন বোঝাই ব্যাগ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শরীরের ঘামাচির দাগগুলো দেখাই। না, যা ভেবেছি তা নয়। তীব্র গরমেই এমন হয়েছে বলে তিনি জানালেন। এর পরই তিনি জানতে চাইলেন, আমি যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছি কি না। আমার কাছ থেকে না-বোধক উত্তর শুনেই তিনি চলে গেলেন।

পরদিন মনে হলো, ডায়ানার মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। কিন্তু খুব অপরাধবোধ হচ্ছিল। নিজেকে এতটাই ভিতু আর কাপুরুষ মনে হচ্ছিল যে কী করে ফোন করব তাই বুঝে আসছিল না। এই অবর্ণনীয় মানসিক চাপ কমাতে অবশেষে অ্যানির দ্বারস্থ হলাম। আমি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলাম অবৈধভাবে। পরে আটক হই, তালেবানদের সঙ্গে মারাত্মক খারাপ ব্যবহার করি এবং ১০ দিন পর মুক্তি পেয়ে চলে আসি। ব্যস, এতটুকুই করেছি আমি। অন্যদিকে ডায়ানা মেয়েটা আফগানিস্তানের গরিব অসহায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় নিজের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছে। এবং বর্তমানে বিভিন্ন অভিযোগে বন্দিনী হয়ে ধুঁকছে। এখানে ন্যায়বিচার কোথায়? ডায়ানার মা হলে আমি নিজেকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম। কখনোই কথা বলতে চাইতাম না নিজের সঙ্গে।

নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি এতটা ভিতু কাপুরুষ না-ও হতে পারি। ডায়ানা বেশ সাহসী মেয়ে। ওর মাকে না জানালে বড্ড অপরাধ হবে।

আমরা বিষয়টা নিয়ে বেশ সময় ধরে কথা বললাম। অবশেষে আমি ফোন করার জন্য মানসিক শক্তি ফিরে পেলাম। ন্যান্সি একজন চমৎকার নারী। আমি তাঁকে জানাই, আপনি এক বিরল সাহসী ও সুন্দর মেয়েকে

পেটে ধরেছেন। ওর মানসিক শক্তি এতই বেশি যে, বন্দিদশাতেও সে রূপচর্চা করত। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার করত। যদিও সেখানে তাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতো কেউ ছিল না। জেলের জীবন ছিল বড় একঘেয়েমিপূর্ণ।

ডায়ানা ছিল আমার জন্য বিশেষ একজন। অসম্ভব ভালো ও দয়ালু মনের অধিকারী। মনে আছে, একদিন ওর হাতে চোখের পাপড়ি সাজানোর কার্লার দেখি। জেলখানার ভেতরে কার্লার? মানুষের মন কতটা ইতিবাচক হলে জেলখানার ভেতর চোখের পাপড়ি সাজাতে বসে? সেদিন আমরা বেশ মজা করেছিলাম।

ন্যান্সিকে আমি যা যা বলছিলাম, তার সবই তিনি জানতেন। তবু আমার মুখ থেকে শুনে তিনি বেশ শান্তি পাচ্ছিলেন বুঝতে পারি। ওনাকে এতটুকু সাহায্য করতে পেরে আমার মনটাও ভালো হয়ে গেল। অ্যানির জ্ঞানী জ্ঞানী কথা আমার অন্তরে রেখাপাত করেছে।

ইংলিশ ফুটবল টিমের একটা গেঞ্জি পরেছিলাম। ওই অবস্থাতেই গ্যারি ট্রটার আমার ছবি তোলে। সেন্ট জেমস পার্ক স্টেডিয়ামে যেদিন ইংল্যান্ড ফুটবল দল আলবেনিয়াকে হারিয়ে দিল, সেদিনই এই গেঞ্জিটা কিনেছিলাম। ওই দিন গ্যারি আরও একবার আমাকে দেখতে আসে। ও জানায়, লন্ডন বিশেষ করে *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর পক্ষ থেকে ফুলের ছাপযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে।

কিন্তু আমার এ রকম কোনো পোশাক নেই। কোনো দিন ছিলও না। এখন কারও অনুরোধে ফুলের ছাপওয়ালা পোশাক পরিধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওকে জানালাম, এই মুহূর্তে আমার সংগ্রহে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। তবে গ্যারির পরনের টি-শার্টটা পরে আমি ছবি তুলতে পারি। এরপর ওর গায়ের টি-শার্ট পরে আরেক দফা ছবির জন্য পোজ দিই। এসব ছবি কোনো দিন ছাপা হয়েছিল কি না জানি না।

রানি ভিক্টোরিয়ার একটা পুরোনো মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আগের কোনো একজন রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের কোনো এক গ্রাম থেকে এটি উদ্ধার করে এনেছিলেন। মূর্তিটা দেখতে সুন্দর লাগে, যতক্ষণ না নিচের দিকে লক্ষ করা হয়। বেচারা ভিক্টোরিয়ার কোনো হাত ছিল না। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন একজন কর্মকর্তা। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে তিনিও মজা

করতে ছাড়লেন না। হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়ার ছোটখাটো চুরির অভ্যাস ছিল। এ অপরাধে তালেবানরা ওর হাত কেটে দিয়েছে।

দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানালেন, দুবাই হয়ে লন্ডনগামী ফ্লাইটে আসনের ব্যবস্থা করা যাবে। তাই আমি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। কোথাও যেতেও পারছি না। আমার চেহারা এখানে সবাই চিনে ফেলেছে। তাই সুযোগসন্ধানী যে কারও হেনস্থার শিকার হতে পারি।

আমিরাতের ফ্লাইটে ওঠার পর পল, সালেহা ও আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। সম্ভবত বিমান উড্ডয়নের আগেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আমি ছিলাম শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত। আর ওরা দুজন শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে আমরা দুবাইয়ের মাটিতে পা রাখি। এখানে এসে আমাদের পরবর্তী ফ্লাইটের সময় পিছিয়েছে বলে শুনতে পেলাম। আমি আর সালেহা তাই বিমানবন্দরের দোকানগুলো ঘুরে কেনাকাটা করতে চলে যাই। গভীর একটা ঘুম হয়ে যাওয়ায় পরের ফ্লাইটে ওঠার পর শরীর বেশ হালকা লাগছিল। এই ফাঁকে পল ও সালেহা শোনাতে থাকেন আমার মুক্তির জন্য ওঁদের সংগ্রামের গল্প।

আমার সাংবাদিক পরিচয় প্রমাণের জন্য তাঁরা শুধু কাঠখড়টাই পোড়াননি। গত ২৫ বছরের আমার সাংবাদিকতা জীবনের ইতিহাস, বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদকের চিঠি, বেতনের বই, আমার লেখা সংবাদ ইত্যাদি সবকিছু তাঁরা সংগ্রহ করেন। এরপর সমস্ত কাগজপত্র পশতুতে অনুবাদ করে তালেবানদের সহকারী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেন পল।

পরপর অনেকবার তাঁরা তালেবানদের সঙ্গে সমঝোতার উদ্দেশ্যে বৈঠক করেন। এসব বৈঠকের খবর কাবুলে থাকা অবস্থাতেই আমার কানে পৌঁছেছিল। শান্ত ও ভদ্র ব্যবহার না করলে আমাকে কোনো দিনও মুক্তি দেওয়া হবে না, তালেবানরা এ কথাও বলেছিল পলকে।

পল বললেন, 'আমরা তোমাকে ছাড়িয়ে আনার একদম কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এমন খারাপ ব্যবহার করছিলে যে মনে হচ্ছিল আমি নিজেই কাবুল গিয়ে তোমাকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিই।' তবে পল স্বীকার করেন, এই দোদুল্যমান অবস্থা অনিশ্চয়তার চরমে গিয়ে পৌঁছায়, যখন

আমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগের রাতেই বিমান হামলা শুরু হয়। সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে, এমনটাই ভেবেছিল সবাই।

এরপর পল আমার সঙ্গে তালেবানদের মোলাকাতের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন। এটা একটা বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন, প্রত্যুত্তরে জানাই আমি। যদিও তালেবানদের নিষ্ঠুরতার কথা সর্বজনবিদিত, তবু ওরা আমার সঙ্গে সম্মানসূচক ব্যবহার করেছে। এই কথা হয়তো অনেকেরই পছন্দ হবে না, তবে অপ্রিয় হলেও সত্যটা আমাকে বলতেই হবে।

পলও দেখি আমার কথায় সম্মতি দিলেন। তিনি বলেন, 'অনেকের পছন্দ না হলেও ওরা আমাকে খুবই সৌজন্যবোধ দেখায় ও খাতিরদারী করে। একটা সময় ওরা তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা কথা রেখেছে। তারা সর্বদাই নিজস্বতাবোধ বজায় রাখত। রিচার্ড এখানে আসার দিন আমাকে একটা চেক দিয়ে দেয়। কিন্তু টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করলে শুধু শুধু আমরা বিপদ ডেকে আনতাম।'

আরও একজন প্রতিবেদক তালেবানদের হাতে আটক হয়েছেন বলে পল জানান। তিনি হলেন মাইকেল পেরার্ড। বোরকা পরিহিত অবস্থায় জালালাবাদ থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁকে আটক করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেলের কর্মস্থল প্যারিস ম্যাচের পক্ষ থেকে পলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মাইকেলের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ আনা হয়। ওঁর কর্তৃপক্ষ পলের কাছে আমার মুক্তির উপায় জানতে চেয়েছিল। এমনকি মাইকেলকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য করার অনুরোধও জানায় ওরা।

আহ্ কী উত্তেজনায় দিনগুলো কেটেছে, একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। অফিসে গিয়ে আবার সেই খবরের কাগজ উল্টানোর একঘেয়েমিপূর্ণ জীবন। জীবনে কি আর এমন রক্ত হিম করা মুহূর্ত ফিরে পাব?

আমাদের বহনকারী বিমান হিথরোতে নামার প্রস্তুতি নিলে উৎকণ্ঠায় ভুগতে শুরু করি। যাক, আপন ভুবনের মাটি শেষ পর্যন্ত, আমার গায়ে তখন একটা চামড়ার জ্যাকেট জড়ানো। মাথায় একটা বেসবল ক্যাপ খুব শক্ত করে চাপিয়ে দেওয়া। উষ্কখুষ্ক জট লাগা চুল ঢাকতেই এই ব্যবস্থা। আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে চুলের রং করেছিলাম। সেই রং নষ্ট হয়ে বিশ্রী খড়ের মতো দেখাচ্ছে চুল। পুরোটাই কেটে ফেলতে হবে বোধ হয়, মনে

মনে ভাবতে থাকি। দীর্ঘদিন চোখের কোনো যত্ন নিইনি। মেকআপও দেওয়া নেই। দ্রুত একটা সানগ্লাস চোখে লাগাই।

নামার সময় এত বিপুল পরিমাণ গণমাধ্যমকর্মীর সমাগম হবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু এ যেন মানুষের সমুদ্র। অগত্যা অধিকাংশ প্রশ্ন এড়িয়ে দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করি। এক কোণ থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ কানে এসে লাগে। কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে– ইভন রিডলি! জেন ড্রিপার। নিউক্যাসলে খুব নাছোড়বান্দা প্রতিবেদক হিসেবে সুনাম ছিল তার। এখন একটা টেলিভিশন চ্যানেলের কর্মী। মেয়েটাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। মন চাচ্ছিল ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু না থাক, নিরাপদ কোথাও পৌঁছানোর আগে এমন কিছু করা ঠিক হবে না।

ওয়েটিং রুমের ভেতর আমার বোন ভিভ বসে ছিল। দেখা হতেই দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলি। আমার মাথায় টোকা দিয়ে ভিভ অনুযোগের সুরে বলতে থাকে, এত দিন ধরে আমাদের ঘুম হারাম করে রাখার জন্য এই শাস্তি। আরও অনেকেই তোমাকে শাস্তি দিতে বাইরে অপেক্ষা করছে। আরে, ওই তো জিম মুরে, আমার সম্পাদক। ওকে কেমন হতভম্ব দেখাচ্ছে। ইশ্, বেচারাকে কী নরক যন্ত্রণাই না দিয়েছি এত দিন।

যেতে যেতে জিম শুক্রবারে আমার আটক হওয়ার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ শুনাতে থাকে। সেদিন ও বসে ছিল বার্তা কক্ষে। তখনো কারও সন্দেহ হয়নি। অন্য সহকর্মীদের জিম বলেছিল, রিডলির সঙ্গে এখনো যোগাযোগ হয়নি। তবে ও খুব দ্রুতই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে এল বলে। সেই সপ্তাহে ঘড়ির কাঁটা খুব ধীরে চলছিল। প্রথম সাত পৃষ্ঠার খবর বাছাই করতে গলদঘর্ম সবাই।

বার্তাকক্ষে পায়চারি করার সময় কেউ একজন একটা সংবাদের প্রতি জিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদেশি সংবাদ সংস্থার পাঠানো সংবাদে লেখা ছিল, আফগানিস্তানে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক তালেবানদের হাতে আটক হয়েছেন। অসমর্থিত সূত্রগুলো থেকে আটক সাংবাদিক হিসেবে আমার নাম আসছিল। জিম সোজা সংবাদকক্ষে গিয়ে সবাইকে সংবাদটা জানিয়ে দেয়।

সেই রাতে প্রতিবেদক ডিক ডিসমুরে বিচলিত না হয়ে এই সংবাদটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। দ্রুত এ-কান ও-কান হয়ে খবরটা জেনে যায় সবাই। হতবিহ্বল কর্মীরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। ডিক খুব

পেশাদার লোক। আবেগহীনভাবে বেশ সাবলীলভাবেই এ কথাটা বলেছে ও। কিন্তু নিশ্চয়ই আশা করছিল এটা যেন একটা গুজব হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় নির্ধারণ করতে পল অ্যাশফোর্ডকে ডাকা হয়। তিনি সরাসরি বলে ফেলেন, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে রিডলি বেঁচে ফিরে আসতে পারে। এ কথা আমাকে জানিয়ে পল নিজেই হেসে ফেলেন। এই জগৎটাতে চুটকি বলা লোকের অভাব নেই। কিন্তু মাঝেমধ্যে জীবন এমন সংকীর্ণ গলিতে গিয়ে আটকে যায় যে সব ফেলে রেখে নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য ছুটতে হয়।

আমাদের গাড়ি লেক ডিস্ট্রিক্টের দিকে যেতে থাকে, যেখানে আমার মেয়ে ডেইজির আবাসিক স্কুল। পথে যেতে যেতে বিগত ১০ দিনের সব অজানা গল্প পল বলে যান।

'ইভন, বিভিন্ন তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছু অজান্তেই জেনে ফেলেছি। এখন তোমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমাদের কল্পনাতেও ছিল না যে তুমি এতবার বিয়ে করেছ। তা-ও আবার একজন ফিলিস্তিনির পরে আবার একজন ইসরায়েলি ব্যক্তির সঙ্গেও।'

আসলে আমার অনেক স্বজন ও বন্ধুর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে। তখনই ফাঁস হয়ে যায় সব গুমর। এমনকি সামরিক বাহিনীতে থাকা কয়কজনের সঙ্গেও কথা হয়েছে ওঁর।

ম্যালকম এক্সের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে জানান। ও বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য। আমার বন্ধুদের তালিকায় ওর মতো দুর্ধর্ষ আরও অনেকেরই অস্তিত্ব রয়েছে।

জিম বলে, ম্যালকম এক্স খুব দুশ্চিন্তা করছিল আমার জন্য, আফগানিস্তানে একটা বিশেষ দল পাঠানোর জন্য ও প্রস্তাব দিয়েছিল। ম্যালকম ছাড়াও জিমকে আরও অনেকেই কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে আমাকে মুক্ত করতে পরামর্শ চেয়েছিল।

বাহ্, পল আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছেন। ভাবতেই ভালো লাগছে। এই লম্বা দাড়িওয়ালা মানুষটা যে ভেতরে ভেতরে এত যত্নবান, তা কে জানত! তবে যদি একদল বেপরোয়া বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা ঝটিকা অভিযান চালিয়ে আমাকে উদ্ধার করত, তাহলে বোধ হয় আরও উত্তেজনা

অনুভব হতো। এমনকি অন্ধকার জগতের অনেক অপরাধীও আমার জন্য ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল। এটা একটু বেশি হয়ে যেত একদল গাঁট্টাগোট্টা লোক দুর্ধর্ষ তালেবানদের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে ছিনিয়ে আনছে।

আমার বন্দিত্বের সময়টায় লন্ডনে একরকম ঝড় বয়ে গেছে। যাত্রাপথের এসব গল্পের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও জমে ওঠে। আমার বন্দিজীবনের প্রথম দিনটা ছিল রোববার। সেদিন জিমের কাছে একটা ফোন আসে। কেউ একজন জানায়, আগামী মঙ্গলবার প্রকাশ্য দিবালোকে আমার গর্দান নেওয়া হবে।

এমনিতে ফোনের ওপাশের লোকটা নির্ভরযোগ্য। ওর মাথায় খারাপ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী জিমকে মেইল করেছিল। মেইলের ভাষ্যটা ছিল এ রকম– কাবুল থেকে যে তদন্ত দল রিডলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছে, তা আদতে একটা নির্যাতন টিম। এদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের কবল থেকে বেঁচে ফিরে আসা অসম্ভব। খুব কম বন্দীই এদের হাত থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে বাঁচতে পেরেছে। তাই এদের নির্যাতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষীও খুব বেশি নেই।

আমার পুরো বন্দিত্বের সময়টাতে জিম সম্পাদকের কাজ বাদ দিয়ে আলাদা ডেস্কে জরুরি বিপদ মোকাবিলা বিভাগ খুলে বসেছিল। আমার ব্যাপারে বাইরের দুনিয়ায় যত তথ্যের আদান-প্রদান হচ্ছিল, তার সবকিছুর ওপরই নজর রাখা হতো। অন্তত আমার দুটি ব্যক্তিগত তথ্য আমার জীবননাশের জন্য যথেষ্ট ছিল। এক. আমি ব্রিটিশ আঞ্চলিক বাহিনীর একজন সাবেক সদস্য। আর দুই. আমার সাবেক স্বামীদের একজন স্বয়ং ইসরায়েলের নাগরিক। এ তথ্যগুলো কিছুতেই গণমাধ্যমে ছাপা না হয়, তার জন্য জিমদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

এসব সংবেদনশীল তথ্য গোপন রাখতে জিম দায়িত্ব দেয় রেবেকা ওয়েডকে। ভদ্রমহিলাও আমার মতো ইংল্যান্ডের বিখ্যাত হাতে গোনা কয়েকজন নারী সাংবাদিকের অন্যতম। রেবেকা নিজ দায়িত্বেই বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক, প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলে গোপন তথ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা করেন। *অবজারভার*-এর সহকর্মী বারবারা গানেল ও ট্রেসি ম্যাকভি এবং *গার্ডিয়ান*-এর হেলেন কার্টার আমার সমর্থনে প্রথম ডাউন স্ট্রিটে মোমবাতির আয়োজন করে। নারী সাংবাদিকদের পুরো দল তাতে যোগ দেয়।

বান্ধবী জুলিয়া হার্টলে ব্রিওয়ার লেবার পার্টির প্রভাবশালী নেতাদের কাছে ধরনা দিয়েছে। জিমের একজন চাচা পরিবহন ও সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠনের প্রাক্তন প্রধান। জিম তার চাচাকে দিয়েও আমার সমর্থনে সমাবেশের আয়োজন করে। বেশ কয়েকজন সাংসদ তালেবানদের কাছে আমার নিরাপত্তা ও মুক্তি দাবি করে লেখা এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। স্লোগানে রাজপথ কাঁপিয়েছেন সাধারণ ও ব্রিটিশ সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারাও। জিম যখন এসব বলছিল, আবেগে আমার গলা ধরে আসে। টের পাই চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল জমা হয়েছে। এত এত শুভাকাঙ্ক্ষী আর বন্ধুবান্ধবের ঐকান্তিক আর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। সত্যি, এমন ভাগ্য আর কজনের হয়। কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো ভাষা নেই।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফিলিস্তিনের জঙ্গি নেতা আহমেদ জিব্রিল ও কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নুরসুলতান নজরবায়েভ তালেবানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। নুরসুলতান ছিলেন আমার বন্ধু জন ম্যাপিনের পরিচিত। জনের বউ কাজাখস্তানের বিখ্যাত ব্যালে নৃত্যশিল্পী ইরিনা। ইভান লিঞ্চ আরও এক ধাপ এগিয়ে একটা ওয়েবসাইট খুলে বসে। ইভন রিডলির মুক্তির জন্য টনি ব্লেয়ারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং আরও অধিক ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে হবে–এই দাবিতে ই-মেইলে গণস্বাক্ষর গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দাবিনামায় আরও লেখা হয়, ইভন শুধু পেশাগত প্রয়োজনে আফগানিস্তান গিয়েছে এবং সেখানকার মানবাধিকার লজ্ঘনের করুণ দশা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ইভান আরও অনেককেই রাজপথে নামিয়ে আনে। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ওকে বিরত থাকতে নিষেধ করা হয়। এত বিপুল প্রতিবাদ কর্মসূচি আর জনগণের দাবি তালেবানদের কাছে ভুল বার্তা প্রেরণ করতে পারে। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ, এমন সন্দেহে ওরা আমাকে পণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, এমন সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট।

এদিকে আমার গর্ভধারিণী মা প্রতিদিন কাউন্টি ডারহামের ওয়েস্ট পেলটনের বাড়ি থেকে বিশ্ব মিডিয়ার কাছে বক্তব্য পেশ করতেন। মায়ের অবাক বাক্‌প্রতিভার খবর আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে মাকে চুপ থাকার জন্য যতই অনুরোধ করা হতো, মা থোড়াই কেয়ার করতেন। ফলাফল, লেবার পার্টির সম্মেলন চলাকালেও ১০ দিন ধরে সংবাদপত্রের মূল পাতার শিরোনাম ছিলেন তিনি।

টনি ব্লেয়ারের রাজনৈতিক মুখপাত্র অ্যালিস্টার ক্যাম্পবেল নিশ্চয় মনে মনে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। কোথাকার ডারহামের কোনো বৃদ্ধ নারী প্রেসিডেন্ট টনি ব্লেয়ারের গণমাধ্যমে উপস্থিতিতে বাগড়া দিচ্ছিলেন।

ব্লেয়ারের জন্য ছিলেন ক্যাম্পবেল। অন্যদিকে আমার মা জয়েস রিডলির জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করে গেছেন টেড হাইন্ডস ও জেমস হান্ট। দুজন সহৃদয়বান ডাক্তার। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও টেলিভিশনে তাঁরা দুজন রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন। রিডলি শুধুই একজন নিরীহ সাংবাদিক। ওর দ্বারা ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে তাঁরা তালেবানদের এটা বোঝাতে সক্ষম হন। একদিকে মহৎ হৃদয়ের এ দুজন বিশ্ব মিডিয়ার প্রধান শিরোনামে ও কাগজের মূল পাতায় আমার নাম মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে তালেবানদের হৃদয় জয়ের কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। এসব কাজ তালেবানদের মনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল, আমি জানি না। তবে সত্যই আমি ক্ষতিকর কিছু করিনি।

টেড হাইন্ডস এর আগে ফ্লিট স্ট্রিটে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন। যেকোনো কাজ সমাধায় ছিলেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। অপরদিকে জেমস জান্ট একজন দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ। অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সফল ব্যবসায়ীদের প্রচারণা অভিযানের দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। আমার পুরোনো বন্ধুদ্বয় আমার মুক্তি পাওয়ার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নায়কের ভূমিকায়।

আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ চাউর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে। মায়ের মতে, একটা নিরীহ টেলিফোন আলাপেই মাকে সব পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলা হয়। আলাপের পর থেকেই আমাকে মুক্ত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। জেমসের সঙ্গে এ নিয়ে মায়ের আলাপ হওয়ার পরই তিনি নীরব অপেক্ষার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নেন। জেমসের মতে এটা ছিল রাজনৈতিক ইচ্ছা আর চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞার মুখোমুখি সংঘর্ষ। জেমস ও টেড মনেপ্রাণে তালেবানদের পরাজয় চাইছিল। ওদের চতুর কৌশলের সঙ্গে তাল মেলানো আমার সহজ-সরল মায়ের জন্য কঠিন ছিল বটে।

তাঁরা ঠিক করেন, মা যা-ই বলুন না কেন, তাতে তালেবানদের ধর্ম ও মানবতাবোধকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। কিছুটা হলেও যদি ওদের

মানবতাবোধ থেকে থাকে, তাহলে তালেবানরা আমাকে মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে, এটাই ছিল তাদের ভাবনা। কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ফকল্যান্ডের অধিবাসীদের বিজয়ের ইতিহাস, বোমা হামলার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন রণসজ্জার কথা ভুলেও মুখে আনা যাবে না। এমনকি কোনো উসকানিমূলক শব্দ আছে কি না, তা-ও যাচাই করা হতো। টেড ও জেমস মায়ের বক্তব্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সব সময়। এত কঠোর বেড়াজাল আর নিষেধাজ্ঞার মাঝেও মা সাহসী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ৭৪ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়েস রিডলি আমার মুক্তি আন্দোলনের সঞ্জীবনী তারকা হয়ে ওঠেন অল্প সময়ের মধ্যেই। এই ১০ দিনের অপেক্ষার অসহ্য যন্ত্রণার পুরোটা সময় আমার বোন মায়ের পাশে ছিলেন। জেমস পরে আমাকে জানায়, তার সহজ-সরল বক্তব্য আর সততা পুরো জাতির হৃদয় জয় করেছিল। মুক্তি পাওয়ার দিন কয়েক পরই স্যার ডেভিড ফ্রস্ট আমাকে তাঁর বিখ্যাত টিভি অনুষ্ঠান ব্রেকফাস্ট উইথ ফ্রস্টে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি বলেছিলেন, মায়ের জন্য আমার সত্যিই গর্ব করা উচিত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুখপাত্র।

মায়ের মতে– আমি ছিলাম স্নেহশীল মা ও আদুরে কন্যা। তিনি বলতেন, 'ইভন রিডলি একজন পুরোদস্তুর পেশাদার সাংবাদিক। হ্যাঁ, কিছুটা দুঃসাহসীও বটে। ও শুধু সাধারণ আফগানদের দুর্দশার কথাই বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চেয়েছে।' খুব একঘেয়ে মামুলি কথা। কিন্তু মাঝেমধ্যে সোজাসাপ্টা কথাই অনেক কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে।

আমার মেয়ে ডেইজি গণমাধ্যমে মায়ের মুক্তি দাবি করে কথা বলেছে, তালেবানদের মুখে এ কথা শুনে আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। আমি কখনোই ভাবিনি মা এতটাই নিরাশ হয়ে যাবেন যে ডেইজিকে দিয়ে তালেবানদের মনে দয়ার উদ্রেক ঘটানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু পরে জেমস আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয় ডেইজির উপস্থিতির দরকার ছিল।

প্রথম দিকে গণমাধ্যমে ডেইজির নবম জন্মদিনের কথা প্রাধান্য পায়। ওর জন্মদিনের দিন আমি সুদূর কাবুলের কয়েদখানায় বন্দী। গণমাধ্যমে প্রচারাভিযানে ডেইজি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা বাচ্চামেয়ের মাকে কাছে পাওয়ার আকুতি বিশ্ববিবেককে অচিরেই নাড়া দিতে সক্ষম হয়। 'আমি মাকে ফেরত চাই'–ব্যস, এই শিরোনামেই প্রায় ২৮০টি সংবাদমাধ্যমে ডেইজির গল্প লেখা হয়।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে জেমস আয়োজন করেন বেশ কয়েকটি সম্মেলনের। এদিকে টনি ব্লেয়ারের কাছে মায়ের মুক্তির দাবিতে চিঠি লেখে ডেইজি। দ্রুতই ডেইজির চিঠিটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর আগেও টনিকে ও দুবার লিখেছে, এ খবরটা জানাজানি হলে সংবাদমাধ্যমে ওর চিঠি লেখার খবর শিরোনাম হয়। সাত বছর বয়সে কসোভোতে বোমা হামলা বন্ধের দাবিতে ডেইজি প্রথম চিঠি লেখে। সে সময় ডাউনিং স্ট্রিট থেকে প্রত্যুত্তরে ওর চিঠির জবাব পাঠানো হয় বেশ গুরুত্ব দিয়ে। তিন দিন পরই বন্ধ হয় বোমা হামলা। নিজের মতামতের গুরুত্ব দেখে ডেইজি অবাক হয়ে পড়ে। এর পরের চিঠিটা ও লিখে ড্রোন পরিদর্শনের পরে। এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা চলছিল তখন। অবাক করা ব্যাপার, গণমাধ্যমের প্রথম পাতায় খুব গুরুত্ব দিয়েই ছাপানো হয় ডেইজির চিঠির সংবাদ। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন আলোচনা ছিল মানুষের মুখে মুখে।

আগেও বলেছি, তাদের পরিকল্পনায় মা ছিলেন প্রধান খেলোয়াড়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ যেন তালেবানদের খেপিয়ে না দেয়, সে জন্য জোর প্রচেষ্টা ছিল। জেমস ও টেড মাকে শিখিয়ে দেয় কীভাবে সাবধানতার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমনকি ধারাবাহিক রেডিও ও টেলিভিশনের দেওয়া সাক্ষাৎকারেও মায়ের উচ্চারিত বাক্যগুলো ছিল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। তালেবানদের অসম্মান করে বা ওদের ব্যঙ্গ করে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

এভাবেই আট দিন ধরে গণমাধ্যমকে সামলানো হয়। প্রতিদিন সকালে জেমস ও টেড মায়ের সঙ্গে বসে সেদিনের কৌশল ঠিক করতেন। দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সাজানো হতো মায়ের বক্তব্য। বিকেল হতেই বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমে ফোন করে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া হতো। মায়ের মতে, ইভন রিডলির মুক্তির প্রচারাভিযান থেকে জেমস এক মুহূর্তের জন্যও পিছু হটেনি। সারা দিন ধরে চলত বক্তব্য গোছানো ও তাতে শাণ দেওয়ার কাজ। কথা বলার সময় মা টেলিফোন সেটের পাশে তিনটা খাতা রাখতেন। টেলিফোনের প্রতিটা কথোপকথন রেকর্ড করা হতো।

যাঁরাই বাড়িতে ফোন করতেন, তিনটা খাতায় আলাদা করে টেলিভিশন চ্যানেল, খবরের কাগজ ও রেডিও স্টেশনের নাম ধাম লিখে রাখা হতো।

সাধারণত যেকোনো খবরে মূল ব্যক্তি বা বিষয়কে কেন্দ্র করেই সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। কিন্তু এদিকের চিত্র ছিল ভিন্ন। জেমস ও টেড

তাদের গণমাধ্যম প্রচারণা অভিযানে একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তালেবানদের প্রলুব্ধ করা।

অন্যদিকে মায়ের বাড়ির বাইরে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা রীতিমতো তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁরাও প্রতিদিন মায়ের বক্তব্য সংগ্রহের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। জেমস ও টেড খুব সতর্ক ছিল, যাতে করে মায়ের বক্তব্য কোথাও ভুলভাবে উপস্থাপিত না হয়। প্রথম দিকে আমার দ্রুত মুক্তির একটা ক্ষীণ আশা জেগে ওঠে। কিন্তু তালেবানরা হঠাৎ করেই আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ তুললে সে আশার আগুন নিভে যায়।

টেড জানায়, শুরু থেকেই পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচেষ্টা নিয়ে আমার পরিবার সন্দিহান ছিল। এতে করে তালেবানদের কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন সহজ হয়ে যায়। জেমস সুচারু কৌশলে সরকারের প্রতি আমার পরিবারের অবিশ্বাস ও সন্দেহকে গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। তালেবানদের সদিচ্ছার দিকেই আমার পরিবার চেয়ে আছে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এটা বোঝাতে সক্ষম হয় তারা। তবে সব চেষ্টাই বিফলে যেত, যদি না আমার মা দক্ষ হাতে গণমাধ্যম সামলাতে ব্যর্থ হতেন।

জিম মুরে আমার কাছে জানতে চাইল জেমস হান্টের ব্যাপারে। আমি হেসে জবাব দিই, উনি হলেন ছায়ার পেছনের নায়ক। তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

লেক ডিস্ট্রিক্টের কাছাকাছি আসতেই ডেইজির সঙ্গে নিরিবিলি আলাপ করার সুযোগ দিতে জিমকে অনুরোধ করি। কারণ, অনেক হয়েছে, ডেইজির আবার গণমাধ্যমের সামনে আসার প্রয়োজন নেই। আমি ওর স্কুলে ফোন দিয়ে এক ঘণ্টা সময় ডেইজির সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নিয়ে নিই আগেই।

মুহূর্তটাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেক উইন্ডামায়ারের ধারে ডেইজির আবাসিক স্কুল ভবন অবস্থিত। প্রধান ফটকের কাছাকাছি হতেই ভেতর থেকে বাচ্চাদের হইহুল্লোড় আর চেঁচামেচির শব্দ কানে ভেসে এল। একজন শিক্ষক আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ডেইজি তখন মাত্র টয়লেট থেকে বেরিয়েছে। ওর কোঁকড়ানো চুলগুলো তখনো ভেজা ছিল। গোলাপি গাল দুটো রোদে চকচক করছে। আমাকে দেখেই ও দৌড় দিয়ে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাত-পা দিয়ে আমাকে আটকে ফেলার চেষ্টা। টানতে টানতে ওর বিছানার ধারে নিয়ে যাই। কিছুটা সময় জড়িয়ে রাখি ওকে।

মেয়েটা হেঁচকি দিয়ে কাঁদছিল। আমি জানতে চাইলাম, মায়ের সঙ্গে ও রাগ করেছে কি না? ওর উত্তরটা ছিল এমন, 'মা, আমি জানি এটাই তোমার কাজ। কিন্তু তুমি এতই বেখেয়াল ছিলে যে পাসপোর্ট নিতে ভুলে গেলে?'

জন্মদিনের দিন আমি থাকতে পারিনি। তাই ওর কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু মা, আমি কিন্তু তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঠিকই গান গেয়েছিলাম। বন্দিশালায় আমার রুম থেকেই তোমার উদ্দেশে আকাশের দিকে তাকিয়ে গান গেয়েছি। মেয়েটা ছোট ছোট বাদামি চোখে আমার দিকে তাকাল, 'মা, আমি তোমাকে শুনতে পেয়েছি মা।' এই কদিনে দস্যি মেয়ে আবার কয়েকটা কবিতাও লিখেছে। আমাকে পড়ে শোনায় ও।

ওর ঘরের চারপাশে জন্মদিনের উপহার ছড়ানো-ছিটানো। তাহলে জন্মদিন কেমন কেটেছে? অসাধারণ, ওর চটপট জবাব। 'জানো মা, সেদিন সবাই না আমার পাশে বসার জন্য কেমন হুড়োহুড়ি করেছে। তুমি ছিলে না দেখে বোধ হয়।'

এক ঘণ্টা মেয়েকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিলাম। বের হওয়ার আগে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো, এখন থেকে বিদেশে যাওয়ার আগে অবশ্যই ওকে জানিয়ে যাব।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন আবার দেখা হবে। ও একগাল হেসে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে দৌড় দেয়।

গাড়ি ফিরে এলে তাতে চড়ে বসি। গন্তব্য এবার কনিস্টনের এক প্রত্যন্ত গ্রাম লিটল ল্যাঙ্গডেলের ছায়াঘেরা এক খামারবাড়ি। জিমের মতে, রিডলি পরিবারের সবাই ওখানে আমার অপেক্ষায় থাকবে। আমি আঁতকে উঠি, আমাদের পরিবারের সদস্যরা ঝগড়াঝাঁটি, চিৎকার-চেঁচামেচি না করে ১০ মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারি না। কিছুটা মজা আর কিছুটা সত্য বলছিলাম।

মা আর বাবার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার মুক্তির দিন সহকর্মী গ্যারেথ ক্রিকমার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিক দলের অগোচরে বেরিয়ে আসতে মা-বাবাকে সাহায্য করে। একটা খালি বাড়িতে ১২ ঘণ্টার নিষ্ফল অপেক্ষার পরে ডজনখানেক সাংবাদিক টের পান, খামারবাড়ির সংবাদ সম্মেলন চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

ভাতিজি বিয়েনকার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হলো। বোন জিল ও তার জীবনসঙ্গী পল বেইলিও আমাকে একনজর দেখতে উপস্থিত হয়েছে। ভিভ আর আমি মিলে মোট সাতজন। কনিস্টনের এক রেস্তোরাঁয় আমরা আনন্দ সহকারে খাওয়ার পর্ব সেরে নিই। বিশ্রাম নিতে ফিরে যাই আমাদের দূরের খামারবাড়িতে।

একসময় সবাই ঘুমিয়ে গেলে শুধু আমরা বোনেরাই জেগে থাকি। ফলাফল, হাসিঠাট্টা আর এত দিনের জমে থাকা গল্প কি আর ঘুমাতে দেয়? আনন্দের মুহূর্তটা হঠাৎ থমকে যায় জিলের প্রশ্নে। ও জানতে চায়, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, এটা জানার পর আমার কেমন লাগছিল? কী কায়দায় ওরা তোমাকে মারবে বলে মনে হচ্ছিল? মেয়ের কী সাহস আর ঔদ্ধত্য? সবচেয়ে নাছোড়বান্দা প্রতিবেদকও আমাকে এই প্রশ্ন করেনি।

পরদিন সকালে লাল চোখ কচলাতে কচলাতে আমার আর ভিভের ঘুম ভাঙে। আমরা দুজনই একসঙ্গে রান্নাঘরে যাই। বাবা বেকন স্যান্ডউইচ বানাচ্ছিলেন। বাবা এটা খুব ভালো বানান। আমি জানি না, এমন সাধারণ খাওয়ার জিনিস কীভাবে ওনার হাতে এত সুস্বাদু হয়ে ওঠে?

আমি, বাবা আর মা খোলা মাঠে পায়চারি করছিলাম। *ম্যানচেস্টার এক্সপ্রেস*-এর চিত্রগ্রাহক স্টুয়ার্ট ম্যাসন দ্রুত আমাদের পুনর্মিলনী হাঁটার কিছু ছবি তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু এসব কী হচ্ছে? পরিকল্পনা ছিল সংবাদমাধ্যমের আড়ালে কয়েক দিন অবস্থান করব। শুধু রোববারের পত্রিকার জন্য আমার গোপন দিনলিপি পড়তে জিম রয়ে যাবে এখানে।

তালেবানদের বলে এসেছি, নোংরামি আমার ভীষণ অপছন্দ। তবে আমি খামারবাড়ির ব্যক্তিগত জীবনটাও সবার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাক, এটাও চাই না। ম্যাসন স্পষ্টভাবেই দেখতে পারছিল, সবুজ খোলা প্রান্তরে আমি মোটেও ছবির জন্য পোজ দিচ্ছি না। ছবি তুলতে চাইলে না হয় আমরা শহরের কোথাও গিয়ে পোজ দিই।

মা-বাবাকে বিদায় জানিয়ে সদলবলে ছুটে চললাম ম্যানচেস্টারের উদ্দেশে। চমৎকার হোটেলের সবচেয়ে দামি কক্ষটাই আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়। একটা কম্পিউটার বসানো হলে বৃহস্পতিবার থেকে পুরোদমে গোপন দিনলিপিটার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকে বিস্তারিত লিখতে শুরু করি।

আগেই বলেছি, জালালাবাদে লেখার জন্য কোনো উপকরণ দেওয়া হয়নি আমাকে। তাই টুথপেস্টের একটা কাগজের বাক্সে তারিখ ও দিনক্ষণ

লিখে ছোট ছোট সাংকেতিক শব্দে ঘটনাগুলো তুলে রাখতাম। কাবুল জেলে আসার পর সাহায্যকর্মী মেয়েরা আমাকে কিছু কাগজ দিয়েছিল। সেখানে আমি দিন-তারিখ আর বিভিন্ন শব্দ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতাম।

আমাকে স্থানান্তরিত করার সময় অতি সন্তর্পণে কাগজগুলো লুকিয়ে রাখতাম। আর যখন আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন জুতার তলায় এই কাগজগুলো আর ক্যাথির একটা চিঠি লুকিয়ে নিয়ে আসি। ক্যাথির চিঠিটা হ্যানোভারে ওর ভাই অ্যান্ড্রোসের কাছে পাঠাতে হবে। টুথপেস্ট বাক্সসমেত আরও কিছু কাগজ অন্তর্বাসের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আসি।

শুক্রবারের মধ্যে আমি ১২ হাজার শব্দ লিখে ফেলি। *সানডে এক্সপ্রেস*-এ কয়েক দিন ধরে আমার দিনলিপি ছাপা হয়। এ ছাড়া ৪০টি দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে অনূদিত হয়ে ছাপা হয় এটি।

ডেইজি ওর চাচা বিলের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মজাদার ও পছন্দের কিছু খাবার দিয়ে দুপুরের ভোজ সারি। হোটেলকক্ষে ফিরে আসার সময় ডেইজি খুব উত্তেজিত ছিল। ও হোটেলে থাকতে খুব পছন্দ করে। সাধারণত কোথাও বেড়াতে গিয়ে হোটেলে থাকলে আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখি। সেদিন আমরা এতই ক্লান্ত ছিলাম যে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি গভীর ঘুমে। বিছানাটা ছিল অনেক প্রশস্ত। কিন্তু তারপরও ডেইজি গড়াতে গড়াতে কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার খুব স্বর্গীয় অনুভূতি হচ্ছিল। এত দিন মেয়েটা মায়ের কোলে ওঠার জন্য না জানি কতই কান্নাকাটি করেছে।

পরের দিন বেলা করে আমাদের ঘুম ভাঙে। সকালবেলার হুড়োহুড়ি আমি ঘৃণা করি। ডেইজি বিছানার ওপর লাফাচ্ছিল। ও খুব উত্তেজিত। বিল চাচা ওকে ব্ল্যাকপুলের মজার মজার রাইড চড়াতে নিয়ে যাবে। ব্ল্যাকপুলে কখনো যাওয়া হয়নি আমার। যেতে পারলে ভালোই হতো। নানা রকম মজার রাইডে চড়া যেত।

ওদের বিদায় দিয়ে আমি আর ভিভ লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। আমাদের গাড়িটা যখন ব্ল্যাকফ্রায়ার সেতুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, পুরোনো স্মৃতিগুলো ফিরে আসতে শুরু করে। নস্টালজিক হয়ে যাই আমি। চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জমা হতেই দ্রুত নিজেকে সামলে নিই। ভিভ আমাকে কড়া ধমক লাগায়। আজ থেকেই কাজ শুরু করার কোনো দরকার

নেই। সেই চিরাচরিত পুরোনো সেতু, ধূসর লুবায়েনকা বিশালত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে আমার মনে হতো, হয়তো আর কোনো দিন এসব জায়গায় আসা হবে না।

বার্তাকক্ষে সেই পুরোনো মুখগুলো আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অনেকের চেহারা ভাষা বলছে আমাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার আশা তারা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল।

মার্টিন টাউনসেন্ড সামনে এসে দাঁড়াতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না। হঠাৎ করেই ও শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে শুধু এক টুকরা হাসি উপহার দিল। আমরা নরকের দরজায় টোকা দিয়ে ফেরত এসেছি।

ওরেব্বাস চার শর মতো ই-মেইল জমা। অধিকাংশ মেইল এসেছে পরিচিতজনদের কাছ থেকে। তিনটা ফালতু ই-মেইলও পেলাম। একের পর এক মেইলের জবাব দিয়ে গেলাম।

আমার ভয়েস মেইলের বাক্সখানাও ভরে আছে ভয়েস বার্তায়। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনেরা শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ফ্যাসিবাদী দল আন্তর্জাতিক তৃতীয় পক্ষের লোকজন নোংরা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে একটি বার্তা পাঠিয়েছে।

এই নব্য নাৎসিবাদীদের মুখোশ উন্মোচনের সময় হয়েছে এবার।

পানশালার সেই রাতটা ছিল আনন্দ আর হাস্যরসে ভরপুর। এমনকি পানশালার ম্যানেজার মেড হাটারও সবার উদ্দেশে এক চুমুক পান করার জন্য খোঁচাতে লাগল। আমার কয়েকজন দুষ্টু সহকর্মীও তাল দিল সঙ্গে। খাস লন্ডনি স্টু কারশ চিৎকার করে বলতে লাগল, আফগানিস্তানে দুই সপ্তাহের আনন্দ ভ্রমণ শেষ হয়েছে। মুফতে মদ্যপানের এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

ওই সপ্তাহে আমাকে নিয়ে লেখা সংবাদপত্রের খবরগুলো পড়তে শুরু করি। কজনের ভাগ্যে আর নিজের শোকবার্তা পড়ার সুযোগ হয়? আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের যারা আমার বেঁচে ফিরে আসার আশা ছেড়েই দিয়েছিল প্রায়, তাদের অনেকেই আমাকে স্মরণ করে দু-চার কথা লিখেছে। সবচেয়ে ভালো লেখাটা বোধ হয় *ওয়েলস অন সানডের* প্রধান প্রতিবেদক মার্টিন শিপটনের কলম দিয়েই বেরিয়েছে। স্বাধীন সাংবাদিক জন সুউনিও একটা

লিখেছে, যেটা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আজ সেটা পড়া যাক। তবে প্রথমে শিপটনের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে আসি।

'শুক্রবার আমি সংবাদটা পাই। ইভন রিডলিকে আফগানিস্তান থেকে আটক করা হয়েছে। খবরটা পেয়ে আমি খুব একটা অবাক হয়নি। দুই যুগ ধরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে তখন আমরা শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতাম। মেয়েটা তখন থেকেই বিপদ হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াত। প্রায়ই সে দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

'আমি মন থেকে প্রার্থনা করি, এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকেও সে ঠিকই বেরিয়ে আসবে। সত্তরের দশকে কাজ শুরু করা সাংবাদিকদের মধ্যে ও নিজের আলাদা একটা স্থান তৈরি করে নিয়েছে।

'আমাদের অধিকাংশই তখন ব্রিটেনের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়েছি। মাথায় তখন 'সাংবাদিকতা হচ্ছে ব্যাখ্যা করা' তত্ত্ব ঘোরাঘুরি করত রাত-দিন।

'অথচ ইভন উঠে এসেছিল খুব সাধারণ জায়গা থেকে। আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পা রাখেনি। সংবাদজগতে প্রচলিত কল্পিত তত্ত্ব আর নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করতে দেখিনি ওকে। ও শুধুই একজন সাংবাদিক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, যাতে করে অনুসন্ধান করে সে লিখতে পারে। এটা ছিল ওর জন্য আনন্দদায়ক একটা অভিজ্ঞতা।

'মেয়েটা একদম বুনো স্বভাবের। আমোদ-ফুর্তি করার সঙ্গে সঙ্গে যেকোনো কাজে মনপ্রাণ দিয়ে খাটার শক্তি ছিল ওর ভেতরে। সারা রাত জেগে থেকে পুরুষদের মতো করে ঢকঢক করে মদ গিলতে তার কোনো সমস্যাই হতো না। ভোরবেলা সবাই যখন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখনো ওর মধ্যে ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও দেখা যেত না। হাঁকডাক করে সবাইকে নিয়ে গলির কোনো দোকানে নাশতা করতে যেত।

'পেশাগত জীবনের প্রথম দিকে ও উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের অনেক পত্রিকায় কাজ করেছে। *স্ট্যানলি নিউজ*, *নর্দার্ন ইকো*, *জার্নাল* ও *সানডে সান*। আশির দশকে ও নিউক্যাসলে ঘাঁটি গাড়ে। এখানে এসে ওর শকুনি দৃষ্টি পড়ে মাটির গভীরে। অন্ধকার জগতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে তুলে আনে মাদক ব্যবসায়ী বিভিন্ন দলের রক্ত হিম করা খবর।

'মাঝেমধ্যে আমারও ওর সঙ্গে নিষিদ্ধ জগতে যাওয়ার সুযোগ হতো। স্থানীয় বিভিন্ন ডাকুদলের সর্দারদের সঙ্গে ছিল ওর ওঠাবসা। দেখতাম ওরা

তাকে খুব শ্রদ্ধা আর স্নেহ করত। সম্ভবত ও নিজস্ব প্রাণোচ্ছলতা দিয়ে ওদের মনের ভয় দূর করতে পেরেছিল।

'আশির দশকের শেষ দিকে ও এমন একটা গল্পের পেছনে দৌড়াতে শুরু করে, যা ওর ভাগ্যকে বদলে দেয়। বছর কয়েক আগে উত্তর-পূর্ব এলাকার একজন বিদ্রোহী এভান ডেভিসন ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘ পিএলওতে যোগ দেয় ও গোপন মিশনে সাইপ্রাসে যায়। সেখানে আরও কয়েকজন পিএলও সদস্যের সঙ্গে একটা বিলাসবহুল প্রমোদতরিতে হামলা চালিয়ে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদস্য সন্দেহে তিনজন ইহুদিকে হত্যা করে।

'বিচারে ডেভিসনের কারাদণ্ড হয় ও সাইপ্রাসের জেলে শাস্তি ভোগ করতে থাকে। ইভন ওর একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য উঠেপড়ে লাগে। ডেভিসনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ও নিকোশিয়ার তথাকথিত পিএলও দূতাবাসে যাতায়াত করতে শুরু করে। আবারও নিজস্ব বাচনভঙ্গি আর হাসিখুশি মন দিয়ে ওদের ঘায়েল করে ডেভিসনের সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম হয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পিএলও কর্নেল দাউদ জারোরার সঙ্গে ওর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দাউদ সাইপ্রাস ছেড়ে ইভনের সঙ্গে নিউক্যাসলে এসে ওঠে। ওদের কোলজুড়ে আসে ডেইজি, যে আগামী বুধবার নয় বছরে পা দেবে। দাউদ কিছুদিন ডেভিড নামেও পরিচিত ছিল।

'দাউদের সঙ্গে সম্পর্কের আগে ইভনের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অশান্ত সমুদ্রের মতো। এর আগে ওর দু-দুটো বিয়ে ভেঙে গেছে। আরও অনেক সম্পর্কই পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজই ছিল ওর নিত্যসঙ্গী।

'দাউদ এলে ওর জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। নিউক্যাসলে ইভনের সঙ্গেই থাকত। বর্তমানে দাউদ উত্তর ইংল্যান্ড শরণার্থী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

'দাউদ ছিলেন একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সাংস্কৃতিক মানুষ। একসময় পিএলওর দখলকৃত লেবাননের অংশবিশেষ দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করেছেন তিনি। ইভনের মতো দাউদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহও কখনো সরলরেখায় চলেনি। তাই দুজনের মধ্যে মিলটাও হলো ভালো।

'দাউদের সূত্রেই ও ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংঘের প্রধান আহমেদ জিব্রিলের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পায়। চিন্তা করা যায়, সাত মাসের

গর্ভবতী অবস্থায় ও লকারবি বিমান হামলার সঙ্গে দাউদের সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করতে দামেস্কে উড়াল দেয়।

'১৯৯৩ সালে ইভন *ওয়েলস অন সানডের* যুগ্ম প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দিতে কার্ডিফে চলে যায়। তখন থেকেই নানা কারণে ওর আর দাউদের সম্পর্কে ঝামেলা শুরু হয়। কার্ডিফে যাওয়ার পরপরই *ওয়েলস*-এর প্রধান প্রতিবেদকের দেহে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিনের ছুটিতে চলে যান।

'ইভনকেই পত্রিকার পুরো দায়িত্ব মাথায় নিতে হয়। রোববারের পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ইভন নিউক্যাসলে ফিরে আসত, যেখানে দাউদ ও ডেইজি থাকত। সোমবার বিকেলে তাকে আবার পরিবার ছেড়ে চলে যেতে হতো।

'১৯৯৫ সালের আগস্টে ইভনের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের যাত্রা শুরু হয় সংবাদপত্রের জন্য বিখ্যাত ফ্লিট স্ট্রিটে। এখানে ও বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ পায়। প্রথম দিকে পুরুষতান্ত্রিক কূটচালের কারণে মানিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয় ওর। আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে অনেক অবিবেচক সাংবাদিক তাকে বয়কট করতে থাকে।

'সিয়েরা লিওনে অবৈধ অস্ত্র বিক্রি-সংক্রান্ত একটা প্রতিবেদন ছাপতে চায়নি এক সম্পাদক। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ওর মধ্যে হতাশা বিরাজ করেছে। কয়েক সপ্তাহ পরে ওর একজন সহকর্মী নিজেই ওর করা সংবাদ ছিনতাই করে। এই সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে।

'পরের কয়েক বছর *সানডে এক্সপ্রেস*-এ ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই কাজ করে। এ সময় ভালো ভালো কিছু সংবাদ করে প্রধান প্রতিবেদকের পদে পদোন্নতি পায় সে। এ সময় দুঃখজনকভাবে দাউদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভেঙে যায়। বর্তমানে ও একাকীই জীবন যাপন করছে।

'জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, ব্যক্তিগত জীবন বা নিরাপত্তার চিন্তায় কাজ করতে গিয়ে বরাবরই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত সে। এর আগেও অনেকবার ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, তবে এবারের মতো বিপদ কোনোটাই নয়।

'জীবনে অনেকবার ইভন নিজের মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। আমি আশা করব, খুব শিগগির ও জীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত আরও বড় গল্পটা লিখে ফেলবে।'

পরে মার্টিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। আমাকে আর কোনো দিন দেখার আশা নাকি ও ছেড়েই দিয়েছিল।

জেন সুইনি লিখেছিল–

'ব্যস্ত গাড়ি-ঘোড়া, রাই স্ট্রিটের ব্যস্ততা, ফারিংটনে খবরের লোকজনের দৌড়াদৌড়ি–এসব কিছুই এখন কাবুল জালালাবাদ থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, এখন কিছু ভালো কথাই বলতে যাচ্ছি।

'কাগজের জগতের একজন সেরা গল্পকথক বর্তমানে অন্ধকার রৌদ্রহীন মাটির নিচের কারাগারে বন্দী। তালেবানদের বন্দিখানার মেহমান *অবজারভার*-এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক।

'ইভন রিডলি একজন পুরোদস্তুর সাংবাদিক। সে শুধু তার দায়িত্ব পালন করেছিল। নিজের কাজ করতে গিয়েই ধরা পড়েছে তালেবানদের হাতে। ও বিশেষ বাহিনীর সদস্য, এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে আমি একটা বোকা হাঁস।

'দুই সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ হয়ে আছে ইভন রিডলি। *সানডে এক্সপ্রেস*-এর হয়ে কাজ করতে গিয়ে আটক হয়েছে ও। তার নয় বছরের মেয়ে ডেইজি এখন মায়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তালেবানদের ডেরায় গিয়ে সব ঝুঁকি নিয়ে হানা দেওয়া নিতান্তই সাধারণ মানুষের কাজ নয়। অনেকেই ওকে স্রেফ বদ্ধ পাগল বলে ডাকতে পারেন।

'কিন্তু একটা নির্ভরযোগ্য খবর সংগ্রহে আগ্রহী সাংবাদিকেরা প্রায়ই ঘোলা জলে সাঁতার কেটেছেন। বিবিসির আন্তর্জাতিক প্রতিবেদক জন সিম্পসন, আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে বের হওয়ার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে। নিজেকে ঢেকে ফেলে মুসলমান নারীদের পরিধেয় বোরকায়। বোরকা পরিহিত সিম্পসন, অতিসাধারণ আফগান নারী হিসেবে ওকে ঠিক মানিয়ে নেওয়া যায় না। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্তে। তবু ও ঝুঁকিটা নিয়েছিল, কারণ গল্পটা তৈরির জন্য এর দরকার ছিল।

'আমার পেশাজীবনে বহুবার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে। কখনো লর্ড সুইনি, কখনো একজন চেচেন, একজন প্রকৌশলী কিংবা চিড়িয়াখানার রক্ষক। এমনকি একবার তো বটসোয়ানার প্রেসিডেন্ট হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলাম। তালিকাটা আরও দীর্ঘ।

'ক্রোয়েশিয়ার দুব্রভনিক শহরে অবরোধের হাত থেকে বাঁচতে একটা ফেরির মহিলা টয়লেটে লুকিয়ে ছিলাম। তীব্র দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে অনেক কষ্টে নাক-মুখ চেপে ছিলাম। একবার যদি সার্বদের হাতে ধরা পড়তাম, তাহলে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতাম, তা এখন আর জানতে চাই না।

'আরেকবার আমাদের বন্ধু *গার্ডিয়ান*-এর প্রতিবেদক ম্যাগি ও'কেন সাধারণ গৃহবধূ সেজে পাবলিক বাসে করেই বসনিয়ায় ঢুকে পড়ে। ও বসেছিল একদম পেছনের আসনে। এত পেছনে এসে সেনাবাহিনী ওর পাসপোর্ট দেখতে চাইবে না নিশ্চয়।

'১৯৯০ সালের এক বিকেলে স্টালিনের অনুসারী আলবেনিয়ার সীমান্তে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের একটা দল গবেষণার কাজে যায়। তাদের সঙ্গে ছিলেন একজন নাট্যকর্মী, একজন স্থপতি ও একজন বাদাম বিক্রেতা। আদতে ছদ্মবেশে আমি, ম্যাগি আর স্কাই নিউজের একজন ক্যামেরাম্যান উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানে।

'ভালো প্রতিবেদক হতে হলে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ইভন বেচারা ধরা পড়ে গেছে। *অবজারভার*-এ কাজ করতে গিয়েই ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ১৭৯১ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন এই কাগজ জীবনের উপাখ্যান বলে যাচ্ছে। আর রিডলি ছিল একজন চমৎকার গল্পকথক।

'মাঝেমধ্যে আমরা ওকে ঘিরে ধরতাম। সোফায় আরাম করে বসে ও হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনাকে শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনার সঙ্গে উপস্থাপন করছে। অথবা বসের সঙ্গে তার ঝগড়ার বিষয় কিংবা দারুণ উপমা দিয়ে নিজের প্রেমকাহিনি বলে যেত।

'উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জন্ম ওর। মেয়েটা সবার মতে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ওর মধ্যে কোনো নাক উঁচু কিংবা অযথা আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগতে দেখিনি। মাঝেমধ্যে ওকে বোকা বানানোর চেষ্টা সফল হতো না। *অবজারভার*-এর কম্পিউটারে কোটকোট নামে একটা ফাইল ছিল। আড়ি পেতে শোনা বিভিন্ন বিব্রতকর বা হাস্যরসাত্মক কথা লিখে রাখা হতো সেখানে। কেউ বোকার মতো কোনো কথা বললেই সেটা কোটকোটে রেকর্ড করা হতো। ইভনকে নিয়ে লেখা কৌতুকগুলোর মধ্যে একটা আমার ভীষণ প্রিয়। ইভন কখনোই *অবজারভার*-এর বিনোদন পাতা

পড়ত না। এবং এই অংশটা না পড়ার সুবিধা ও উল্লেখ করত এভাবে, অদ্ভুত নেশাবিহীন মদের বোতলে চুমুক দেওয়া বিপজ্জনক।

'তবে কোটকোট পড়ে শুধু বিব্রতকর বিষয়গুলোই জানা সম্ভব। ইভনের বুদ্ধি ছিল সরষের তেলের মতো ঝাঁজযুক্ত। খুব দ্রুত যেকোনো বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ফেলত। চটপটে মেয়েটার হৃদয়টা ছিল বিশাল, স্বর্ণের মতো খাঁটি।

'মনে পড়ছে, মাঝেমধ্যেই ওর গল্প শুনে আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়তাম। কর্মজীবনের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতাকে পাশ কাটাতে ওর জুড়ি মেলা ভার।

'*অবজারভার*-এর সহকর্মীরা একটু হামবড়া স্বভাবের। একবার আমাদের এক সহকর্মীর বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইভন কাকে নিয়ে এল, ইংল্যান্ডের তৎকালীন সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষের হাত ধরে হাজির ও।

'ফলাফল, সেদিন ইভনকে নিয়েই বেশি মাতামাতি হলো। আন্তর্জাতিক চরিত্র। ইভনের আটক হওয়ার খবর শুনে প্রথমে খুব ব্যথিত হই। তবে তালেবানরা ওর কিছুই করতে পারবে না। আমি *অবজারভার*-এর একজন আইনজীবীকে সেদিন রাতেই ই-মেইল পাঠাই, তালেবানরা জানে না ওরা কাকে ধরেছে। ওদের কপালে দুঃখ আছে।

'আশা করি, দ্রুতই ওরা ভুল বুঝতে পারবে এবং ইভনকে ছেড়ে দেবে। একটু বলে নেওয়া ভালো, সাংবাদিকেরা মাঝেমধ্যে কেন বোকার মতো ঝুঁকি নিতে যায়। আমাদের সবচেয়ে ভালো অবিশ্বাস্য গল্পটা বলতে হয়। আর এ রকম কাহিনির নায়কদের অধিকাংশই হচ্ছে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যারা চায় না নিজেদের অন্ধকার গল্পটা প্রকাশিত হোক।

'ইভন, আফগানিস্তানের কারাগার থেকে যদি কোনো জাদুবলে তুমি আমাদের কথা শুনে থাকো, তাহলে মনে রেখো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তোমার প্রতিটা বন্ধুবান্ধব, স্বজনেরা জানে তুমি কোনো ভুল করোনি, যা করেছ ঠিকই করেছ।

'আবার সেই পুরোনো গাড়িতে বসে তোমার রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।'

শোকবার্তা দুটি মর্মস্পর্শী। এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এটা ভেবেই আমি আনন্দিত যে কঠিন সময়টা পার করে

এসেছি। আজ নিজের মুখেই শোনাতে পারছি দুঃসময়ের দিননামচা। আমার গল্পটা হয়তো এখানেই সমাপ্ত হতো। বইয়ের শেষ বাক্যটা লিখে দাঁড়ি টেনে দিতাম। কিন্তু কিছু ঘটনাপ্রবাহ আমাকে ব্যথিত ও বিভ্রান্ত করেছে।

স্বাভাবিক জীবনের সংজ্ঞাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগবে আমার। আমার বন্দিত্বের খবর ছড়িয়ে পড়লে খবরের জগতের ঘড়ির কাঁটা স্থবির হয়ে পড়েছিল। এবং আফগানিস্তান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেই ঘড়ির কাঁটা দ্রুত চলতে শুরু করে। পাকিস্তান থেকেও খুব দ্রুত চলে আসি। এমনকি পাশাকে একবার বিদায় বলার সুযোগও পাইনি।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা একটু কঠিন হয়ে পড়ে আমার জন্য। কারণ, যখন সবাই জানত দুনিয়াতে কী ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তখনো আমি তাবৎ দুনিয়া থেকে ১০ দিন পেছনে ছিলাম। তাল রাখতে চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

১০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতা ছিল হাস্যকর। একটা গুজব রটেছিল, আমি বিশেষ বাহিনীর সদস্য। আমাকে গোয়েন্দা বানানোর কাহিনি পড়ে নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। তালেবানরা সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেছে, আমি ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য। কিন্তু আমার কার্যকলাপ কোনোভাবেই একজন গোয়েন্দার মতো দক্ষ ও চটপটে নয়। প্রতিদিন যে কটা সিগারেট পোড়াতাম, তা কোনোভাবেই একজন বিশেষ বাহিনীর কমান্ডোর কাজ নয়।

আমার বিরুদ্ধে তালেবানদের অভিযোগ আফগানিস্তানের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, যা একসময় আমার মৃত্যুশঙ্কা পর্যন্ত তৈরি করে।

খবরের কাগজের অফিসে গুজব অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং *ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর অফিসে অবাস্তব গুজব ছড়ানোর কাজটা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে অ্যান্থনি মিশেল। একবার বার্তাকক্ষে অ্যান্থের গোপন বিয়ের খবর রটে যায়। গ্রেগ সুইফট রসিয়ে রসিয়ে ওর পালিয়ে বিয়ের গল্পটা আমাকে শুনিয়েছে, এটা জেনে ও প্রচণ্ড রেগে যায়। মজার ব্যাপার হলো, আমরা ওর বিয়ের পুরোহিতকে ফোন করে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করি। কিন্তু বিষয়টা মোটেও ওর পছন্দ হয়নি। আমি যখন আফগানিস্তানে বন্দী, গ্রেগ তখন তালেবানবিরোধী জোট নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের খবর সংগ্রহে ব্যস্ত।

খবর পেয়ে অ্যান্থনি খুব খুশি খুশি ভাব দেখায়। সবার সামনেই প্রকাশ্যে ও গ্রেগের মৃত্যু কামনা করে। আমার ও গ্রেগের করুণ পরিণতি দেখতে ও মুখিয়ে আছে, এ কথা বলতেই বার্তাকক্ষে হাসির রোল ওঠে।

এসব রসাল গালগপ্পের বিপরীতে তালেবানরা ১০ দিন আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ও সৌজন্যবোধ দেখিয়েছে। এরপর যেদিন লন্ডনের এক ক্যাবচালক আমাকে চিনতে পারল, ওর কথা শুনে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই।

কালো ট্যাক্সিতে চড়তেই চালক আমাকে চিনতে পেরে প্রশ্ন করে, 'তুমিই তো তালেবানদের হাতে বন্দী হয়েছিলে, তাই না?' আমি হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ি। ও পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, 'ওরা কি তোমাকে ধর্ষণ করেছে?' আমার উত্তর শুনে ও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল একবার। সুযোগ পেলে নাকি চালক নিজেই এর সদ্ব্যবহার করত।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হলো, ও আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিজেকে সংযত রাখি। মনে মনে বললাম, ইভন, বাস্তব সভ্য জগতে তোমাকে সুস্বাগত।

রহস্যের কিছু অংশ আমি আর কখনোই মেলাতে পারব না। জটিল ধাঁধার কয়েকটা অংশ চিরতরে হারিয়ে গেছে। যেমন ক্রাউন প্লাজায় কারা আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিল? কেনই-বা আমার দামি সুগন্ধির বোতলটা হারিয়ে গেল?

*ডেইলি এক্সপ্রেস*-এর ডেনিস রাইসের কাছ থেকে জানতে পারি, ডেভিড স্মিথ আসার আগেই ইতালির একজন টেলিভিশন সাংবাদিক হোটেলে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তবু হিসাব মেলাতে পারি না। সম্ভবত, ইতালিয়ানের আগেও কেউ একজন সেখানে হানা দিয়েছিল।

হয়তো পাকিস্তানে অবস্থানরত কোনো তালেবান গোয়েন্দা অথবা অন্য কোনো অনুসন্ধানী সাংবাদিক। আমি তালেবানদের আমার রুম নাম্বারটাও বলে দিয়েছিলাম, কারণ আমার লুকানোর কিছুই ছিল না। আমার টাকাপয়সা, ক্রেডিট কার্ড কিছুই খোয়া যায়নি। এমনকি আমার পাসপোর্টটাও পড়ে ছিল যথাস্থানে। তবে আমার ফোনবইটা উল্টেপাল্টে দেখা হয়েছিল। আরও কিছু কাগজপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল অজ্ঞাত হানাদাররা। বের হওয়ার সময় আমি বিছানাটা পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু সেটাও উল্টেপাল্টে কিছু খোঁজা হয়েছিল। আগেই

বলেছি, কারা এসেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্যই-বা কী ছিল, তা আমার পক্ষে আর কোনো দিন জানা সম্ভব হবে না।

লন্ডনের সোহোর ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পর দেখি ভিভ আগেই আমার ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। অবশ্য এর দরকার ছিল, কারণ, কত দিন ধরে বন্দী থাকব কেউ জানত না তখন। একটা লক বদলে দিতে ৭০ পাউন্ড খরচ হয়। কিন্তু আমার দরজায় তখন পাঁচটা লক ঝুলছিল। ভেতরে ঢুকতে ওদের খরচ হয়েছিল পাঁচ গুণ টাকা।

ভিভের মন্তব্য, এমন কিছু ও আগে কখনোই দেখেনি। লক সারানোর কারিগর যেন রীতিমতো অপারেশন চালিয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আয়না ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে খুলতে হয়েছিল সিঁড়ির লকটা। এবং ঘরের প্রবেশ দরজার লকটাকেও একইভাবে নানান কায়দা-কীর্তি করে খোলা হয়। কারিগর লোকটার মতে আমরা নিশ্চয়ই চাবি হারিয়ে ফেলেছি। কারণ, তার আগেও কেউ একজন এসে একই কায়দায় লক খোলার চেষ্টা করেছে।

কথার এই পর্যায়ে এসে ওকে থামিয়ে দিয়ে পুরো গল্পটা পুনরায় শোনাতে বলি। আমি বললাম, কিন্তু ভিভ, এক বছর আগে এই ফ্ল্যাটটাতে ওঠার সময় শুধু লকটা বদল করেছি মাত্র। কখনোই চাবি হারিয়ে লক ভাঙার মতো কিছু করিনি।

বিষয়টা শুনে কেমন খুঁতখুঁতে লাগল আমার। আমি নিজে গিয়েই কারিগরের সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু উনি সুস্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারলেন না।

ডেনিস আরও জানায়, ইতালির ওই টেলিভিশনে আমার, ডেইজি ও হার্মসের একটা ছবি দেখিয়ে দাবি করা হয়, ওটা ইরানে তোলা। কথাটা শুনে আমি প্রথমে হাসতে চাইলেও পরক্ষণেই মনে হলো, তালেবানরা নিশ্চয় এই সংবাদটা দেখেছিল। তখন আল-জাজিরা উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল, যার ফলে ওদের দর্শকসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়। সংঘর্ষ চলাকালে লাখ লাখ মুসলমান ও অন্য অনেক দর্শক আল-জাজিরার সংবাদ প্রচার প্রত্যক্ষ করত। আফগানিস্তানে টেলিভিশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও তালেবান শাসকগোষ্ঠী কিন্তু টিভি পর্দায় ঠিকই খবর দেখত।

আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম আল-জাজিরার ওপর। ওদের কারণে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হতো। আমি গোয়েন্দা, এটা বিশ্বাস করতে শুরু

করলে তালেবানরা আর দেরি করত না। ট্যাঙ্কের মাথা থেকে আমার নিথর দেহটা ঝুলিয়ে অন্যদের সতর্ক করা হতো।

এসব বিষয় জানতে আমি চ্যানেলটির কাতারে অবস্থিত সদর দপ্তরে প্রধান নির্বাহীকে ফোন করি। আমার প্রশ্ন ছিল, কেন ওরা আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিল? ঢালাওভাবে কেন আমাকে নিয়ে দু-দুটি প্রতিবেদন করেছিল ওরা? আর রহস্যজনকে কারণে কেন প্রতিবেদন দুটো প্রচার বন্ধ করে দেয় ওরা?

প্রত্যুত্তরে আল-জাজিরার নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে জানান, তাঁদের হাতে এমন কিছু দলিল প্রমাণাদি ছিল, যার মাধ্যমে নির্দ্বিধায় আমাকে গোয়েন্দা বলে অভিযুক্ত করা যেত। তাই ওরা এ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে। একই সঙ্গে ওদের লন্ডনের টিম আরও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চালাচ্ছিল। তিনি আমাকে একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তাব দিলে আমি রাজি হই। কারণ, এসব ধোঁয়াশা পরিষ্কারের দরকার ছিল তখন। পাশাপাশি ওদের হাতে থাকা দলিলগুলোতেও একবার চোখ বুলানো দরকার।

দিন কয়েক পরই লন্ডনের কার্নেবি সড়কে অবস্থিত আল-জাজিরার কার্যালয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাই। সেখানে নাসির আল বাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আমার। আমরা কথা বলছিলাম। মনে হলো, সে আমাকে যথেষ্ট সন্দেহ করছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আমি হাঁপাতে থাকি। নাসিরকে বললাম, দেখো, আমার দমের শক্তি। এতটুকু উঠতেই হাঁপিয়ে পড়েছি। বিশেষ বাহিনীর সদস্য বা গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্যতা আমার কতখানি? কথাটা শুনে নাসির মুচকি হাসল। বুঝতে পারলাম, ওকে বোঝাতে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

আমরা বসে কথা বলছিলাম। নাসির আমাকে ওদের হাতে থাকা কাগজগুলোর ফটোকপি দেখাল। এসব দলিলে উল্লেখিত আমার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সঠিক ছিল একটা মাত্রা পর্যন্ত। আমার আয়কর বিবরণী একদম নির্ভুল। কিন্তু একটা দলিলে আমার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

ডকল্যান্ডে আমার পুরোনো বাড়ি বিক্রির দলিল আল-জাজিরার হস্তগত হয়েছিল। দলিলমতে আমার বাড়িটা পাঁচ লাখ পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। অথচ বাস্তবে বিক্রয়মূল্য ছিল ২ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড। নাসির আমাকে আমার তৃতীয় স্বামী, যিনি ইসরায়েলি ছিলেন, তাঁর পাসপোর্টের একটা অনুলিপি

দেখায়, যেটা সঠিক ছিল। এরপর ও আমাকে মোসাদের একটা শনাক্তকরণ নাম্বার ও পরিচয়পত্র দেখিয়ে দাবি করে, এসব আমার তৃতীয় স্বামীর। এবং তাদের দাবি আটক হওয়ার সময় এসব কাগজপত্র আমার সঙ্গে পাওয়া গেছে।

কী উদ্ভট প্রগলভতা, আমি আমার নিজের পাসপোর্টই আফগানিস্তানে নিয়ে যাইনি। তাহলে কী কারণে আমি ইসরায়েলি কাগজপত্র সঙ্গে রাখব?

নাসির হাসল। বিজয়ের ভঙ্গিতে একটা ছবি বের করে আনল, যেটাতে আমি, ডেইজি ও হার্মস (এখনো ওর নামের প্রথম অংশ ধরে সম্বোধন করতে ঘেন্না করে) একটা প্রমোদতরিতে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে, নাসির বলতে থাকে, অবৈধভাবে ইরানে যাওয়ার পথে এই ছবিটা তোলা হয়। অবিশ্বাস আর সন্দেহে আমার গলার দম যেন আটকে যাচ্ছে। মনে পড়ল, জেরার সময় আফগান তদন্ত দল বেশ কয়েকবার কথাটা আমাকে বলেছিল। আমি অবৈধভাবে ইরানে প্রবেশ করেছি, তাদের কাছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আমাকে হত্যা করতে এ রকম উঠেপড়ে লেগেছিল কে? ছবিটার দিকে ভালোমতো লক্ষ করে হাসি পেল আমার। এই ছবিটা ১৯৯৮ সালে স্ট্র্যাটফোর্ড অ্যাভনে তোলা হয়েছিল। হচ্ছেটা কী? পেটটা কেমন গুলিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, এখনই বমি করে দেব। মনে পড়ে গেল ছবিটা আমি শেষ কোথায় দেখেছি। সোহোতে আমার ফ্ল্যাটের একটা আলমারিতে রাখা ছিল এটা।

এই ছবিটা তোলার দিন কয়েক পরেই আমার তৃতীয় স্বামীকে ভাগিয়ে দিই। ও চলে যাওয়ার পর এসব ছবির নিগেটিভ আর কোনো দিনই ওয়াশ করা হয়নি। তাহলে চুরি করে আমার ফ্ল্যাটে কে প্রবেশ করেছিল? লক সারানোর কারিগর কিন্তু ভিভকে বলেছিল যে এর আগেও কেউ একজন আমার ফ্ল্যাটে ঢোকার চেষ্টা করেছে। বড্ড অস্বস্তি লাগছিল আমার।

নাসির খুব চতুর শিকারি। ও বুঝতে পারছিল, আমি ভয় পাচ্ছি। বিষয়টা ও ধরে ফেলে। আমরা জানি, কোনো গোয়েন্দা সংস্থার হাত থেকে ফাঁস হয়েছে এসব। কিন্তু ধরতে কষ্ট হচ্ছিল কোনটা আসল আর কোনটা নকল। এসব কাগজ প্রথমে কাতারে আমাদের সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আমাকে ই-মেইল করে কর্তৃপক্ষ। জানায় নাসির।

খুব সংবেদনশীল একটা ব্যাপার। তালেবান গোয়েন্দাদের হাতেই এসব দলিল পৌঁছেছিল। খুব জটিল একটা মুহূর্ত। তোমার বন্দিত্বের সুযোগ অথবা অভিযুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল নিশ্চয়। দুভাবেই এর খুব খারাপ পরিণতি হতে পারত।

খারাপ? আমি চিন্তা করলাম। রক্তাক্ত সমাপ্তি হতো এই নাটকের। এক কোপে গর্দান চলে যেত আমার। আমি রহস্যময় গোয়েন্দা জগতের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব তথ্য জানাই।

হোয়াইট হলের সূত্রের দাবি, পুরো ঘটনার পেছনে রয়েছে আমেরিকার হাত। একটা কফিনে করে যদি আমার মরদেহ পৌঁছাত, তাহলে ওই আদিম যুগীয় বর্বরদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে বোমা হামলার সমর্থনে জনমত তৈরি হতো। তবে নাসির ব্যক্তিগতভাবে এসব বিশ্বাস করেনি। আসলেই কি তাই? তখন আমার মনে হচ্ছিল, এই নোংরা কাজের পেছনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা অন্য কোনো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হাত থাকতে পারে।

চেস্টারফিল্ডে লেবার পার্টির সাবেক এমপি টনি বেনের সঙ্গে কথা হয়েছিল ব্রেকফাস্ট উইথ ফ্রস্টে সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরই। *সানডে এক্সপ্রেস*-এ প্রকাশিত আমার বন্দিজীবনের কাহিনি তিনি পুরোটা পড়েছেন। তাঁর মতে, এটা ছিল সাহসী সাংবাদিকতার উদাহরণ।

তুমি আফগানদের একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছ। অন্যদিকে পশ্চিমারা কয়েক সপ্তাহ ধরে বোমা হামলা করার লক্ষ্যে ওদের মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করছে। একটা শয়তানের দেশে বোমা হামলা করা খুব সহজ কাজ। তাঁর মতে, আমি খুব ভালো সাংবাদিকতা করেছি।

ভদ্রলোকের কথা শুনে মন ভরে গেল। বেন আমাদের সময়ের একজন অন্যতম শান্তিবাদী লোক। খুব বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও অনলবর্ষী বক্তা।

অবশ্য যদি সত্যিই বর্বর তালেবানরা আমার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালাত অথবা আমার ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ একটা বাক্সে ভরে পাঠিয়ে দিত কিংবা আল-জাজিরা যদি সরাসরি আমার শিরচ্ছেদের দৃশ্য প্রচার করত, সে ক্ষেত্রে আফগানিস্তানে বোমা হামলা করার জন্য পশ্চিমাদের আর কোনো অজুহাতের দরকার পড়ত না।

একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছিল। তাঁর মতে, তালেবানরা যদি সত্যি সত্যি গোপন দলিলের কথা

বিশ্বাস করত, তাহলে আমাকে নিয়ে দর-কষাকষি করত। তিনি বলেন, তোমাকে হয়তো আফগানিস্তানের পাহাড়ে উধাও করে দেওয়া হতো। গোয়েন্দা হিসেবে তোমার কাছ থেকে গোপন তথ্য আদায় করার জন্য তার সব চেষ্টাই করত।

ভাগ্য ভালো, তালেবান গোয়েন্দারা কিছুটা হলেও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। এখন আমি সহজেই বলতে পারি, কেন আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। সম্ভবত তালেবান গোয়েন্দারা বুঝতে পেরেছিলেন, পশ্চিমা শক্তি তাঁদের বিরুদ্ধে কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। ব্যাপারটা তাদের মনঃপূত হয়নি। তাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে যেদিন ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী কাবুলে ৫০টি ক্রুজ মিসাইল দিয়ে আঘাত হানে, ঠিক তার পরদিনই মোল্লা ওমর মানবতার খাতিরে আমাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিল পশ্চিমা নেতাদের প্রতি একচোখা আধ্যাত্মিক এই নেতার ব্যঙ্গাত্মক সম্মান প্রদর্শন।

আমি নিজেও কিন্তু অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসিনি। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে তালেবানরা আমাকে রুক্ষ, বদমেজাজি বলে উল্লেখ করে এবং প্রচুর গালিগালাজ করেছি বলে অভিযোগ জানায়। আমি সীমান্ত অতিক্রম করার পর তারাও হয়তো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

যা-ই হোক, আমার কর্মস্থল থেকে আমার সাংবাদিক পেশার সপক্ষে তালেবানদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণাদি সরবরাহ করা হয়। আমি কোনো বিশেষ বাহিনীর সদস্য নই, নিতান্তই একজন সাংবাদিক, এটা প্রমাণ করতে পারলে তালেবানরা আমাকে নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দেবে, পল অ্যাশফোর্ডের কাছে এ রকম ইসলামিক ওয়াদা করেছিল ওরা।

আমিও ওদের একটা কথা দিয়েছিলাম, যেটা না রাখলে আমি নিজেকেই অসম্মানিত করব। তালেবানদের যে ধর্মীয় নেতা বা ইমাম আমাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করব বলে কথা দিই। ওরা আমাকে মুক্তি দিয়ে ওদের কথা রেখেছে। এবার আমার পালা।

ড. জাকি বাদাভির সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। উনি লন্ডনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম কলেজ অব লন্ডনের প্রধান। তিনি আমাকে ইসলাম নিয়ে আরও গভীর পড়াশোনা করতে সাহায্য করছেন। এ জন্য আমি ওনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। এটা প্রকৃতপক্ষেই একটা চমৎকার ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের মতো এই ধর্মেও মহৎ অনেক বিষয় রয়েছে।

আমি গত কয়েক দিনে যদি কোনো শিক্ষা অর্জন করে থাকি তা হলো, অন্যদের অবহেলার সময় ধৈর্য ধারণ করা। ইংল্যান্ড ফিরে আসার পর অনেক গণমাধ্যম আমার ব্যাপারে সত্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এদের অনেকেই আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও বিমাতাসুলভ আচরণ করে। নারী কলামিস্টরা আইভরি টাওয়ারের ছায়ায় বসে নখের সৌন্দর্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। আমাকে একজন মা, একজন নারী ও একজন সাংবাদিক হিসেবে উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। কাবুলের বাজারে একদিন শুক্রবারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তাদের এই পাগলের মতো গলাবাজি কোথায় উড়ে যেত! বাইরে বেশি সাহস দেখালেও ওদের রক্ত ছিল পানির মতন।

অবিশ্বাস্যভাবে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড, প্রতিটা জায়গা থেকে আমার বিরুদ্ধে দম্ভভরে কটূক্তি করা হচ্ছিল। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিলেন কয়েকজন। যাঁরা আমার ঘনিষ্ঠ, তাঁরা আমাকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিনিয়ত। এমনকি কাগজের জগতে বদমেজাজি বলে পরিচিত, যারা মাঝেমধ্যে নিষ্ঠুর হতেও দ্বিধা করে না, সেই প্রাইভেট আইয়ের সহকর্মীরা আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে যান।

সে বছর আমি নারী সাংবাদিকদের সম্মেলনে যোগ দিই। সেখানে বেরসিক মেয়েদের অনেকেই আমাকে কাগজে-কলমে শাপশাপান্ত করাকে স্বাভাবিক বলে মতও দেয়। তখনই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে, কোনো কোনো নারী মনেপ্রাণে চাইছিল আমাকে ধর্ষণ করা হোক কিংবা অত্যাচার করে মেরে ফেলে আমার নিথর দেহটা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

সেখানে আমি বলি, তালেবানরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ওরা চাইলে আমার নখ উপড়ে ফেলতে পারত, বৈদ্যুতিক শক দিতে পারত, ঠান্ডা পানিতে চুবিয়ে মারতে পারত কিংবা করতে পারত যৌন নিপীড়ন। এসব করলে হয়তো অনেক নারীর মনের আশা পূরণ হতো।

আমি জানি, তালেবানদের কাছে নারীজাতির কোনো মূল্য নেই। তারা আফগান নারীদের সঙ্গে অমানুষের মতো ভয়ংকর ব্যবহার করে। এমনকি নর্দার্ন অ্যালায়েন্স, যাদের মানবাধিকার-বিষয়ক ইতিহাসও খুব একটা আলাদা কিছু নয়, তাদের কাছ থেকেও নারীরা ভালো কোনো ব্যবহার পান না। কিন্তু আফগানিস্তানের নারীরা কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন, তার জন্য আমি একা আর দায়ী হতে পারি না।

একদিন রাতে আমার প্রতি ঘৃণাসূচক বিদ্বেষের বাষ্পে আর শ্বাস নিতে পারিনি। আমি গণমাধ্যম বিশ্লেষক ও *মিরর* পত্রিকার সাবেক সম্পাদক রয় গ্রিন্সল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করি। আমার প্রতি উসকানিমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। জিজ্ঞাসা করি, কত দিন ধরে এসব চলবে?

তিনি বলেন, 'তুমি *এক্সপ্রেস*-এর হয়ে কাজ করো। এসবের অধিকাংশই তোমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। তাই এদের এড়িয়ে চলো।'

দিন কয়েক বাদে এক রাতে বিবিসির বুশ হাউসের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ এক আফগান নারী এসে বললেন, 'ইভন, তোমার লেখনীর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি কোনো লজ্জা ছাড়াই নিজের দেশের পরিচয় দিতে পারি। তুমি আমাদের আবার মানুষ বানিয়েছ।'

এই সামান্য কয়টা শব্দ আমার মনে উৎসাহ জোগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। গুটি কয়েক লোকের খারাপ কথার জন্য মন খারাপ করে বসে থাকা অথবা অযথা রাগ দেখানোর কোনো মানে হয় না।

খেয়াল করে দেখলাম, আমার বিরোধিতাকারীরা সংখ্যায় খুব নগণ্য। মুক্তি পাওয়ার সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যেই বেলফাস্টে সম্পাদক সংঘের সাধারণ সম্মেলনে অংশ নিতে যাই। সেখানে সংগঠনটির প্রধান কনস্টেবল স্যার রনি ফ্ল্যানাগান আমাকে রীতিমতো বীরের মর্যাদা দিলেন। তিনি আমাকে সাহসী ও নির্ভীক সত্তা হিসেবে উল্লেখ করলে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। উৎসাহমূলক ও আবেগপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আমাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান।

আমার বক্তব্যে আমি সেসব সাহসী সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা ভয়ংকর সব মাদক ব্যবসায়ী ও অপরাধী চক্রের কুকীর্তি ফাঁস করে প্রতিনিয়ত নাশতার টেবিলে অবিশ্বাস্য আর গা শিউরে ওঠা সংবাদ সরবরাহ করছেন। আইরিশ সাংবাদিক, যিনি প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে বের হন, তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বিশেষ করে, মার্টিন ও হ্যাগেনের কথা উল্লেখ করি। এই বীর সাংবাদিককে তাঁর স্ত্রীর সামনেই গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি ভয়ংকর একদল অপরাধীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ফাঁস করে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন, এই ছিল তাঁর অপরাধ।

আমার গ্রেপ্তারের দিনেই মার্টিনকে গুলি করা হয়। অথচ সেদিন আমি গণমাধ্যমের শিরোনামজুড়ে থাকলেও এই সৎ ও নির্ভীক লোকটার মৃত্যুসংবাদ কেউই গুরুত্ব দিয়ে ছাপেনি। আরেকটা সাধারণ খুন বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

আমার বক্তব্য শেষ হলে মার্টিনের পত্রিকা *সানডে ওয়ার্ল্ড*-এর সম্পাদক জিম ম্যাকডয়েল আমার বক্তব্যে, বিশেষ করে মার্টিনের কথা উল্লেখ করায় কৃতজ্ঞতা জানান। মার্টিন ও হ্যাগেনের মতো সাংবাদিকদের শতবার সালাম জানাই। দুষ্টচক্রের মুখোশ উন্মোচন আর সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ সাহস দেখানোর জন্য এ ধরনের সাংবাদিককে যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা জানানো উচিত।

বেলফাস্টের রাস্তায় মানুষজন আমাকে ঘিরে ধরে শুভেচ্ছা জানাল। তারা সহাস্যে আমার সঙ্গে করমর্দন করতে লাগল। ইউরোপা হোটেলে একজন মাল বহনকারী কর্মী আমাকে দেখে দৌড়ে এসে বলল, 'ব্রিটেন তোমার জন্য গর্ব করে।' দুজন মধ্যবয়সী নারী আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার রুম পর্যন্ত চলে এলেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন *বেলফাস্ট টেলিগ্রাফ*-এর সম্পাদক এড কারেন। তিনি আমাকে বলেন, 'ইভন, জীবন তোমার জন্য কখনোই আগের মতো হবে না। আগের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে খবর সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে আর কোনো দিনই সম্ভব হবে না। তোমাকে নতুন কোনো কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।'

এডের কথায় আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ও অনেকটাই সত্যি কথা বলছে। সাংবাদিকতা আমার রক্তে মিশে আছে এবং আমি *সানডে এক্সপ্রেস*-এর প্রধান প্রতিবেদক। ভবিষ্যতে আমি কীভাবে কাজ করব, তা আমি এখনো বলতে পারছি না। তবে আমার সমালোচক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আমার কিছু বলার আছে।

আমি হাস্যরস পছন্দ করি এবং বাকি দিনগুলো হেসেখেলে কাটাতে চাই। মদ্যপান আমার অতীব পছন্দের কাজ এবং ঢকঢক করে শ্যাম্পেন গিলতে চাই আরও অনেক দিন। অবশিষ্ট জীবনটাকে আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাই। তার মানে এই নয় যে, আমি উদাসীন বা উচ্ছৃঙ্খল।

তালেবানদের হাতে ধরা পড়ার অভিজ্ঞতা আমার অন্তরে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

কারও কারও মতে, সাহায্য সংস্থা শেল্টার ইন্টারন্যাশনালের কর্মীরা কাবুল জেলে খোদাকে একমনে ডেকে গেছে, তাদের প্রার্থনাতেই খ্রিষ্টানদের খোদা সাড়া দিয়েছেন। এরা প্রায় তিন মাসের বেশি বন্দী ছিল কাবুলে। তাদের বিরুদ্ধে তালেবানদের অভিযোগ ছিল, তারা মুসলমানদের গোপনে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ওদের গ্রেপ্তার করা ছিল তালেবান ধর্মীয় পুলিশের হতাশার বহিঃপ্রকাশ। একই সঙ্গে খোদার প্রতি ওদের অগাধ বিশ্বাসই ওদের এই প্রতিকূল সময়টা পাড়ি দিতে সহায়তা করেছে।

পাঁচ সপ্তাহের বোমা হামলার পর নর্দার্ন অ্যালায়েন্স রণাঙ্গনে তালেবানদের পিছু হটিয়ে দেয়। আমেরিকার নির্বিচার শক্তিশালী বোমা হামলা তালেবানদের কোমর ভেঙে দেয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারা। কাবুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা ওই আটজন সাহায্যকর্মীকেও তাদের সঙ্গে করে নিয়ে কান্দাহারের দিকে চলে যায়। তখনো ওখানে তালেবানদের বেশ শক্ত ঘাঁটি ছিল।

জর্জ টাবম্যান জানান, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে তাঁদের কান্দাহারে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাঁরা খুব ভয় পেয়ে যান। কারণ, ওখানেই তাঁদের সলিলসমাধি ঘটার আশঙ্কা ছিল। জর্জ প্রায় ১৬ বছর আফগানিস্তানে কাজ করেছেন।

তাঁদের বহনকারী গাড়ি রাতের বেলা ওয়ারদাক প্রদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় থেমে যায়। আটজনকে বেঁধে একটা আবদ্ধ কনটেইনারে ঢোকানো হয়। পরদিন সকালে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় কাবুল থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে গজনির একটা কারাগারে। গজনি কারাগারে তাঁরা যখন বন্দী ছিলেন, তখন সেখানে আমেরিকান বাহিনী বোমা হামলা চালায়। বোমা হামলা থেমে গেলে ঘট করে তাঁদের আটকে রাখা কারাকক্ষের দরজা খুলে যায়। একজন তালেবান সৈন্য রাইফেল হাতে প্রবেশ করে।

টবম্যান বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম এখানেই আমাদের জীবনের ইতি টানা হবে। কিন্তু অস্ত্রধারী সৈন্য শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করে। আজাদি (স্বাধীনতা)।'

গজনিতে আরেকটা রাত কাটানোর পরদিন তিনটা আমেরিকান হেলিকপ্টার আমার সাবেক কারাসঙ্গীদের উদ্ধার করে। বিশেষ বাহিনী খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ওদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আমিও বিশেষ বাহিনীর

একটা ঝটিকা অভিযানের জন্য অপেক্ষা করতাম। তবে এত দ্রুত আর সফল অভিযানের কথা ভাবতেও পারিনি। পাগলি হিথার এত বড় ধাক্কা সামলাতে পেরেছে, এটা জেনে আমি খুব আনন্দিত হই। ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে ও বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে, এমন একটা ছবি দেখার পর আমার চোখ ভিজে যায়। হিথারের বাবা সারা রাত জাগ্রত অবস্থায় ইসলামাবাদে অস্থির সময় কাটিয়েছেন।

সেদিন রাতে আমি কাকতালীয়ভাবে জার্মান শহর কোলোগনেতে অবস্থান করছিলাম। সঙ্গে ছিলেন শেল্টারের প্রধান উদো স্টল, কেথির ভাই অ্যান্দ্রেস জেলিনেক ও তাঁর স্ত্রী ক্যাজা। আমরা স্টার্ন টিভিতে সাক্ষাৎকার দিই। একই সঙ্গে ওদের মুক্তির আশা ও বিপদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি। তখন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছিল ওদের সম্ভাব্য মুক্তির কথা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার পরে এসব কেউ আর সহজে বিশ্বাস করেন না। আফগানিস্তান থেকে আসা গুজব ওখানকার প্রকৃতির মতোই রহস্যময়।

আমরা একটা ট্যাক্সিতে করে হোটেলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় উদোর কাছে একটা ফোন আসে। ওরা মুক্ত, ওই সময় জাদুকরি আনন্দের অনুভূতি হচ্ছিল। আমার মুখ দিয়ে শুধু একটা বাক্যই বের হলো, যেটা আমার বন্ধুবান্ধব বহুবার শুনেছে। আজ রাতে আরেক ঢোঁক শ্যাম্পেন গিলতে হবে অবশ্যই।

হোটেলে ফিরেই আমরা সবাই পিয়ানো বারে বসলাম। সাংবাদিক ও অনুষ্ঠান প্রযোজক থিও হেইনকে আমাদের সঙ্গে আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে আমন্ত্রণ জানাই। ওর কাছে এসবের বিস্তারিত খবর রয়েছে। কয়েক দিন ধরে সাহায্যকর্মীর বন্দিত্ব, মুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে যেসব খবর রটেছে, তা থিও থেকে কেউ ভালো বলতে পারবে না। পুরো সময়ই ও এই সংবাদের পিছু ছুটেছে। সংবাদগুলোর সঙ্গে যদি, সম্ভবত, কিন্তু শব্দগুলো জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না, আফগানিস্তান থেকে আসা খবরগুলো ভালো না খারাপ।

আমি অনুপস্থিত বন্ধু ও উদোর সম্মানে এক পেয়ালা পান করি। উদোর কাছে বারবার বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে ফোন আসছিল। একটু পরপর কথা বলতে উঠে যাচ্ছিল ও। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ও আটজনের কথা স্মরণ করতে ভুলল না। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানালাম আমরা সবাই। আজকের মতো

শ্যাম্পেন আগে কখনো এত সুস্বাদু লাগেনি। তাই স্বাদটাকে উপভোগ করার জন্য আরও তিন বোতল খালি করে ফেলি।

পরে জানতে পারি, নর্দার্ন অ্যালায়েন্স মঙ্গলবার কাবুলে প্রবেশ করে সাহায্য সংস্থা শেল্টার ইন্টারন্যাশনালের ১৬ জন আফগান কর্মীকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছে। আমি উদোকে বললাম, আটজন বিদেশি কর্মীকে জানানো হয়েছিল তাদের আফগান সহকর্মীদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। খবরটার সত্যতা নিয়ে ওরা সন্দিহান ছিল। প্রতিদিনের প্রার্থনায় ওরা তাদের সহকর্মীদের জন্য শুভকামনা করত।

তড়িৎ গতিতে আমার দুই গাইড জান আলী ও নাকিবুল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়। ওদের সঙ্গে আমার কাবুল কারাগারেই শেষ দেখা হয়েছিল। আমাকে জানানো হয়েছিল, ওদেরও ফাঁসির রশি গলায় ঝোলাতে হয়েছে। খবরটা শুনে আমি তখন মুষড়ে পড়ি। তবে ওরা আটজন মুক্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমার সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে। পাশাই প্রথম আমাকে সংবাদটা দেয় যে ওদেরও মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

সে জানায়, 'ম্যাডাম, গাইড দুজনকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তালেবানরা ওদের কাবুল কারাগার থেকে জালালাবাদে নিয়ে যায়। ওই সময় সবাইকে নিজ নিজ জীবন নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়। শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারলে তোমরা সবাই মুক্ত। কথাগুলো সবার কানে মধুবর্ষণ করে।'

আমি ও আমার পত্রিকা অফিস থেকে আমরা নীরবে ওদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। বিষয়টা ছিল আমার জন্য বিব্রতকর। কারণ, ১০ দিনের বন্দিজীবনের পুরোটা সময় আমি তালেবানদের কাছে ওদের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে এসেছি। তাই মুক্ত হওয়ার পুরো গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের সাহস হয়নি আমার। আমার ভয়টা অমূলক ছিল না। কারণ, আমাকে নিয়ে করা কিছু প্রতিবেদন ছিল চরম প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষে ভরপুর। তার থেকেও ভয়ের কারণ ছিল, এসব প্রতিবেদনের জন্য ওদের জীবননাশের শঙ্কা ছিল।

তারা খুব নিরাপদেই তাদের পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্তে মিলিত হয়। আমিও লিখতে পারলাম, ওদের হত্যা করে ফেলার খবরগুলো ছিল অতিরঞ্জিত। পাশা জানায়, তালেবানরা ওদের সঙ্গে সদাচরণ করেছে। সঙ্গে এ-ও বলেছে, আমি গোয়েন্দা, এটা প্রমাণিত হলে ওদের গর্দান যাবে।

সবাই খুব সুখেই আছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু না, পাশার সঙ্গে আমার কথোপকথনের পুরোটাই আমার জন্য আনন্দদায়ক ছিল না। আমার মুক্তির তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে আমেরিকান বোমারু বিমান কামা গ্রামে হামলা চালায়। সেই কামা, যেটাকে আমি পৃথিবীর মুখ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলাম। খবরটা শোনার পর আমার কী পরিমাণ কষ্ট লেগেছে, তা বর্ণনাতীত। 'ম্যাডাম, দুঃখের সংবাদ। আপনার গ্রামে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। যাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ এই হামলায় নিহত হয়েছে।'

যেসব বোমা হামলায় নিরপরাধ লোকেরা মারা গেছে, নিশ্চয় সেগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। খুব সরলভাবেই আমি কথাটা বলি পাশাকে। কিন্তু ও আমার কথায় প্রতিবাদ জানাল। তাহলে তিন দিন ধরে ভুল করে কামায় বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

আমি ফোনটা রেখে দিই। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। কাবুলে বোমাবর্ষণের প্রথম দিন যেই নারী বিজয়োল্লাসে বন্দিদশায় চিৎকার করে 'রুল ব্রিটানিয়া' গান গেয়েছিল, সে-ই এখন যুদ্ধটাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি কামায় গিয়েছিলাম কিন্তু এটা ছিল একটা সাধারণ গ্রাম। এর কোনো ভৌগোলিক বা সামরিক কলাকৌশলগত গুরুত্ব ছিল না।

আমি মাকে ফোন করে কাঁদতে থাকি। ওরা আমার কামা গ্রামে বোমা ফেলেছে। ছোট ছিমছাম গ্রামটার কোনো অস্তিত্ব নেই এখন আর। আমি আমার বার্তা সম্পাদক জিম ও আরও অনেককেই ফোন করে এই দুঃখজনক খবরটা দিয়ে কাঁদতে থাকি। আমার মনটা ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত।

আমি এরপর অ্যালান সিম্পসনের সঙ্গে কথা বলি। তিনি ছিলেন লেবার পার্টির একজন সদস্য এবং যুদ্ধের বিরোধিতাকারী লেবার দলের সদস্যদের নেতা। আমি তাঁকে সুন্দর কামা গ্রামের বর্ণনা শোনাই। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনেন এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আমাকে এ প্রসঙ্গে লিখতে পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য জনমনে প্রভাবে ফেলতে সক্ষম হবে। কারণ, আমার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই এবং যুদ্ধের সমর্থনকারীদের কেউই আমার মুখ বন্ধ রাখতে চাপ প্রয়োগ করছে না।

আমি ছিলাম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী। বোমা হামলার সময় আফগান মাটিতে অবস্থান করছিলাম। একজন সাংবাদিক যে প্রমাণ করতে পারবে

আমেরিকানরা বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা করছে। মানুষের কাছে একটা সুন্দর বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার ছিল আমার জন্য। এর পর থেকেই আমি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যুদ্ধ ও সামরিক সাজসজ্জা নিয়ে আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অনেক কাজ তখনো বাকি রয়ে গেছে। আমাকে পুনরায় আফগানিস্তানে যেতে হবে। কামায় যাঁরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। প্রার্থনা করি, তাঁদের সবাই নিরাপদে সুস্থ আছেন। যে মা নিজেকে ১৫ বাচ্চার মা বলে অভিহিত করেছেন, আমি পুনরায় তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টার অংশ নিতে চাই। সেই মেয়েটা, যে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখত, আমি একনজর তাকে দেখতে চাই। দেখতে চাই সেই তরুণ ছেলেটাকেও, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করার। আমাকে জানতে হবে, তারা এখনো বেঁচে আছে কি না। এরা অনেক দিন আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। দুই দশক ধরে যুদ্ধের ক্ষত বয়ে চলা দেশটাকে গড়ে তুলতে এমন স্বপ্নবাজ তরুণের দরকার হবে।

ভ্রমণ করতে গিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশ আর শহরের প্রেমে পড়েছি। নিউ ইয়র্ক শহর কখনো ঘুমায় না। সর্বদাই একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। রোমের রসুইঘরের সুগন্ধের লোভ সামলানো বড় কঠিন। ভেনিসের সৌন্দর্য হাঁ হয়ে দেখতে হয় আর প্যারিস পরিচ্ছন্ন ও সাজানো-গোছানো।

কিন্তু বুনো প্রাকৃতিক আর দুর্ধর্ষ আফগানিস্তান হৃদয় চুরি করেছে আমার। এই দেশের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ইতিহাস, টলায়মান রাজনীতি আর ভৌগোলিক বন্ধুরতার প্রভাবে এখানকার মানুষগুলোর আচরণেও এক আশ্চর্য বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। লেখক আহমদ রশিদ তাঁর বই *তালেবান : আফগান যোদ্ধা জাতি*তে খুব সাবলীল ও সুন্দর করে গুছিয়েছেন আফগানের রহস্যলীলা।

অনেক বছর আগে এক বৃদ্ধ বিজ্ঞ আফগান মুজাহিদ আমাকে আফগানিস্তান সৃষ্টির রহস্যময় গল্পটা শোনান। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন এখানে-সেখানে অনেক আবর্জনা, পাথর আর জঞ্জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। পৃথিবীর কোথাও এসব রাখা যাচ্ছিল না। তাই এসব একত্র করে এক জায়গায় ফেলা হয় আর সেটাই আফগানিস্তান।'

আফগানিস্তানের আকর্ষণ লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য কাজ। আবার যেতে হবে আমাকে। আমি সম্পাদক মার্টিন টাউনসেন্ড ও মা জয়েসকে বিষয়টা

বোঝানোর চেষ্টা করছি। আশা করছি, তাঁরা আরেকবার আমাকে এই বিচিত্র দেশে ভ্রমণের সুযোগ দেবেন। এবার কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই চষে বেড়াব ধু ধু প্রান্তর।

রুক্ষ দেশটার সঙ্গে প্রথম খণ্ডযুদ্ধে আমি হেরে গেছি, কিন্তু যুদ্ধ এখনো বাকি আছে।

# পাদটীকা

নিষিদ্ধ তালেবান সাম্রাজ্যের বন্দিদশা থেকে অবিশ্বাস্য উপায়ে রিডলি মুক্তি পান দশ দিন পর। মুক্তির পর পরই তিনি হয়ে উঠেন পশ্চিমাসহ সমগ্র বিশ্বের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান সফর রিডলির চোখে তুলে ধরে নতুন এক দিগন্ত। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমের অর্কেস্ট্রার সুরের মত সমন্বিত প্রচারের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। তৎকালীন বিশ্বের জনপ্রিয় স্লোগান ও পরাশক্তিদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কারকে তিনি আখ্যায়িত করেন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে। তবে নিরীহ মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কালো থাবা তখনো ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে রূপ নেয়নি।

তালেবানদের কথা দিয়েছিলেন, মুক্তি পেলে ইসলামের সংবিধান পবিত্র কোরআন পড়ে দেখবেন। নিছক অধ্যয়নের মত করেই তিনি পড়তে শুরু করলেন পবিত্র কোরানের অনুবাদ। কিন্তু কয়েকদিন যেতেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, এ কোন আশ্চর্য গ্রন্থ? পরে বিভিন্ন সময়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইসলামের নামে তাবত দুনিয়াতে চলমান অসামঞ্জস্যতা, অত্যাচার আর নিগ্রহ শুধুই স্থানভিত্তিক সংস্কৃতি আর পুরুষবাদের প্রতিচ্ছবি। খোদ তালেবানদের পাশবিক অত্যাচার আর নারীকে দমিয়ে রাখার প্রথারও ঘোর সমালোচনা করেন তিনি। সন্ধ্যার আগে মেয়েরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারবে না কিংবা মেয়েশিশুদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই–এসব ধারণা তাঁর মতে কেবলই তালেবানদের ধর্মান্ধতা ও মূর্খতা। তবে তালেবান পরবর্তী স্বাধীন যুগে আফগানিস্তানে যখন সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার খবর নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ায় বাহবা অনুনাদিত হয়, রিডলি তখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। এক রচনায় তিনি উল্লেখ করেন, আফগান মেয়েরা বোরকা খুলে ফেলার বদলে তাদের স্বামীদের কর্মসংস্থান, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে বেশি

চিন্তিত। পশ্চিমা দুনিয়ার প্রদত্ত নারী স্বাধীনতার সংজ্ঞা অধিকাংশ আফগান নারীর নিকট অর্থবহ নয়।

রিডলি পবিত্র কোরআন পাঠের পরে বুঝতে পারেন ইসলামের মর্মার্থ। তুখোড় মদ্যপায়ী রিডলি এক বছর মদ্যপান থেকে দূরে থাকেন। তার বেড়ে উঠার সময় থেকেই জেরির ক্লাব ছিল তার সব থেকে প্রিয় জায়গা। মদ্যপানের এ ক্লাব ছিল তাঁর সুখ দুঃখের নীরব সাক্ষী। কিন্তু সবার অগোচরেই তিনি দূরে থাকেন মদের বোতল থেকে।

অবশেষে তিন বছর পর ২০০৩ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। আরেকবার মিডিয়ায় বিপ্লবী রিডলিকে নিয়ে হইচই পড়ে যায়। রিডলি স্টকহোম সিনড্রোমে আক্রান্ত বলে সুর তোলেন অনেক বিশেষজ্ঞ। এটি এক ধরনের মানসিক ব্যাধি যেখানে বন্দিশালায় আটক ব্যক্তি তার আটককারীদের জন্য মায়া অনুভব করতে থাকেন। তবে রিডলি এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। তাঁর মতে, বন্দিশালা থেকে মুক্তি পাবার তিন বছর পরে কেউ এ ধরণের মানসিক সমস্যায় ভুগতে পারে না। তবে এও জানিয়ে দেন, তালেবানদের মহানুভবতা নয়, ইসলামের বক্তব্য, শান্তির বাণী আর নারীদের প্রদত্ত সুমহান মর্যাদাই তাঁকে টেনে নিয়েছে আলোর পথে।

এক সময়ের প্রবল সংগ্রামী নারীবাদী রিডলি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে আপাদমস্তক বোরকায় জড়িয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওয়াল স্ট্রিটের একজন সফল ব্যবসায়ী ঠিক যেমন স্যুটের বাইরে শুধু গেঞ্জি পরে অফিসে যেতে পারেন না ঠিক তেমনি বোরকাও মুসলমান নারীদের আলাদা পরিচয় বহন করে। বোরকা পরিহিত একজন মুসলিম নারীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, পুরনো সহকর্মীরাই এখন তাঁকে দেখে তখন সম্মান করে কথা বলেন। আগের মত হাসি ঠাট্টা বা অশ্লীল কথা শুনতে হয় না এখন আর। তাঁর মতে এটি এক অসাধারণ অনুভূতি।

মুসলিম নারীদের নির্যাতনের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, নারী নির্যাতন কোনো মতবাদ নয়, এটি নির্যাতনকারী পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বের সব স্থানেই নারী নির্যাতনের নমুনার খোঁজ মেলে। এটি শুধু ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি আমেরিকা-ইংল্যান্ডেও মেয়েরা স্বামীদের হাতে নিগৃহীত হন। অফিস আদালতে এখনো নারীদের বেতন ভাতা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। তবে ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী শাসিত বিভিন্ন এলাকায় পরিবারের সম্মান রক্ষায় মেয়েসন্তান হত্যা ও মেয়েশিশুদের বর্বর ও অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে খতনা

করার নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই উচ্চকণ্ঠ। ইসলামের কোথাও এসবের স্থান নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব প্রথা মূর্খ লোকদের ধর্মীয় নেতাগিরি আর লোকরঞ্জনবাদের অপ্রয়োজনীয় আস্ফালন।

মুক্তি পাবার কিছুদিন পর রিডলি *সানডে এক্সপ্রেসের* চাকরিটা ছেড়ে দেন। পরে তিনি দোহাভিত্তিক আল-জাজিরা চ্যানেলে যোগ দেন। প্রবল অহংকারী, রাগী আর স্পষ্টভাষী অতিকথনের অভ্যস্ত রিডলি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও বদলে যাননি এতটুকু। একসময় আলজাজিরার সাংবাদিকতা নীতির সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে চাকরিটা হারাতে হয় তাঁকে। তবে একরোখা রিডলি মামলা করে বসেন চ্যানেলটির বিরুদ্ধে। অভিযোগ আনেন লিঙ্গ বৈষম্যের। ১৪ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণের মামলাটি জিতেন তিনি ২০০৮ সালে। পরে আরো একবার অপর এক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাতেও তিনি ২৬ হাজার পাউন্ড জিতেন। ইরান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত প্রেস টিভিতেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি। ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ২০০৮ সালে সাইপ্রাসভিত্তিক গাজা মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন ছাড়াই গাজায় প্রবেশ করেন। সেখানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেন তিনি। পরের বছর এক বিশাল ত্রান সামগ্রী বহরের সাথে তিনি পুনরায় গাজায় প্রবেশ করেন।

## রাজনীতি

রিডলি একসময় ইংল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম দল রেসপেক্ট পার্টিতে যোগ দেন। সেখান থেকে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু দুই দুইবার নির্বাচনে চতুর্থ হয়ে রাজনীতির মঞ্চে আর খুব একটা আগ্রহ দেখাননি।

পাকিস্তান, তিউনিসিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা হিসেবে সফর করেন তিনি। একবার তিনি ইউরোপিয়ান মুসলিম মহিলাদের সর্বোচ্চ সংস্থার সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁকে।

## এক দশকের অস্থির বিশ্বে রিডলির অবস্থান

সন্ত্রাস আর প্রতিসন্ত্রাসের পেশী প্রদর্শনের হিংস্র রঙ্গমঞ্চে যখন বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানেরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছিল, তখন রিডলি পশ্চিমা নীতিকে একরকম ধুয়ে দেন। একই সাথে অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য নিন্দিত হন

তিনি। যেমন, এক ঘটনায় ব্রিটিশ মুসলিমদের পুলিশকে কোনো সাহায্য না করতে অনুরোধ জানান তিনি, যা ব্রিটিশ মুসলমানেরাও পছন্দ করেননি।

তার বন্দিত্বের সময় তালেবানদের দিকে অসংখ্যবার থুতু নিক্ষেপ, ঘৃণা প্রদর্শন আর গালি গালাজ করলেও মুক্তি পাবার পরে তিনি কিছুটা সমব্যথী হয়ে উঠেন। তিনি মনে করেন, সাংবাদিকেরা সবসময় একপেশে বক্তব্য তুলে ধরেন এসব ব্যাপারে। তবে বর্তমান সময়ের জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের ঘোরবিরোধী তিনি। তিনি বলেন, আইএস বিশ্বের তাবত মুসলিমশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা কোনোকালেই গ্রহণযোগ্য নয়। একসময় লিবিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে কথা বললেও ২০১২ সালে লিবিয়া সফর করে এসে তিনি মত পাল্টান। তিনি মনে করনে, সরকারি গোষ্ঠীর নির্যাতনে মাত্রা এতই বেশি ছিল যে, বিরুদ্ধ দাবানল জ্বলে উঠা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তার বক্তব্যে লিবিয়ার বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি জনপ্রিয় জঙ্গিবাদের আত্মঘাতী হামলার ঘোরবিরোধী। এ সমস্যা সমাধানে পশ্চিমা বিশের প্রচেষ্টাও ত্রুটিপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, মুসলিম বিশ্বে চলমান অস্থিরতা আর নির্যাতনের প্রভাবেই জঙ্গিবাদ শিকড় গজিয়ে উঠে। তাই মুসলিম বিশ্বের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান জঙ্গিবাদ দমনে সহায়ক হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

ইসরায়েল ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে রিডলি অন্তরে ভীষণ ঘৃণা পোষণ করেন। ২০০৬ সালে ইম্পেরিয়াল কলেজ অব লন্ডনের এক সম্মেলনে তিনি ইসরায়েলকে আমেরিকার প্রশিক্ষিত কুকুর বলে আখ্যায়িত করেন। এমনকি তাঁর নিজস্ব রেসপেক্ট পার্টি থেকে ইহুদি সমর্থকদের ঝেটিয়ে বের করবারও হুমকি দেন তিনি।

বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ড্রোন হামলায় বেসামরিক লোকজন নিহত হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন তিনি। সমমনা মহিলাদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন 'শান্তি বাহিনী'। পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেসব মহিলারা প্রতিনিয়ত ড্রোন হামলার ভয়ে থাকে তাদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে এই শান্তি বাহিনী।

## ব্যক্তিগত সাফল্য

তিনি মুসলিম মহিলা সংঘের ইউরোপীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন ২০১০ সালে। লন্ডনভিত্তিক বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রের সাথে কাজ করেছেন।

একই সাথে তিনি একজন অহিংস আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, নাগরিক অধিকার রক্ষা ও মহিলাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

২০১০ সালে মিলানে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয়ান মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে সংগঠনটির সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

২০১১ সালে তিনি আরব আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন। বছর কয়েক আগে সুদানের দারফুরে যে জাতিগত সংঘাত দেখা দেয় তা মিটাতে মুসলমানদের এক উদ্যোগের সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বিশ্ব সাংবাদিক সংস্থা, ইউরোপিয়ান সাংবাদিক সংস্থা ও মহিলা সাংবাদিক সংস্থার সদস্য।

২০০৮ সালে গাজা অভিমুখে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে একটি জাহাজ নৌপথে যাত্রা শুরু করে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অহিংসবাদী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও দক্ষিন আফ্রিকার বিখ্যাত আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু। সে সময় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ উদ্যোগের প্রশংসা করে একে গান্ধির অহিংস আন্দোলনের সাথে তুলনা করা হয়। সেই জাহাজে রিডলি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। পরে জাহাজটিতে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালিয়ে বিশ্বব্যাপী নিন্দার মুখে পড়ে।

বিশ্বের প্রতিটা দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা রিডলি সবসময় বলে থাকেন।

রিডলি লেখালেখির পাশাপাশি ফিল্ম ক্যামেরার পিছনেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তার নির্মিত একাধিক প্রামাণ্যচিত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে।

## পাঠক মন্তব্য

*‘ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান’ বইটি সম্পর্কে আপনি কিভাবে জেনেছেন?*
ফেসবুক বিজ্ঞাপন/বন্ধুর কাছে/কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন/
ওয়েবসাইট/অন্য কোনোভাবে

*‘ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান’ বইটি আপনি কিনেছেন–*
*নবপ্রকাশ* থেকে/ঢাকার বাইরে থেকে/রকমারি/অন্য কোনো উপায়ে

*আপনি পড়তে ভালোবাসেন–*
গল্প/উপন্যাস/ইতিহাস/প্রবন্ধ/ভ্রমণকাহিনি/স্মৃতিকথা/জীবনী/অন্যান্য

*‘ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান’ বইয়ের সার্বিক মান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন–*
উন্নত/ভালো/সাধারণ/খারাপ/নিম্নমানের

আপনি ভবিষ্যতে *নবপ্রকাশ*-এর বই পড়তে–
আগ্রহী/আগ্রহী না/মন্তব্য নেই

*নবপ্রকাশ-এর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য বা পরামর্শ (যদি থাকে)–*

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

আপনার নাম ও বয়স:
মোবাইল নম্বর:
ঠিকানা:
আপনার ফেসবুক আইডি (যদি থাকে):

প্রিয় পাঠক, আপনার প্রতিটি মূল্যায়ন ও মন্তব্য নবপ্রকাশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ ফর্মটি পূরণ করে আপনি নবপ্রকাশে পাঠালে নবপ্রকাশ থেকে সরাসরি বই কেনার ক্ষেত্রে আপনি পাবেন বাড়তি ১০% ছাড় এবং নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত এক মাসের মাসিক নবধ্বনি উপহার।

এক সময়ের প্রবল সংগ্রামী নারীবাদী রিডলি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে আপাদমস্তক বোরকায় জড়িয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওয়াল স্ট্রিটের একজন সফল ব্যবসায়ী ঠিক যেমন স্যুটের বাইরে শুধু গেঞ্জি পরে অফিসে যেতে পারেন না ঠিক তেমনি বোরকাও মুসলমান নারীদের আলাদা পরিচয় বহন করে।

সন্ত্রাস আর প্রতিসন্ত্রাসের পেশী প্রদর্শনের হিংস্র রঙ্গমঞ্চে যখন বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানেরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছিল, তখন রিডলি পশ্চিমা নীতিকে একরকম ধুয়ে দেন।

তিনি জঙ্গিবাদের জনপ্রিয় আত্মঘাতী হামলার ঘোরবিরোধী। এ সমস্যা সমাধানে পশ্চিমা বিশের প্রচেষ্টাও ত্রুটিপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। তিনি মনে করেন, মুসলিম বিশ্বে চলমান অস্থিরতা আর নির্যাতনের প্রভাবেই জঙ্গিবাদ শিকড় গজিয়ে উঠে। তাই মুসলিম বিশ্বের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান জঙ্গিবাদ দমনে সহায়ক হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।


e-store:
rokomari.com/noboprokash

In The Hand of Taliban
By Yvonne Ridley & Translated by Abrar Hamim
Price: BDT 400.00 | US $ 13.00

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441